ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধানে

বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ তীর্থ

রাং-উ রাংকূট

সংকলন ও সম্পাদনায় -
বিদর্শনাচার্য্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথের ও
গবেষক- অধ্যাপক ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের

রাজবিহার, রাম, কক্সবাজার।

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mangalmoy Bhante

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাচীন কেন্দ্র চৈত্যভূমি চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত বৌদ্ধ অধ্যুষিত হাইদচকিয়া গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে, ১৯৩৩ সালের ৩১ জানুয়ারী, ১৮ মাঘ, ১৩৩৯ বাংলা, রোজ মঙ্গলবার বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথের জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গৃহী নাম হিমাংশু, মাতা-পিতা আদর করে ডাকতেন 'অন্ত' নামে। পিতা প্রয়াত ভগীরথ বড়ুয়া ও মাতা প্রয়াতা স্বর্ণময়ী বড়ুয়া। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে হিমাংশু ছিলেন দ্বিতীয়। ছোটবেলায় সমবয়সী অন্যান্য শিশুরা যখন খেলাধূলায় মগ্ন থাকত তখন হিমাংশু বিহারে গিয়ে পুষ্প প্রদীপ দিয়ে বুদ্ধপূজা ও বুদ্ধবন্দনা করে ভান্তের নিকট ধর্মশ্রবণ করতেন। ছোটকালে তিনি কাদামাটি দিয়ে বুদ্ধমূর্তি তৈরী করে অত্যন্ত শ্রদ্ধাচিত্তে বুদ্ধপূজা করতেন। তিনি গৃহীজীবন থেকে ছিলেন বুদ্ধগত প্রাণ, 'বুদ্ধ' শব্দ শ্রবণের সাথে সাথে তিনি অন্তরে অনাবিল আনন্দ অনুভব করতেন। তাই তিনি ১৩৬৫ বাংলার ১৬ আষাঢ় মঙ্গলবার, ১৯৫৮ ইং সালে হাইদচকিয়া গৌতম আশ্রম বিহারে ৬ষ্ঠ সংগীতিকারক, উপসংঘরাজ শ্রীমৎ গুণালংকার মহাস্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। গুরুদেব তাঁর শ্রামণের নাম রাখলেন 'প্রজ্ঞাজ্যোতি'। গুরুর নির্দেশে ভাবনা সম্পর্কে শিক্ষার জন্য তিনি চলে গেলেন উনাইনপুরাজাত আর্য্যশ্রাবক ভদন্ত জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির মহোদয়ের কাছে। সেখান থেকে শিক্ষা শেষ করে গুরু ভান্তে নিজেই অখিল ভারত সংঘনায়ক শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাথেরোর নিকটে তুলে দেন ধর্ম-বিনয় শিক্ষার জন্য।

প্রজ্ঞাজ্যোতি শ্রামণের দীক্ষাগুরু উপসংঘরাজ গুণালংকার মহাথেরো মহোদয়ের অন্তেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে পরম পূজনীয় শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ মহাথের মহোদয়ের উপাধায়ত্বে ও অনেক জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ভিক্ষুর উপস্থিতিতে জোবরা সুগত বিহারে ১৫ ফাল্গুন, ১৩৬৮ বাংলা, ১৯৬২ইং রোজ মঙ্গলবার থেরবাদী বিনয়সম্মতভাবে পবিত্র উপসম্পদা লাভ করেন। উপসম্পদা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাথের, শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ মহাথের, শ্রীমৎ সুগতবংশ মহাথের, শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথের, শ্রীমৎ শীলালংকার মহাথের, শ্রীমৎ নাগসেন মহাথের প্রমুখ। তিনি উপসম্পদা লাভ করার পর ১ম বর্ষাবাস ১৯৬৩ইং জোবরা সুগত বিহার, ২য় বর্ষা ১৯৬৪ইং দক্ষিণ জলদী বনবিহার, ৩য় বর্ষা ১৯৬৫ইং আনোয়ারা মুৎসুদ্দিপাড়া বিবেকারাম বিহার, ৪র্থ হতে ১৮তম বর্ষা ১৯৬৬ইং হতে ১৯৮০ইং ঐতিহাসিক রাং-উ রাংকূট বনাশ্রম, ১৯তম বর্ষা ১৯৮১ইং পবিত্র বুদ্ধগয়ায়, ২০তম বর্ষা ১৯৮২ইং রাংকূট বনাশ্রম, ২১তম বর্ষা ১৯৮৩ইং থাইল্যাণ্ড ব্যাঙ্কক সিটির "ওয়াট পাকনাম" বৌদ্ধ বিহার, ২২তম বর্ষা থেকে ২৭তম বর্ষাবাস, ১৯৮৪ইং থেকে ১৯৮৯ইং, রাংকূট বনাশ্রম, ২৮তম বর্ষা থেকে ৩১তম বর্ষাবাস, ১৯৯০ইং থেকে ১৯৯৩ইং, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, ৩২তম বর্ষা থেকে ৩৬তম বর্ষাবাস, ১৯৯৪ইং থেকে ১৯৯৮ইং, পাহাড়তলী যোগেন্দ্রারাম বিহার, ৩৭তম বর্ষা থেকে ৪৩তম বর্ষাবাস ১৯৯৯ইং-২০০৫ইং আন্তর্জাতিক অরণ্য বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র, মহামুণি পাহাড়তলীতে বর্ষাবাস যাপন করেন।

ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথের শ্রীলংকায় ভ্রমণকালে উপস্থিত হলেন কলম্বোর উপকণ্ঠে 'মহারাগামা শ্রী বজিরায়ন' ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রীলংকার প্রখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু মাডিহে পঞ্ঞাসীহা মহানায়ক ভান্তের সাথে কুশলাকুশল বিনিময় করেন। পরবর্তীতে পালি শিক্ষা অধ্যয়নের জন্য তারই প্রিয় শিষ্য শ্রদ্ধেয় ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরকে সেই প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। আজ তারই অবদানে বাংলাদেশের মধ্যে পুনঃ পালি অনুবাদের জন্ম হয়।

পণ্ডিত প্রবর ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর মতো গুণী শিষ্যের জন্মদাতা, বৌদ্ধ সমাজ গগণের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, শাসন-সদ্ধর্মের একান্ত হিতকামী, কল্যাণমিত্র, বিদর্শন প্রেমী, সম্যক্ দৃষ্টি সম্পন্ন এই মহান পুরুষ ২০০৬ইং সালের ২০ জুলাই, বৃহস্পতিবার পৌণে ১টায় চট্টগ্রাম মহানগরীর একুশে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।
আমরা এ মহাপুরুষের নির্বাণ শান্তি লাভ হোক, এ প্রার্থনা করি।

প্রণতঃ
মুদিতারত্ন ভিক্ষু
পঃ গহিরা শান্তিময় বিহার

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধানে
বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ তীর্থ
রাং-উ রাংকূট

মোড়ক উন্মোচন করেন ঃ
জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার ।

সংকলন ও সম্পাদনায় ঃ
বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহথেরো
ও
গবেষক অধ্যাপক ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
রাজারকুল, রামু, কক্সবাজার ।

পরিবেশনায় ঃ
প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী
শ্মশানভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার
মোগলটুলী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম ।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধানে
বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ তীর্থ
রাং-উ রাংকূট

প্রকাশনায় ঃ ভারতী গ্রন্থালয়-এর ১ম প্রকাশ

প্রকাশক ঃ প্রদীপ বড়ুয়া (খোকন)
আশীষ বড়ুয়া (রিজু)
পংকজ বড়ুয়া (মিথুন)
তদ্বীয় স্ত্রী, পুত্র-কন্যাগণ,
পশ্চিম গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল ঃ ৫ নভেম্বর, ২০১০ ইং
২১ কার্ত্তিক, ১৪১৭ বাংলা।

পূণ্যতীর্থ রাং-উ রাংকূট মহাবিহারে দানশ্রেষ্ঠ কঠিন চীবর দানোৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ ভদন্ত মুদিতারত্ন ভিক্ষু
সহ-সম্পাদক,
প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী

সহযোগীতায় ঃ ভদন্ত সাধনানন্দ থের
ভদন্ত শ্রদ্ধাপাল ভিক্ষু
ভদন্ত চন্দ্রবংশ ভিক্ষু
ভদন্ত রতনবংশ ভিক্ষু
ভদন্ত শ্রদ্ধানন্দ ভিক্ষু
ভদন্ত বিজিতাবংশ ভিক্ষু
ভদন্ত ক্ষান্তিবংশ ভিক্ষু
বাবু আশীষ বড়ুয়া (গহিরা)

গ্রন্থসত্ত্ব ঃ প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী কর্তৃক সংরক্ষিত

আমাদের বক্তব্য

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৌদ্ধ পণ্ডিত সর্বজন পূজ্য ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো বি,এ, (অনার্স) এম,এ (ডবল) মহোদয়ের **"ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধানে বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ তীর্থ রাং-উ রাংকূট"** গ্রন্থটি **"প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী"** কর্তৃক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই গ্রন্থটি বাংলাদেশের বৌদ্ধদের প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহ্য বহন করবে। ইতিপূর্বেও পণ্ডিত প্রবর ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের মহোদয়সহ আরো বেশ কয়েকজন লেখকের রচিত/সংকলিত/অনূদিত/সম্পাদিত মহামূল্যবান ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে আসছে। প্রকাশিত উক্ত ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানসহ ধর্মীয়শিক্ষা প্রসারে এক নবদিগন্ত সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠিকে ধর্মীয় জীবন গঠনের সাহায্যার্থে সুদুর অতীত কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে সকল ধীমান প্রাজ্ঞ লেখকবৃন্দ ত্রিপিটকের বিভিন্ন খণ্ড বাংলায় অনুবাদসহ বুদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সংশ্লিষ্ট যে সকল পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন, তা বিভিন্ন কারণে মুদ্রণ করতে সক্ষম হননি, সেগুলো মুদ্রণ এবং পূর্বে মুদ্রিত যে সকল মহামূল্যবান গ্রন্থ বর্তমানে দুস্প্রাপ্য সেগুলোর পুনমুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা **"প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী"র** মূল লক্ষ্য।

আমাদের একাডেমীর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলত ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের শ্রদ্ধাদানের উপর নির্ভর করে। তাই যে কোন ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাগণ আপনার ও আপনাদের মহাপোকারী প্রয়াত পিতা–মাতা বা অন্যান্য যে কোন উপকারী জ্ঞাতীর স্মৃতিকে স্মরণ করে রাখার লক্ষ্যে যে কোন ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে, উপকারীর উপকার স্বীকার এবং নিজের দুর্লভ মানব জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারেন। অতএব, আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ঐতিহসাকি রাং-উ রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহারে শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব-২০১০ইং উপলক্ষে **"ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধানে বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ তীর্থ রাং-উ রাংকূট"** বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা প্রীতি অনুভব করছি।

অত্র **"ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধানে বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ তীর্থ রাং-উ রাংকূট"** গ্রন্থটির প্রকাশকদেরকে **"প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী"র** পরিচালনা পর্ষদ হতে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শুভেচ্ছাসহ.....

ভদন্ত সাধনানন্দ থের
সভাপতি

ভদন্ত করুণারত্ন ভিক্ষু
সাধারণ সম্পাদক

প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী পরিচালনা পর্ষদ

গ্রন্থকারের উৎসর্গ

রাং-উ রাংকূট চৈত্য প্রতিষ্ঠাতা ঃ মহামতি সম্রাট
অশোক (খৃঃ পূঃ ২৬৮ অব্দ) রাং-উ রাংকূট
ঋদ্ধিময় বুদ্ধ প্রতিবিম্বের প্রতিষ্ঠাতা ঃ
ঋদ্ধিমান ভিক্ষু চন্দ্রজ্যোতি
মহাস্থবির (খ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ
শতক) রাং-উ
রাংকূট
আবিস্কারক ঃ ভদন্ত জগতচন্দ্র মহাস্থবির (১৯২৯
খৃঃ) রাং-উ রাংকূট সংস্কারক ঃ ভদন্ত
প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো (১৯৬৬
খৃঃ) রাং-উ রাংকূট সংরক্ষকঃ
ভদন্ত চন্দ্রজ্যোতি মহাথেরো
(১৯৯০ খৃঃ) এই
পুণ্যাত্মাগণের
পুণ্যস্মৃতি
স্মরণে
উৎসর্গীত হলো
আমার এই ঐতিহাসিক গ্রন্থ ।

প্রণত ঃ

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো

উৎসর্গ

আমাদের প্রয়াত পরম আদরণীয় পিতা-
অধীর চন্দ্র বড়ুয়া এবং পুণ্যশীলা
আদরনীয়া মাতা-ভারতী প্রভা
বড়ুয়ার পুণ্য স্মৃতিতে এই
প্রকাশনা উৎসর্গীত
হলো ।

পিতা- অধীর চন্দ্র বড়ুয়া

মাতা- ভারতী প্রভা বড়ুয়া

প্রণত ঃ

প্রদীপ বড়ুয়া (খোকন)
আশীষ বড়ুয়া (রিজু)
পংকজ বড়ুয়া (মিথুন)
তদ্বীয় স্ত্রী, পুত্র-কন্যাগণ,
পঃ গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম ।

২৫৫৪ বুদ্ধবর্ষের
০৫ নভেম্বর ২০১০ইং
২১ কার্তিক ১৪১৭ বাংলা

প্রকাশক পরিবার সম্পর্কে দুটি কথা

চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার পশ্চিম গহিরায় হালদা নদীর পূর্ব বাঁকে অবস্থিত গহিরা শান্তিময় বিহার প্রায় আড়াইশ দায়ক সমর্থিত একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩-এ আমার উপসম্পদা গ্রহণের পর প্রথম বর্ষাব্রত শুরু করি এই বিহারে। একনাগাড়ে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এ বিহারে অবস্থান করে বাংলায় অনার্স সহ এম.এ. ডিগ্রীর অধ্যয়ন সমাপ্ত করে উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে শ্রীলংকা গমন করি।

সেই দীর্ঘ ৮ বছর যাবত গহিরা শান্তিময় বিহারে আমার অবস্থানকালে বর্তমান গ্রন্থ "ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধানে রাং-উ রাংকূট (রামকোট) বনাশ্রম বৌদ্ধ তীর্থ বিহার"-এর প্রকাশক পরিবারের সাথে আমাদের শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতার বন্ধন গড়ে উঠে। সেই সূত্রে অদ্যাবধি আমাদের মাঝে পারস্পরিক উপকার প্রত্যুপকারের বিনিময় চলছে অত্যন্ত পবিত্র অনুভূতি তাড়িত হয়ে।

'জীবনে নিঃস্বার্থ ভাবে অন্যের উপকার করো'- এমন একটি আপ্তবাক্য ইদানিং খুব বেশী বেশী উচ্চারিত হয়, রাজনৈতিক নেতাদের মুখেও। এমনকি সাধারণজনের বুলিতেও এর ঘাটতি নেই। কিন্তু বাস্তবতায় তা ক্রমে দুর্লভ থেকে দুর্লভতর হয়ে উঠছে। কেন? এর একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর আছে- 'কৃতজ্ঞতা'। উপকারীর উপকার স্মরণে রাখা এবং শক্তি প্রমাণে প্রত্যুপকার করার অপর নাম কৃতজ্ঞতা।

এই দুর্লভ গুণটির চর্চা গহিরা শান্তিময় বিহারের দায়ক অধীর চন্দ্র বড়ুয়া এবং তাঁর সহধর্মীনী ভারতী প্রভার বড়ুয়ার সন্তানগণের মাঝে বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। পিতা অধীর চন্দ্র বড়ুয়া ছিলেন হাটহাজারী ও রাউজান অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা মোটর ম্যকানিক ও পরিবহণ ব্যবসায়ী। ১৯৭১ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর অকাল মৃত্যুতে পত্নী ভারতী প্রভা বড়ু য়ার চোখে অন্ধকার দেখতে থাকেন, আট জন ছেলে মেয়ের সংসার নিয়ে। সেই দুর্দিনে আমি তাদের বিহারবাসী ভিক্ষু হিসেবে যৎসামান্য সাহায্য সহযোগিতা করেছি, উপদেশ শান্তনা দিয়ে। আমার সেদিনের উপকার এই উপাসিকা সন্তানদের বারবার স্মরণ করায়ে দিতেন বলেই, আজ তাদের পার্থিব ভোগ-প্রাচুর্যের মাঝে ও তারা আমাকে ভুলে যাননি। আমার ৩৭টি বছরের অসংখ্য পরোপকারী কর্মময় জীবনে তাঁদের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

আমি আন্তরিক সাধুবাদের সাথে উপাসিকা ভারতী প্রভা বড়ুয়া এবং তাঁর সন্তানদের নির্বাণ শান্তিময় জীবন কামনা করছি।

আশীর্বাদক

০৭/১০/২০১০ইং **প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো**

প্রকাশকের অভিমত

প্রকৃতির অবধারিত বিধি বিধানে আবির্ভূত সম্যক্ সম্বুদ্ধগণের মধ্যে অনন্যশ্রেষ্ঠ এক জগৎ কান্ডারী, দেব-মানবের শাস্তা সেই ভগবান অরহৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ। দেব-মানব সহ জগতের সকল প্রাণীর হিতার্থে, সুখার্থে ও কল্যাণার্থে প্রকাশ করেছিলেন প্রকৃতির অবয়ব মৌলিক সত্যগুলো। যাহা সদ্ধর্ম নামে অভিহিত। যার তত্ত্ব বিগত ২৫৫৪ বছর পর্যন্ত অগণিত জ্ঞানী গুণী ও মহাজ্ঞানী পন্ডিতগণ আপন জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে চরমসীমায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শুধু তাই নয়, ভগবান তথাগত বুদ্ধ দেশিত এমন মৌলিক সত্য ও আদর্শ গ্রহণ, ধারণ ও মনন আচরণে পারমার্থিক জীবন গঠনের মাধমে ইহজগতেও নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন করে সেই পরমসুখ পরম শান্তি নির্বাণ দর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই পরমপুজ্যস্পদ মুণি ঋষি তথা মহাজ্ঞানী মনীষীগণ ও আপন লব্ধকৃত এমন নিগুঢ় তত্ত্ব মানবের কল্যানার্থে প্রকাশ ও প্রচারের সম্যক্ প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং আজ অবধি পরম্পরা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে জাতির দৃঢ় বিশ্বাস পাঁচ হাজার বছর কালও তদুর্ধ সময়কাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এ প্রকাশ ও প্রচার চলতে থাকবে। অথচ বর্তমান সময়কালে আমরা যারা সৌরজগতের ভূমণ্ডলে মনুষ্যলোকে অবস্থান করছি এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলে নিজেকে দাবী করে চলেছি এমন লোকের সংখ্যা বর্তমান বিশ্বে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যদিও রয়েছে। তবে বিশ্বের মানচিত্রে ছোট্ট একটি বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার স্থানকরে নিয়েছে। এই দেশে অতি অল্প সংখ্যক বৌদ্ধ জাতির অবস্থান। তাও আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আমরা স্ব স্ব অবস্থানে থেকে তথাগত বুদ্ধ দেশিত সদ্ধর্ম অনুশীলনে কতটুকু সঠিক পদ্ধতিতে

পালন করতে পারছি, কতটুকুই বা বুদ্ধ প্রদর্শিত সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম; আদৌ আমরা তথাগত বুদ্ধ দেশিত কর্মতত্ত্ব বুঝতে পারছি কিনা? আমার কাছে তা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এমন সব প্রশ্নের সমাধান পেতে আমরা গৃহীগণ বুদ্ধের নির্দেশিত সেই পরম পূজনীয় মহান ভিক্ষুসংঘের আশ্রয় গ্রহণ করছি। শুধু তাই নয়, আবার ভিক্ষু দায়ক উভয়ের লিখিত গ্রন্থাবলী থেকেও জ্ঞান আহরণে বুঝার চেষ্টা করি। তবে দেখা যায়, সেই পরম পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ সঠিক পদ্ধতিতে বুদ্ধ দেশিত নীতি আদর্শকে মানুষের জ্ঞান গভীরে পৌঁছাতে গিয়ে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিকূলতায় যথারীতি হিম্‌সিম খেতে হচ্ছে। তা আর বর্তমান সময়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

অতঃপর বর্তমান সময়ের মধ্যে যে সকল ক্ষণজন্মা মহাজ্ঞানী সংঘমণীষা, ভগবান তথাগত বুদ্ধের নীতি আদর্শকে সঠিকভাবে মানুষের মাঝে প্রকাশও প্রচারে মানব সমাজকে বিকশিত করার সম্যক্ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, এদের মধ্যে প্রয়াত পরম পূজনীয় শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, অখিল ভারত সংঘরাজ, পণ্ডিত প্রবর শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার মহাস্থবির ও অনন্য শ্রেষ্ঠ সংঘমণীষা, সর্বজন শ্রদ্ধেয় অরহৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তের) ছায়ানীড়ে গমন করে অনেকের জীবন ধন্য হয়েছে। আরো পরম্পরা যদি উল্লেখিত মহাপুরুষগণের জীবনাদর্শ আপন জীবনের কর্মপরিক্রমায় অন্তর জগতে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। তাহলে বৌদ্ধিক আদর্শে পরিপূর্ণ জীবন নিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে। এতে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। সুতরাং এমন উল্লেখযোগ্য মণীষাগণের জীবনাদর্শের ধারাবাহিকতা রক্ষায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান সাংঘিক ব্যক্তিত্ব, বহু গ্রন্থপ্রণেতা বাগ্মীশ্বর, পরম পূজনীয় ধুতাঙ্গ সাধক ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয় আপন মেধা জ্ঞান, চিন্তা

চেতনায় সেই দুর্ভাগা বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজকে রক্ষার উদ্যম নিয়ে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, আজকের যুগে তাহা এক অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। যে দৃষ্টান্ত এক সময়ে সমাজের বাস্তবতায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। কিন্তু আজকের যুগে দেখা যায়। একটি পরিবার থেকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অর্থনীতির মুক্তি অর্জন করতে গিয়ে ধার্মিকতা তথা ধর্মতঃ জীবন যাপনকে হারিয়ে বসেছে প্রায়। যে সমাজে ধার্মিকতা থাকেনা, অজ্ঞতায় থাকে, সে সমাজ সভ্য বা বৌদ্ধ সমাজের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করলে দেখা যায়, শ্রদ্ধেয় ভান্তে মানব সমাজে সদ্ধর্মের বীজ বপন করে মানুষের মনের অবস্থানকে, সুদুর প্রসারী বৌদ্ধিক আদর্শে পুনঃ জাগ্রত করার সম্যক্ প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছেন। পূজনীয় ভান্তের এমন উদার প্রচেষ্টাকে কৃতাঞ্জলীপূর্ণ প্রশংসা না করিলে হয়তো আমাদের জীবনে ব্রতকর্মের পরিপূর্ণতা পাবে না। ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয়কে আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই ছেলেবেলা থেকে জানি, তাঁর সকল প্রকার গঠনমূলক কর্মকান্ডে জড়িত রয়েছি। সেই সুবাদে তাঁকে যথারীতি বুঝার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তিনি সমাজকে সদ্ধর্ম শাসন অনুশাসনে আলোকিত করতে গিয়ে বার বার লাঞ্ছিত, বঞ্চিত এবং সমালোচিত হয়েছেন। তবু সমাজের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধের কারণে বার বার ছুটে চলেন একই পথের পথিক হয়ে। সমাজ থেকে আঘাত পেলেও সেই ব্যাথা আর মনে থাকে না। সেই যাই হউক পরম পূজনীয় আর্যশ্রাবক বনভান্তের মূল্যবান উক্তিটি না বললে হয়তো আমাদের ধারণ ক্ষমতা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বনভান্তে মাঝে মাঝে বলে থাকেন, "অজ্ঞানীকে ক-লে-অ যেই, ন-ক-লে-অ হেই।" অর্থাৎ বললেও যেই না বললেও সেই। তারপরও মায়ের মত এই অজ্ঞতাকে রোধ করাই যেন একান্ত কর্তব্য মনে করে পূজনীয় ভান্তের পথ চলা থামে না। মা যেমন তাঁর আপন

সন্তানের শত দোষ দর্শণেও বার বার ক্ষমা করে দিয়ে, তার জীবন গঠণ করার প্রাণ পণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, তেমনিভাবে পূজনীয় ভান্তেও দৃঢ় বীর্যতার সাথে সমাজকে সুন্দর করার কর্মপ্রেরণা হারায় না। সেই দৃষ্টিকোন থেকে আমাদের বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজ হয়তো একদিন পরম শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভান্তের অভাবে আজকের দিনের জন্য অনুশোচনা করারও সুযোগ থাকবে না। তাই কবির ভাষায় বলতে হয়, "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।" অতঃপর একান্ত আহ্বান জানাবো, সংঘকুলগৌরব ভিক্ষু শ্রামণ সংঘ এবং উপাসক-উপাসিকা সংঘের সমন্বয় সাধনে বর্তমান সময়ের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চতুরার্য্য সত্যকে উপলব্ধির মাধ্যমে পারমার্থিক জীবন চর্চায় সবাইকে ধাবিত করা একান্ত অপরিহার্য। কাজেই পরম পূজনীয় ভান্তের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিকুলতার মধ্যেও যে কর্ম প্রচেষ্টায় লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী ও দেশনা কৃতজ্ঞচিত্তে সাধুবাদের সহিত আমাদের অনুসরণ যোগ্য। তবে সমাজে বৌদ্ধিক চিন্তার অভাব হেতু পরম শ্রদ্ধেয় ভান্তের বিচলিত মানসিকতার উৎপত্তি ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তারপরও আমি মনে করি ধৈর্য্য, সহ্য, ত্যাগও মৈত্রীচিত্তে পূজনীয় ভান্তের পথ পরিক্রমা আমাদের গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে সকলের সার্বিক সহযোগিতা ঊনার পথ পরিক্রমাকে নিশ্চিন্তে আরো বেগবান করবে।

তাই আমরা যারা পরম শ্রদ্ধেয় ভান্তের ছায়াতলে থেকে বুদ্ধের শাসন-অনুশাসনে বৌদ্ধিক চিন্তা চেতনা নিয়ে হেঁটে চলেছি, আমাদের সঠিক চেতনায় থাকা একান্ত বাঞ্চনীয়। কারণ বুদ্ধের ভাষায় মানব জীবন অতীব দুর্লভ, এটা সবাই জানে বা বুঝে কিন্তু চিত্ত স্থির রেখে সঠিক পথে জীবন অতিবাহিত করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তাই ডুবরীর ন্যায় শক্তি সঞ্চয় করা শ্রেয়।

একজন ডুবরী যেমন ধীরে ধীরে পানিতে ডুব মেরে বেশিক্ষণ পানিতে ডুব মেরে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলে, ঠিক তেমনি ভাবে পারমার্থিক জীবন চর্চায় ধাবিত হওয়া মানব মাত্রেই নৈতিক কর্তব্য ।

অতএব, শদ্রেয় প্রজ্ঞাবংশ ভান্তের বর্তমান সময়ের রচিত বুদ্ধ শাসন রক্ষার সেই মহামানব সম্রাট অশোক কর্তৃক ৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক তীর্থস্থান রাং-উ রাংকূট বৌদ্ধ বিহারের বিভিন্ন তথ্য সম্বন্ধে সঠিক ইতিহাস রচনার মধ্যে দিয়ে পুনঃরায় বৌদ্ধ শাসন রক্ষার এক দুর্লভ পাঠ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে । সেই গ্রন্থখানা পরম পূজ্য কল্যাণমিত্র অরহৎ সাধনানন্দ মহাস্থবিরের দীর্ঘায়ু কামনা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত পিতা অধীর চন্দ্র বড়ুয়া ও মাতা ভারতী প্রভা বড়ুয়ার নৈর্বাণিক জীবন কামনা সহ জ্ঞাতীগণ তথা জগতের সকল প্রাণীর হিতার্থে মুদ্রণ করা হইল । বৌদ্ধ শাসন রক্ষার কর্ম উৎপন্ন স্রোত ধারায় আমাদের ও ভবিষ্যত বংশধরদের চিত্ত ধাবিত হউক ।

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু!

লেখক ঃ- আশীষ বড়ুয়া (রিজু)
প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
চিটাগং ড্রিংকিং বেভারিজ ইন্ডাঃ লিঃ

ইতি

প্রদীপ বড়ুয়া (খোকন)
আশীষ বড়ুয়া (রিজু)
পংকজ বড়ুয়া (মিথুন)
তদ্বীয় স্ত্রী, পুত্র-কন্যাগণ,
পশ্চিম গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম ।

পটভূমি

১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা লগ্নে রামগড় সীমান্তের ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স ব্যাটেলিয়ান (EPR) বাংলাদেশ স্বাধীনতার স্বপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও আমাদের গ্রাম জোবরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমরা চতুর্পাশের বিভিন্ন গ্রামগুলো ঘুরে ঘুরে তাদের জন্যে খাদ্য সংগ্রহ করতাম। পাকসেনারা ক্যান্টনমেন্ট হতে বের হয়ে পোড়ামাটির নীতি গ্রহণ করে ঝড়ের মতো সেলিং করতে করতে এগুতে থাকলে অস্ত্র-সস্ত্রে দুর্বল EPR বাহিনী এবং জনগণ নিরাপদ স্থানে সরে পড়তে থাকেন। এমন পরিস্থিতিতে জোবরা গ্রামের দুই যুবক আমি এবং নতুন বাবু আশ্রয় নিলাম কক্সবাজার জেলার রামু রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ তীর্থ বিহারে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো আমাদেরকে অনুচ্চ পাহাড়ে ঘন সবুজ বনানী ঘেরা এই রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহারের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে বার বার বলতেন; আর বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কীয় নানা গ্রন্থ পাঠ করে ব্যাখ্যা দান করতেন। জীবনে এই প্রথম কোন ঐতিহাসিক স্থানে দিনের পরদিন অতিবাহিত করতে গিয়ে বুদ্ধের ধর্ম দর্শনের অপার সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতার জন্ম হলো। এক পর্যায়ে গৃহী জীবন ত্যাগ করে তথায় প্রব্রজ্যা জীবন গ্রহণ করলাম। রাংকূটে প্রায় বছর খানেক এ জীবনে অবস্থানকালে দেখতাম গুরুদেব ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির বার্মিজ অক্ষরে বার্মিজ ভাষায় নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করতেন এবং নোট লিখতেন। দেখতাম এগুলো আরাকান সম্রাজ্যের এবং আরাকান ও বার্মায় বৌদ্ধ ধর্ম ও বড়ুয়া সম্প্রদায় সমূহের ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়। এ

সকল বিষয়ে আমার কৌতুহল ছিল এ পর্যন্তই। আমাদের সময় অতিবাহিত হতো বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক বই গুলো পাঠ এবং প্রয়োজনীয় গাথা সুত্ত সমূহ মুখস্থ করে, গুরুদেবের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে, এবং আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে।

আমরা দুই উচ্চ শিক্ষিত যুবকের ভদ্রতা, নম্রতা এবং চারিত্রিক মাধুর্যের প্রতি গুরুদেবের আকর্ষণ ছিল প্রবল। তিনি বিশেষ করে আমাকে এই রাংকূট এর অনন্য সাধারণ বুদ্ধ প্রতিবিম্বের পদতলে মাথা ঠেকায়ে বার বার উচ্চারণ করতেন, আমি যেন জীবনে কোন দিন এই রাংকূট তীর্থ ত্যাগ না করি। এমন উচ্চারণে বস্তুতঃ আমার আগ্রহ ছিল না। কারণ, আকিয়াবের পাথর-কেল্লা শহরে জন্ম নেয়া আমার পিসাতু বোন মল্লিকার ছেলে মাণিকধন (বাবুল) এর সাথে আমার সিদ্ধান্ত ছিল তার S.S.C. পরীক্ষাটি সমাপ্তির পরপরই উভয়ে রওনা দেবো আকিয়াবে। তথায় গিয়ে জীবন গঠণ করবো অন্য ভাবে। প্রব্রজ্যা জীবনের প্রতি ক্রমে আমার আকর্ষণ স্থায়ি হয়ে যাওয়ায় ঐ স্বপ্ন মুছে গেল। আমার প্রব্রজ্যার দীক্ষাগুরু রামু লামার পাড়া বিহারের অশীতিপর প্রবীণ ভিক্ষু কক্সবাজার অঞ্চলের রাখাইন সংঘনায়ক ভদন্ত উ পাণ্ডবা মহাথেরো প্রদত্ত পাঞ্ঞাওয়ানছা (প্রজ্ঞাবংশ) শ্রামণেরো হতে ১৯৭৩ খৃস্টাব্দে রাউজানের কদলপুর সুধর্মানন্দ বিহার সীমায় শিক্ষাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি থেরো মহোদয়ের উপাধ্যায়ত্বে।

সেই থেকে জীবনের ৩৫টি বছর সমগ্র এশিয়া এবং ইউরোপের নানা দেশ, নানা জনপদ ঘুরতে ঘুরতে বিগত ২০০৮ খৃস্টাব্দে..... এসে পৌঁছলাম প্রব্রজ্যার বীজ-বপন স্থান ঐতিহাসিক রাংকূটে অধ্যক্ষের দায়িত্ব ভার গ্রহণে এক প্রবল প্রতিকূলতার মুখে। রাংকূটে আমার এই দায়িত্ব গ্রহণের পরিস্থিতি আজ আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ১৯৮৯ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রাম মহানগরীর মহাবিহার

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মন্দিরের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে সেই বিহারের উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণের ঘটনাটি। চট্টগ্রাম মহানগরীর সীবলী সংসদ নামে এক প্রবল শক্তিশালী যুব-গোষ্ঠী এবং ভদন্ত অজিতানন্দ মহাথেরোর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা জোট বদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির পরিবর্তে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মন্দিরে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে জোর আন্দোলন শুরু করেছিলেন তখন। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানিনা বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির তৎকালীন সভাপতি হেমেন্দ্র লাল বড়ুয়া, বোধিতরু বড়ুয়া এবং অধ্যাপক জ্যোতিষ বড়ুয়া এই তিন ব্যক্তি সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব আমার অতীব শ্রদ্ধাভাজন ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথেরো, ভদন্ত শীলানন্দ মহাথেরো এবং ভদন্ত ধর্মপ্রিয় মহাথেরো ত্রয়কে প্রভাবিত করে আমাকে কদলপুর ভিক্ষু ট্রেনিং সেন্টারের পরিচালকের দায়িত্ব হতে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মন্দিরের দায়িত্বে নিয়ে গেলেন।

আমার অদম্য কর্ম তৎপরতা এবং অসাধারণ ধৈর্য ও সহ্য গুণের দ্বারা চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মন্দিরের এই প্রবল ঘুর্ণিঝড় থেকে বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতিকে রক্ষা যেমন করেছি, অষ্টম-নবম সংঘরাজের দ্বন্দ্বের অবসানও হলো সেই সাথে। কুমিল্লার বড়ইগাঁও থেকে উখিয়ার পাতাবাড়ী পর্যন্ত ১২টি বৌদ্ধ মন্দিরে শিশু কল্যাণ মূলক ভবন নির্মাণ ও ৩০টি বিহারে শিশু শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে এ সকলকে সুসংহত করতে মহামণ্ডল কল্যাণ সংস্থা এবং শরণ নামে দু'টি NGO সংস্থার জন্ম দিলাম। মহামণ্ডল কল্যাণ সংস্থাকে World Felloship of Buddhist Youths ব্যাংকক এর এবং বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভাকে World Sangha Council-তাইওয়ান এর সদস্যপদ ভূক্ত করে দিলাম। চট্টগ্রাম মহানগরীর মোগলটুলি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম বুদ্ধ মন্দিরের ধর্মবংশ ইনস্টিটিউট, বিশ্বশান্তি প্যাগোডার

গোবিন্দ-গুণালংকার বৌদ্ধ ছাত্রাবাস এবং রাংকূটের জগত-জ্যোতি শিশু সদন- এই উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান গুলোর জন্মদানের কর্ম ও সুসম্পন্ন করলাম চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে প্রবল প্রতিকুলতার মাঝে দীর্ঘ ৭টি বছর অবস্থান করে।

জীবনের ৫৯ তম বর্ষে পদার্পন করে পুণঃ একই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হচ্ছে কক্সবাজারের রামু রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ তীর্থ বিহারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই প্রতিষ্ঠানে ১৯৩২ খৃস্টাব্দে জন্ম নেয়া হিন্দু-বৌদ্ধ ভূমি বিরোধের অবসান ঘটানোর দায়-দায়িত্ব যেমন পড়েছে হতভাগ্য প্রজ্ঞাবংশের ঘাঁড়ে, সেই সাথে নিজ হাতে জন্ম দেয়া জগত-জ্যোতি শিশু সদনটির পরিচালক মণ্ডলীর বৈরীতা; এবং স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু ভিক্ষু ও গৃহীদের প্রবল বৈরীতার মাঝেই আমাকে রাং-উ রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ তীর্থ বিহারের অস্থিত্ব এবং ইতিহাস রক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

হাজার বছরের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের ধারক এবং আমার দ্বিতীয় জন্মের ঠিকানা এই রাং-উ রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ তীর্থ বিহারের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অস্তিত্ব রক্ষায় আমার বিগত দুই বছরের সংগ্রামে আমার হিতৈষীগণের সহায়তা এখনও এমন যে, মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন নিতান্তই একা। আমি নড়লেই তারা নড়ে, নচেৎ ঘুমায়। তাদের এই উদাস-ঘুম যদি ভাঙ্গে তবেই এ সংগ্রামে আমাদের জয় হবে অনিবার্য। এই ভেবে আমার গুরুদেবের অকাল প্রয়াণ এবং ফেলে যাওয়া নোটগুলো রচিত মহাকবি আলাওলের 'পদ্মাবতীর পুঁথি' (সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত), বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'রাজর্ষী' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস, বিশিষ্ট গবেষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল মাবুদ খান এবং জনাব মাসুদ খানের লিখিত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণামূলক নিবন্ধ

সমূহের সহায়তা ও রাংকূট বিহারকে ভিত্তি করে ১৯৬৬ খৃস্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সংগঠিত ঘটনা সমূহের প্রাপ্ত রেকর্ড সমূহকে ভিত্তি করে আজ আমি দাড় করালাম "ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধানে ২০০০ বছরের রাং-উ রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ তীর্থ বিহার" শিরোনামের গ্রন্থটি ।

এই গ্রন্থটির মূদ্রণে ও প্রচারে কম্পিউটার কম্পোজের মতো প্রচুর শ্রমসাধ্য দায়িত্ব পালনকারী প্রিয়ভাজন শিষ্য মুদিতারত্ন ভিক্ষু, প্রকাশনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহনকারী রাউজান উপজেলার পশ্চিম গহিরা শান্তিময় বিহারের দায়ক ওমান প্রবাসী প্রদীপ বড়ুয়া (খোকন), আশীষ বড়ুয়া (রিজু), পংকজ বড়ুয়া (মিথুন) এবং তদ্বীয় স্ত্রী পুত্র-কন্যাগণ (এক হাজার কপি) প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় এই ঐতিহাসিক গ্রন্থ আমার শ্রম সার্থক হলো । তাই আমি কম্পোজার এবং প্রকাশক দ্বয় সহ তাদের জ্ঞাতী পরিবার বর্গের সকলের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আর আশীর্বাদ । রাং-উ রাংকূট মহাতীর্থের পুণ্যস্মৃতির ধারক এই ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশনা জনিত পুন্য প্রভাবে তাঁদের সকলের জাগতিক কল্যাণ ও পরমার্থিক নির্বাণ শান্তি লাভ হোক এই কামনা করি ।

ইতি-

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
অধ্যক্ষ
রাং-উ রাংকূট বনাশ্রম
বৌদ্ধ তীর্থ বিহার
রামু, কক্সবাজার ।

২৫৫৪ বুদ্ধবর্ষের
১৩ই আশ্বিন ১৪১৭ বাংলা
২৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ খৃঃ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. বর্তমান পরিচিতি.....	১
২. আবিস্কার কথা.....	১
৩. রাংকূট সংস্কারক ও প্রচারক ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতির অবদান.....	৭
৪. রাংকূট এর পুণরুজ্জীবক ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো.....	৮
৫. SPRED OF INDIAN SCRIPTS TO MYANMAR.....	১৭
৬. রাজর্ষি গ্রন্থের উপসংহার.....	২৯

পরিশিষ্ট ১ম খণ্ড

৭. বৌদ্ধ ঐতিহ্যঋদ্ধ স্থাপত্য ঃ রামকোট বনাশ্রম বিহার-মাসুম খান.....	৫০
৮. সধাতুক ইতিহাস প্রসিদ্ধ রামু রামকোট বুদ্ধ-বিদর্শক প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো.....	৬০
৯. A brief history of Raungkut (Ramcot) stupa of 3rd century B.C.-Venerable Prajna Bangsha Mahathero.....	৬২
১০. 'সংঘরাজ সারমেধ ও বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্ম'-আব্দুল মাবুদ খান.....	৬৯
১১. মায়ানমারে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ঃ ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা-ডঃ স্বপ্না ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)....	৮১

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট ২য় খণ্ড

১২. ঐতিহাসিক বৌদ্ধ তীর্থ রাং-উ রাংকূট রক্ষায় ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরোর অবদান (১৯৬৬-১৯৯০ খৃঃ)..... ১০০

১৩. ঐতিহাসিক বৌদ্ধ তীর্থ রাং-উ রাংকূট রক্ষায় ভদন্ত চন্দ্রজ্যোতি মহাথেরোর অবদান (১৯৯০-২০০৮ খৃঃ)..... ১১৪

১৪. ঐতিহাসিক বৌদ্ধ তীর্থ রাং-উ রাংকূট রক্ষায় ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর অবদান (১৯৭০-২০১০ খৃঃ)..... ১২৯

উপমহাদেশের প্রাচীনতম রাং-উ রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থ

বর্তমান পরিচিতি ঃ

এশিয়ার দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার বিমান বন্দর হতে ১১ কি.মি. পূর্বে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের রামু বাইপাস হতে ৩ কি.মি. দক্ষিণে ফতেখাঁ ইউনিয়নের বাঁকখালী নদীর সেতু অতিক্রম করে রাজারকুল ইউনিয়নে প্রবেশ ক্ষণেই দেখা যাবে প্রাচীন আরাকান সড়কের পূর্ব ও পশ্চিম পাশে অনুচ্চ টিলা ও পর্বত শ্রেণীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন বাংলার সুপ্রাচীন ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারক খৃষ্টপূর্ব ৫ম হতে খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারক রাং-উ রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থ ভূমি ।

আবিস্কার কথা ঃ

আরাকানের প্রাচীন এক গ্রন্থাগারে 'ধাইয়া ওয়াদি বাজোয়াইং-নামে অক্ষরে লেখা এক ইতিহাস গ্রন্থের সুত্রধরে চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ঊনাইনপুরা গ্রামজাত দুই বৌদ্ধ ভিক্ষু আচারিয়া পূর্ণাচার (১৮৭৭-১৯০৮খৃঃ) এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ভদন্ত জগতচন্দ্র (১৮৫০-১৯৪৮) এই দুই কীর্তিমান ব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টায় ১৯২৯ খৃস্টাব্দে আবিস্কৃত হয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির অপর এক বিশাল বিদ্যাপিঠ এই রাং-উ রাংকূট তীর্থ মহাবিহার ।

আচারিয়া পূর্ণাচার যিনি ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গালী বৌদ্ধদের নবজাগরণে দ্বিতীয় কর্ণধার এবং দ্বিতীয় সংঘরাজ রূপে সমাদৃত, সেই মহান ব্যক্তিত্ব হতে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশনা সংগ্রহ করে তৎশিষ্য ভদন্ত জগতচন্দ্র মহাস্থবির যেদিন রামুর রাজারকুলের স্থানীয় বৌদ্ধদের সহায়তায় রাং-উ রাংকূট এলাকা চিহ্নিত করতে সারাদিন অরণ্যে ঘুরতে গিয়ে বর্তমান বড়ো মন্দিরটির সন্ধান পেলেন, সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা ছিল এরূপ "পড়ন্ত বিকেলে বর্তমান বড়ো মন্দির পাহাড়ের পাদদেশে ও চুড়ার সমতলে আমরা দেখতে পেলাম পাতলা প্রচুর ইট পাটকেল । আর এসবের মাঝে কয়েকটি অশ্বথ বৃক্ষের শেখড় আচ্ছাদি বেশ উঁচু এক ঢিবি । এ বৃক্ষগুলোর শেখড়ের ফাঁকে ফাঁকে ও দেখা যাচ্ছিল অনুরূপ ইটের নমুনা । ঢিবির চারপাশে ঘুরতে গিয়ে নজরে এলো গুহার মতো এক প্রবেশ মুখ । পাড়ার এক সাহসী যুবক শেখড় কেটে গুহার সামান্য ভেতরে প্রবেশ করতেই চিৎকার করে উঠলো, বিশাল ফাঁকা জায়গা,

যেন একটা ঘর। যুবকের চিৎকারে ভদন্ত জগতচন্দ্র মহাস্থবির সহ বেশ কয়েকজন দ্রুত এলেন গুহামুখে। সবার মাঝে সারাদিনের ক্লান্তি হঠাৎ উবে গিয়ে দেখা গেল প্রাণ চাঞ্চল্য আর উদ্গ্রীব কৌতুহল। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে এতক্ষণে; মশালের কোন ব্যবস্থাও না থাকায় সিদ্ধান্ত নেয়া হলো আগামীকাল খুব সকালে দাঁ-কুড়াল আর সারাদিনের খাদ্য নিয়ে স্থানীয় নাসিরকুল গ্রামের নারী পুরুষ সবাই যেন এখানে সমবেত হয়।

পরদিন যথাসময়ে সবাই এক যোগে উপস্থিত হলাম পাহাড়ের সেই গুহা দ্বারে। মশাল জ্বালিয়ে সেই সাহসী যুবক প্রবেশ করলেন গুহার ভেতরে ভদন্ত জগতচন্দ্র মহাস্থবির সহ। এক ঝাঁক বাদুর দিনের আলোয় বেড়িয়ে এসে আশে পাশে বৃক্ষ ঢালে আশ্রয় নিল। বাদুড়ের ভোটকা-দুর্গন্ধে অনুসন্ধানী দৃষ্টি গোচর হলো কয়েক খন্ড বড়ো আকারের পাথর খন্ডের মাঝে অসংখ্য হাড়-গোড় গরু-ছাগলের। চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখলে খন্ডিত পাথরগুলো বুদ্ধ মূর্তির ভগ্নাবশেষ এবং আরও খুঁজে পেলেন চেপ্টা মসৃণ প্রশস্ত এক বড়ো আকারের প্রস্থর খন্ড। ভদন্ত জগতচন্দ্রের দৃষ্টি গোচর হলো এই প্রস্তর খন্ডে খোঁদিত আছে অনেক লেখা।

পুরাতাত্ত্বিক ভদন্ত জগতচন্দ্র বার্মিজ অক্ষর ও ভাষার সাথে পরিচিত ছিলেন। সঙ্গীদের সহায়তায় পাথরটি গুহা থেকে বেড় করে এনে পাঠ-উদ্ধারে মনযোগ দিতে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন পেয়েছি! পেয়েছি! এত বৎসর যার চিন্তায় ঘুম হয়নি, আজ তারই সন্ধান পেলাম। অহো! আমরা কতই না ভাগ্যবান। সেই কবে হারিয়ে যাওয়া মহাপুণ্য তীর্থ রাংউ-রাংকূট-এর সন্ধান আজ আমরা পেলাম। ভদন্ত জগতচন্দ্র উপস্থিত সবাইকে বললেন তোমরা এই পাথরটি খুব যত্ন সহকারে জল দিয়ে পরিস্কার করো। সাবধান করে দিলেন, কোন কারণে সামান্যতম আঘাত ও যেন পাথরের কোথাও না লাগে। বললেন, ওটা মুছে পরিস্কার করো। তাতে কি আছে, আমি তা পড়ে দেখবো। এই বলে তিনি আবার গুহার ভেতরে মশাল সহ কযেকজনকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। অবশিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিলেন গুহার উপরে জড়াজড়ি করে উঠে যাওয়া অশ্বত্থ গাছ গুলো শেখড় সহ খুব সাবধানে তুলে ফেলার কাজে লেগে যেতে। গুহার ভেতরে বাঘে খাওয়া গরু-ছাগলের হাড়-গোড় পরিস্কার করানো হলো। খন্ডিত পাথর গুলোর মধ্যে দেখা গেল পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধ মূর্তির কোমর থেকে নীচের অংশ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত দুই হাত ভাঙ্গা। বক্ষ পর্যন্ত অপর একটি খণ্ড কোন প্রকারে বসানোর পর হাত ও মস্তক বিহীন প্রায় ৮ (আট) ফুট্ উঁচু বুদ্ধ মূর্তির অবয়ব

ফুটে উঠলো। মস্তক বিহীন স্থানীয় হালকা সবুজ পাথরের এই বুদ্ধ মূর্তির মস্তকটি গেল কোথায়? গুহার ভেতরে কোথাও পাওয়া গেলনা তার কোন চিহ্ন মাত্র। ভদন্ত জগতচন্দ্র খুবই চিন্তিত হলেন। কিছুটা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও দেখাদিল তাঁর চোখে মুখে। তিনি গুহা থেকে বেরিয়ে এসে সবাইকে অনুরোধ করলেন, পাহাড়ের উপরে নীচে সর্বত্র তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে এই বুদ্ধ মূর্তির মস্তকটি। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শিলা-লিপিটি তিনি আদ্যোপান্ত পড়ে উপস্থিত সকলকে তা জানালেন- "তোমরা শোন, এই পাথরে কী লেখা আছে। ইহা সেই পুন্য তীর্থ যেখানে ধন্যবতীর রাজা মহাচান্দা-সুরিয়ার আমন্ত্রণে বুদ্ধ তথাগত ধন্যবতীতে গমন কালে সশিষ্যে এক রাত ধ্যান সুখে অবস্থান করেছিলেন। পরে তিনি সেবক আনন্দকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "একদিন পশ্চিম সমুদ্রের পূর্ব পাশে রম্যবতী (রম্মাওয়াদি) নগরের পাহাড় চূড়ায় এই স্থানে আমার বক্ষাস্থি অশোক নামে এক রাজা কর্তৃক স্থাপিত হয়ে ইহা মহাতীর্থে পরিণত হবে। তখন ইহার নাম হবে রাংউ-রাংকূট চেতিয় (চেঁদি)। চান্দা-সুরিয়া রাজার বংশধর রাজা চেঁদি সবুজ পাথরের বুদ্ধ বিম্ব তৈরী করে আমার বক্ষাস্থিকে তৎ মস্তকে সুরক্ষিত করবে। সেই থেকে এস্থানের নাম হবে "রাং-উ রাংকূট' মহাচেঁদি (মহাচৈত্য)।" [ধাঙ্গইয়াওয়াদি রাজোয়াঙ্গং- পৃঃ ১৫১, ধাতুবংশ- পৃঃ ১১২]

ভদন্ত জগতচন্দ্র শিলালিপির এই পর্যন্ত উল্লেখ করে সবাইকে অনুরোধ জানালেন, যে করেই হোক প্রাপ্ত বুদ্ধ মূর্তির মস্তকটি খুঁজে বের করো। নচেৎ আমাদের সমস্ত চেষ্টাই পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে। জনগণ পর পর বেশ কয়েকদিন এই পাহাড় এবং তার আশে পাশে অনেক অনুসন্ধান করেও সন্ধান পেলেন না সেই বুদ্ধমূর্তির মস্তকটি। কিন্তু, তাদের প্রচেষ্টায় ক্রমে গুহাটিকে অশ্বত্থ বৃক্ষ ও তার শেকড় মুক্ত করা হলো। দেখাগেল ছাতার মতো সামান্য চুড়া বিশিষ্ট এই গুহাটি প্রকৃত প্রস্তাবে একটি ঘর বা মন্দির। পাহাড় চুড়া সহ বিভিন্ন স্থানে আরো পাওয়া গেল শ্বেত পাথর, সবুজ পাথর এবং ব্রোঞ্জের বেশ কয়েকটি বুদ্ধ মূর্তি ও মূর্তির ভগ্নাবশেষ পশ্চিম মুখে ধনুকের মতো প্রলম্বিত পাহাড়ের মধ্যস্থলে পাওয়া গেল আরো দুইটি যুগল মন্দির। উত্তর বাহুর পশ্চিম মুখী শেষ প্রান্তে পাওয়া গেল আরো একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং অশোক স্তম্ভের খণ্ডিতাংশ। বড়ো মন্দিরের উত্তর দিকে পাওয়া গেল আরো একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। ধনু আকৃতির পাহাড়টির পূর্ব পাশে একটি জলাশয়, পশ্চিম পাশেও একটি জলাশয় আর এই জলাশয় দুইটির চারপাশে বিস্তীর্ণ সমতলে পাওয়া গের অনেক গুলো মট (গণ কবর) এর ক্ষত-বিক্ষত স্মৃতি চিহ্ন।

স্থানীয় বৌদ্ধরা ভদন্ত জগতচন্দ্র মহাস্থবিরের জন্যে বড় মন্দিরের উত্তর পাশে অস্থায়ি ভাবে একটি আবাস কুঠির তৈরী করে দিলেন। তিনি তথায় অবস্থানকালে একদিন সূর্য অস্তাগমের মুখে কয়েকজন ভিক্ষু তথায় উপস্থিত হলেন। ভদন্ত মহোদয় ভাবলেন, তারা কোন পথিক ভিক্ষু হবেন। রাত যাপনের উদ্দেশ্যে মনে হয় এখানে এসেছেন। তিনি তাদের বসার ব্যবস্থা করলেন। ভিক্ষুগণ তাঁকে বন্দনা করে কুশল বিনিময়ের অবকাশ না দিয়েই বললেন, ভান্তে! আমরা এসেছি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে। বহুকাল ধরে হারিয়ে যাওয়া এই মহাতীর্থ আজ আপনার চেষ্টায় আবার উদ্ধার হচ্ছে। তাই আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। ভান্তে, এখন আপনার বয়স হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান উদ্ধারে এ পর্যন্ত যা করেছেন যথেষ্ট হয়েছে। এখন এ বিষয়ে আর চিন্তা করবেন না। ভবিষ্যতে আরো প্রতিভাবান ভিক্ষুর আগমণ এখানে হবে। তাঁদের দ্বারা এ মহাপুণ্য তীর্থ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ভান্তে, পূর্বে আমরা এখানে সাতশত ভিক্ষু বাস করতাম। এখন আমরা যাই। এরূপ বলতে না বলতেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভদন্ত জগতচন্দ্র হতভম্ব হয়ে আপন চৌকিতে বসে রইলেন। তার কিছুক্ষণ পরে স্থানীয় এক প্রবীণ ভক্ত সেখানে উপস্থিত হলেন। ভদন্ত মহোদয়কে এমতাবস্থায় দেখে জানতে চাইলেন কি হলো। তিনি আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করলেন। ভক্তটি বললেন, ভান্তে! আমাদের শৈশবেও নাসির কুল থেকে মাঝে মধ্যে দেখতাম কিছু ভিক্ষু এই ঢেবায় (মন্দির পাহাড়ের উত্তর পাদদেশে অবস্থিত বিশাল হ্রদ) স্নান করছেন। কিন্তু, জানতাম না তাঁরা কোথাকার ভিক্ষু কোথায় বা তাঁরা থাকেন। কারণ তাঁরা কখনো গ্রামে আসেন না। বাঘের ভয়ে আমরাও সেখানে যেতে সাহস পেতাম না। আপনি যে বলেছিলেন, ষোড়শ শতাব্দীতে এখানে অনেক ভিক্ষুরা মোগল সেনাদের হাতে নিহত হযেছিলেন; ভান্তে! মনে হয় তাঁদের অনেকেই বৃক্ষ দেবতা হয়ে এখানে অবস্থান করছেন। ভদন্ত জগতচন্দ্র অন্যমনস্কের ন্যায় নীরবে মস্তক নেড়ে বললেন, "আমি কিন্তু চিন্তা মুক্ত হতে পারছিনা। বার বারই মনে হচ্ছে, যদি না সধাতুক বুদ্ধ মস্তকটি না পাই, তা হলো, এত শ্রম, এত সাধনা সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

এ প্রসঙ্গে নানা কথা বলতে বলতে বেশ রাত হয়ে গেল। ভক্তটি বললেন, ভান্তে! আগামীকাল ভোরে আপনার জন্যে প্রাতঃরাশ আনতে হবে। তাই আমি উঠলাম। সেদিন ছিল পূর্ণিমা জ্যোৎস্না আলোকিত রাত্রি। ভক্তটি এই নির্জন অরণ্যে একা হলেও পথ চলতে কষ্ট হয়নি। পরদিন ভোরের আলো আঁধারিতে ভান্তের জন্য প্রাতঃরাশ নিয়ে তিনি যখন মন্দিরের পাহাড়ে উঠতে যাবেন, ঠিক

তখনই পাহাড়ের পাদদেশে চোখে পড়ল পথের ঠিক মাঝখানে পড়ে আছে মস্ত গোলাকার এক পাথর। পাহাড়ে উঠে সরাসরি জগতচন্দ্রের নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভান্তে গতরাতে আমি চলে যাওয়ার পরে কোন লোক কি এখানে এসেছিলেন? না তো! কেন বলছ? ভান্তে! রাতে এখানে নিশ্চয় লোকের আনাগোনা হয়। না হলে নিচে পথের উপর এত বড় পাথর কে রাখবে? কিসের পাথর? কোন ধরণের পাথর? ভদন্ত জিজ্ঞাসা করলেন। বড় গোলাকার পাথর ভান্তে। সন্দিগ্ধ হয়ে ভদন্ত জগতচন্দ্র বললেন চলতো দেখি, বলে ভক্তকে নিয়ে নিচে নামলেন। পাথরের আকার আকৃতি দেখে সন্দেহ বৃদ্ধি হল। দুজনে মিলে গড়িয়ে দিলেন পাথরকে। অমনি বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলেন, এতো সে বুদ্ধেরই মস্তক! সাধু! সাধু! বলে উভয়ে উপুড় হয়ে জানালেন বন্দনা। ভদন্ত জগতচন্দ্রের আনন্দ দেখে কে? তিনি ভক্তকে বললেন- বুদ্ধের সধাতুক মস্তক নিশ্চয় দেবগণই সুরক্ষা করেছেন। তুমি গ্রামে যাও; সবাইকে নিয়ে এস। আজকে এই পূর্ণিমা দিনেই হবে পূর্ণাঙ্গ রাং-উ রাংকূট বুদ্ধের পূজা। লোকজন এলেন মহাউৎসাহে। মুহু মুহু সাধু ধ্বনি মুখরিত হয়ে ধৌত বুদ্ধ মূর্তির মস্তকটি স্থাপিত হলো মন্দির গহ্বরে স্থিত খণ্ডিত বুদ্ধ মূর্তির উপর। প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধ বিম্ব। অনাড়ম্ব বুদ্ধ পূজাও যেন হয়ে উঠলো অসাধারণ প্রাণময়। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো রাং-উ রাংকূটের বুদ্ধ মূর্তির অলৌকিক কাহিনী। লোক আসতে লাগলো দলে দলে। পূজায়-প্রার্থনায় আবার মুখরিত হয়ে উঠলো ষোড়শ শতাব্দীর ধ্বংস-যজ্ঞে অবলুপ্ত প্রায় রাং-উ রাংকূট বুদ্ধ মন্দির। সত্যি সত্যি! অসাধারণ পবিত্রতার ঋদ্ধিময় আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সমগ্র মন্দির গহ্বর। ১৯৬৭ সালে বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়ার ব্রহ্মপদ আচার্য নামে এক অসাধারণ ভাস্কর্য শিল্পী দ্বারা রাংকূট বুদ্ধ মূর্তির দুই হাত সংযোজন সহ পুনঃ সংস্কার সাধন করলেন। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ চলা কালে এই নিবন্ধ লেখক সুব্রত বড়ুয়া নামে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক্যাল কলেজের অধ্যয়ন রত ছিলাম। পাকসেনাদের হত্যাযজ্ঞ থেকে জীবন বাঁচানোর তাগিদে যেদিন এই রাংকূট বনাশ্রমে আশ্রয় নিতে আগমণ করি সেদিন প্রথম দর্শনে আমিও বিমোহিত হয়েছিলাম এই প্রাণবন্ত স্নিগ্ধ করুণাময় আভায় উদ্ভাসিত রাংকূট বুদ্ধ বিম্বকে দেখে। এই রাংকূট তীর্থে আমার বছর খানেক অবস্থানকালে জ্যোৎস্নালোকিত রাতে নিজের কানেও অনেকবার শুনেছি অশরিরী গুণ গুণ প্রার্থনার শব্দ। রাংকূটে আগত দেশ-বিদেশের বহু পর্যটকের মুখে আমি নিজেও শুনেছি- "এমন প্রাণবন্ত মায়াময়

করুণাঘন বুদ্ধমূর্তি তারা ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখেননি। ভাব মুগ্ধতা যাদের বেশি তারা ভক্তি তদ্গত চিত্তে যা প্রার্থনা করেন তা পূর্ণ হয়; এমন স্বীকৃতি অসংখ্য জনের মুখে মুখে। এই রাংকূট বুদ্ধ বিম্বের সমক্ষে বা পরোক্ষে তাঁকে বিপদ-আপদে স্মরণ করে প্রার্থনা করলে তা কখনও বিফলে যায় না; এমন লোক প্রসিদ্ধি প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য মানব মনে দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্ গড়ে নিয়েছে বলেই এই রাংকূট বুদ্ধ মূর্তিটিকে কেন্দ্র করে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে রাং-উ রাংকূট চৈত্যটি মহাতীর্থ রূপে পূঁজিত হচ্ছে অদ্যাবধি।

দিন যায় বছর ঘুরে আসে। ভদন্ত জগতচন্দ্র স্থানীয় জমিদারের আর্থিক সহায়তায় বড় মন্দিরও দক্ষিণ মন্দিরের চূড়া নির্মাণ সহ কিছু সংস্কার কার্য সম্পন্ন করলেন। কিন্তু মন্দিরের চৈত্য চূড়াগুলো খৃঃপূর্ব ৩য় শতকের সম্রাট অশোক আমলের না হয়ে ঊনবিংশ শতকের আরাকানী শিল্পমণ্ডিত হয়ে গেল। মূল মন্দির সংলগ্ন করে উত্তর পাশে ইসলামী ভাস্কর্য শিল্পের অনুকরণে আরো একটি অনুপম মন্দির তৈরী হলো নাইছা নামে স্থানীয় রাখাইন ধনী কন্যার অর্থায়নে।

রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থের এ উন্নয়নে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে দুষ্ট বুদ্ধির জন্ম দিল। ১৯৩১ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে এক হিন্দু সন্ন্যাসী দক্ষিণের যুগল বৌদ্ধ স্মৃতি মন্দিরের একটিতে সাময়িক অবস্থানের অনুমতি নিয়ে তথায় বসবাস শুরু করলেন। বছর না যেতেই রামু থানার হিন্দু দারোগার সহায়তায় সেই মন্দির থেকে বুদ্ধ মূর্তি সরায়ে দিয়ে তথায় স্থাপন করলেন এক শিব লিঙ্গ। মন্দির চূড়াকে হিন্দু মন্দিরের নমুনায় পরিবর্তন করে ফেললেন তিনি। তার এই অপকর্ম বন্ধ করার জন্যে স্থানীয় প্রশাসনের শরণাপন্ন হলেন ভদন্ত জগতচন্দ্র। দুর্ভাগ্যক্রমে স্থানীয় রামু থানা কর্মকর্তা এবং কক্সবাজার মহকুমার ডেপুটি কমিশনার দু'জনেই ছিলেন তৎকালে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। তারা নিজের পাতে ঝোল ঢালার ন্যায় আচরণ করে হিন্দু সন্ন্যাসীর কাজ এগিয়ে যেতে সুযোগ দিলেন। এক বছর মামলা চলার পর ১৯৩১-৩২ইং R.S. খতিয়ানে ১০৫/১০৬/১০৮/১০৯ ধারার পরিবর্তন মামলা মূলে ভারত সরকারে পক্ষে G.K. Bose কর্তৃক রাংকূটের দক্ষিণ পাহাড়ের যুগল মন্দির, উহাদের চত্তর ও পুকুরে হিন্দু-বৌদ্ধদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করে রায় প্রদান করা হলো। সেই রায়ের প্রেক্ষিতেই রাংকূট হয়ে গেল 'রামকোট' এবং রাং-উ হয়ে গেল 'রামু'। কিন্তু সেই থেকে রাংকূট এর ভূমির অধিকার নিয়ে হিন্দু বৌদ্ধদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের অবসান আজ পর্যন্ত হয়নি। জানি না এই পুস্তক

প্রকাশের পরে এই সুদীর্ঘ ৭৮ বছরের বিরোধের কোন সুরহা হয় কি-না। কারণ এই গ্রন্থের লেখক ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ বিগত ২০০৮ খৃস্টাব্দের ৩রা জুলাই রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থের অধ্যক্ষ রূপে দায়িত্ব গ্রহণের পর ভূমি সংক্রান্ত খতিয়ানে দেখতে পেলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের আবেদনে ২০০১ খৃস্টাব্দে তৎকালীন কক্সবাজার D.C. পুলিন বিহারী দেবনাথ কর্তৃক পরিচিহ্নিত মামলা নং-৫১/২০০০-২০০১ এবং ৫১/২০০১-২০০২ স্মারক নং ৭-১৭/৯৬-১৬১৮/এস,এ, মূলে বৃটিশ আমলে হিন্দু-বৌদ্ধ সমঅধিকারে প্রায়টিও বাতিল করে একক ভাবে হিন্দু ধর্মীয় কাজে ব্যবহার্য বলে আদেশ জারি করেছেন। এই আদেশ বাতিলের জন্যে বর্তমান কক্সবাজার জেলাপ্রশাসক জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ মহোদয় বরাবরে রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহারের পক্ষে ২০১০ খৃস্টাব্দে আমি আবেদন করেছি।

রাংকূট সংস্কারক ও প্রচারক ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতির অবদান ঃ

১৯৪৮ খৃস্টাব্দে রাংকূট তীর্থের আবিষ্কারক ভদন্ত জগৎচন্দ্র মহাথেরোর মহাপ্রয়াণ হয় (১৮৫০-১৯৪৮)। অতঃপর দীর্ঘ ১৮ বছর যাবত এই মহাতীর্থ এক প্রকার পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। চকরিয়া উপজেলার সন্তান প্রসন্ন ভিক্ষু বছর খানেক অবস্থান করে আম-কাঠালের কিছু বনায়ন ছাড়া আর বিশেষ কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে মোগলদের দ্বারা যেই ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিলুপ্তির শিকার হয় সেই ইতিহাস ও ঐতিহ্য পুণরুদ্ধারে ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে রাংকূটে আগমণ হয় বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরোর (১৯৩৩-২০০৬)। উত্তর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার হাইদচকিয়া গ্রাম জাত এই বৌদ্ধ ভিক্ষু মন-প্রাণ সপে দিলেন রাংকূটের হারানো ইতিহাস আর ঐতিহ্যের পুণরুদ্ধারের জন্য। ১৯৭৮ খৃস্টাব্দে তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দ্বারা রাংকূটে বিদ্যুতায়ন করেন। তারই আহ্বানে ১৯৭৭ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহাপরিচালক ডক্টর নাজিমুদ্দিন সাহেব প্রমূখ অনেক পুরাতাত্ত্বিক গণের আগমণ হলো রাংকূট প্রত্নতত্ত্ব এলাকা পরিদর্শনে। তাঁরা ঘুরে ঘুরে প্রায় ১০টি খনন যোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানচিহ্নিত করে তা সুরক্ষার জন্যে কক্সবাজার জেলাপ্রশাসক বরাবরে পত্র প্রেরণ করলেন। কিন্তু, তৎকালীন ডি.সি. মহোদয় এতে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকার সুযোগে স্থানীয় ফরেষ্ট রেইঞ্জ অফিস কর্মীদের যোগসাজসে প্রভাবশালী ভূমিদস্যুগণ ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতির উপর দৈহিক নির্যাতন চালালেন। ১৯৮৯ খৃস্টাব্দে জীবনের হুমকির মুখে তৎশিষ্য ভদন্ত চন্দ্রজ্যোতি

ভিক্ষুর উপর রাংকূট এর দায়িত্ব দিয়ে ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি তৎশিষ্য প্রজ্ঞাবংশের আহ্বানে রাংকূট হতে চট্টগ্রাম মহানগরীর কেন্দ্রিয় বৌদ্ধ বিহার নন্দনকাননে প্রস্থানের সাথে সাথেই ঐতিহাসিক রাংকূট-এর সমগ্র এলাকা ভূমি দস্যুদের আগ্রাসনের শিকার হয়ে গেল এবং বাণিজ্যিক ভাবে প্লট বিক্রি হলো। উদ্দেশ্য মূলক ভাবে ধ্বংস করা হলো বাংলাদেশের প্রাচীনতম প্রত্নতত্ত্ব সমৃদ্ধ রাংকূট-এর দশটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতিচিহ্নকে। ভদন্ত চন্দ্রজ্যোতি মহাথেরোর আমলে রাতের অন্ধকারে ডাকাতির নামে রাংকূট মূল মন্দির চত্ত্বরে ভাংচুর করা হলো শ্বেত পাথরের অনেক প্রাচীন বুদ্ধ মূর্তি; লুট করা হলো ব্রোঞ্জ আর কালো পাথরের বেশ কিছু বুদ্ধমূর্তিও।

রাংকূট এর পুণরুজ্জীবক ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো ঃ

রাংকূট মহাতীর্থের এই ক্রান্তিকালে ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরোর অন্যতম শিষ্য চট্টগ্রাম মহানগরীর নন্দনকানন বিহারের তৎকালীন উপাধ্যক্ষ, এবং বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার তৎকালীন মহাসচিব ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ থেরো (১৯৫০-০০) বি,এ,(অনার্স) এম,এ,(ডবল) ১ম শ্রেণী মহোদয় ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই পুন্যতীর্থ রাংকূটকে শেষ রক্ষার জন্যে। ১৯৯৪ খৃস্টাব্দে ভদন্ত মহোদয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় ইতালিয়ান ফাদার লুইজি লুপির সহায়তায় কারিতাস ইতালিয়ানার অর্থায়নে তিনি রাংকূটে প্রতিষ্ঠা করলেন জগত-জ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম। প্রতিষ্ঠানটির এই নামাকরণে ধারণ করা হয়েছে রাংকূট-এর আবিষ্কারক ভদন্ত জগতচন্দ্র এবং ইহার পুণরুজ্জীবক ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতির পুন্য স্মৃতিকে। বস্তুতঃ বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত এই দৃষ্টি নন্দন শিশুসদনটির অবদানেই রাংকূট তীর্থের সামান্য ভূমি যা অবশিষ্ট ছিল, তা কোন প্রকারে ঘেরা দ্বারা রক্ষিত হলেও রাংকূট এর সমস্ত ভূমি সরকারী খাস ও বনবিভাগের আওতাধীন এখনও থেকেই গেল। আর তারই সুযোগ নিচ্ছে স্থানীয় প্রভাবশালী ভূমি দস্যুগণ। তারা এই জবরদখলের প্রচেষ্টা চরিতার্থ করতে রাজনৈতিক ছত্র ছায়ায় স্থানীয় প্রশাসনকে পর্যন্ত অকার্যকর করে রেখেছে। এ প্রসঙ্গে বারান্তরে আরো বিশদ উল্লেখ করা যাবে।

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো ২০০৮ খৃস্টাব্দের ৩রা জুলাই প্রত্যক্ষভাবে রাংকূট মহাতীর্থের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তৎ গুরুভাই ভদন্ত চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের প্রয়াণের পর। ভদন্ত চন্দ্রজ্যোতি রাংকূটে তাঁর ২৬টি বছর অবস্থানকালে মূলমন্দির পাহাড়ের ভূমি ক্ষয় রোধে, মন্দির চত্ত্বরে হলঘর ও আবাস কক্ষ নির্মাণে এবং ফ্লোরে টাইলস বসানোয়, অসামান্য অবদান রেখে চির বিদায়

নিলেন ২০০৮ খৃস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিলে। অতঃপর ৩রা জুলাইয়ে গুরুভাই ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো ঐতিহাসিক পুন্য তীর্থ রাং-উ রাংকূট এর দায়িত্ব নিয়ে মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে জন্ম দিলেন ঐতিহাসিক বৌদ্ধ তীর্থ রাং-উ রাংকূট/কেন্দ্রিয় সংরক্ষণ কমিটি। শাখা সংরক্ষণ কমিটি গড়ে তুললেন কক্সবাজার জেলাসদরে, উখিয়া উপজেলায়, এবং ঢাকা মহানগরীতে। রাংকূট এর স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে গঠণ করলেন 'রাংকূট মহিলা সমিতি'। শিক্ষায় অনগ্রসর শিশুদের জন্যে চালু করলেন রাংকূট প্রজ্ঞাবংশ ফ্রী কোচিং সেন্টার; যা এখনও অব্যাহত আছে। তিনি রাংকূট বুড্ডিষ্ট ক্রেডিট সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত সহায়কের অভাবে এই উদ্যোগ বছর খানেক পরে থেমে যায়।

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ ও তৎ শিষ্য সংঘের অবদানে মাত্র দুই বছরের মাথায় রাংকূট তীর্থের অবকাঠামোগত ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। তাঁরা একটি আবাস কক্ষ সহ ২টি আবাসিক হল, একটি রন্ধনশালা এবং ৭টি সৌচাগার ও স্নানাগার, একটি ভূগর্ভ ধ্যানাগার, একটি পয়নিষ্কাশন ট্যাঙ্ক এবং ভদন্ত চন্দ্রজ্যোতির স্মৃতি সমাধি ও একটি যাদুঘর নির্মাণ সহ সমগ্র শ্মশান ভূমিতে বনায়ন কর্ম সম্পাদন করেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ইতিমধ্যে তিনি মাননীয় শিল্প মন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া, কক্সবাজার জেলাপ্রশাসক জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম নিজামী মহোদয়গণের সহায়তায় রাং-উ রাংকূট ঐতিহাসিক বৌদ্ধ তীর্থকে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর উন্নয়ন তালিকা ভূক্ত করে এই তীর্থস্থানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দিলেন।

তিনি রাংকূট-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বর্তমান কার্যক্রমের উপর একটি এ্যালবাম যুক্ত বাংলা ও ইংরেজীতে কয়েক হাজার বুকলেট মুদ্রণ করে বিগত দুই বছর যাবত পর্যটক ও তীর্থ দর্শকদের নিকটে বিলি করে যাচ্ছেন। এই দুই বছর ধরে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো ৮/১০ জন ভিক্ষু সহ প্রায় ১০/১২ জন শ্রামণ ও সেবককে রাংকূটের আবাসিক হিসেবে নিত্য শিক্ষাদান ভরণ পোষণের দায়িত্ব বহন করে চলেছেন। তাঁর নিকটে পালি ও ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে বেশ কয়েকজন ভিক্ষু-শ্রামণ বর্তমানে মহান ত্রিপিটকের বিভিন্ন খণ্ডের অনুবাদে আত্ম নিয়োগ করেছেন রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার, সহ চট্টগ্রামের অন্যান্য স্থানে অবস্থান করে।

তিনি ইতিমধ্যে তৎগুরুদেবের হাতে গড়া 'বাংলাদেশ অরিয় ধম্ম বৌদ্ধ পরিষদ' এর পুণরুজ্জীবন সহ 'জগতজ্যোতি প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু পরিষদ' নামে এক শক্তিশালী ভিক্ষু সংগঠণের জন্ম দেন। অপরদিকে তাঁরই পরিকল্পিত 'প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী' এর সকল কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছেন তৎ অর্ধশত শিষ্য প্রশিষ্যগণ।

এভাবে রাং-উ রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থ ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশের বহুমুখি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বলিষ্ট নেতৃত্বে ভবিষ্যতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এক অনন্য তীর্থ পীঠ রূপে প্রতীয়মান হয়ে তার হারানো গৌরব আবার যে ফিরে পাবে, তার অনেক সুলক্ষণ ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে।

রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিকে ফিরে দেখা ঃ বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এযাবত যা পাওয়া গেছে তন্মধ্যে কক্সবাজার জেলার রাং-উ রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহারের প্রাচীনত্ব অদ্যাবধি সর্বোচ্চ আসন অধিকার করে আছে। পুরনো ঢাকার উয়ারি বটেশ্বরে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ কীর্তির প্রাচীন নগরটি কার্বন ১৪ডেটিং পরীক্ষায় খৃস্টপূর্ব ৪৫০ এর পূর্বে নির্মিত বলে অনুমান করা হয়েছে [মাসুম খান এর নিবন্ধ ঃ বংশদ্বীপ স্মরণিকা-২০০৯] কিন্তু কক্সবাজার জেলার রাং-উ রাংকূট বৌদ্ধ বিহারটির বিষয়ে আরাকান রাজবংশের ইতিহাস গ্রন্থ 'ধাঈয়া ওয়াদি রাজোয়াঈং- এর বর্ণনায় খৃস্টপূর্ব ৫ম শতকে ইহার জন্ম দাবী করা হয়েছে। খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকে গ্রীক ভাষায় লিখিত- GEOGRAPHY OF PTOLEMY নামক টলেমির ভ্রমণ বৃত্তান্তে এবং খৃস্টীয় ৭ম শতকে সিংহলী অক্ষরে পালি ভাষায় লিখিত 'ধাতুবংসো' নামক গ্রন্থের বর্ণনা মতে রাং-উ রাংকূট এর সংক্ষিপ্ত সম্প্রসারিত নির্মাণ কার্যক্রম খৃস্টপূর্ব ৩য় শতকেও দৃষ্টিগোচর হয় (১) ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরোর সংগৃহীত তথ্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থ 'রাজর্ষী' এর ৮৭ ও ৮৯ পৃষ্ঠার বর্ণনায় রাংকূট তীর্থকে আরাকান রাজার দূর্গের অভ্যন্তরে ১৫ শতকে ও পরিদৃষ্ট হয়। (২) ৭ম শতকের বিশ্বখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েনসাং এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই রাংকূট তীর্থকে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকেরও অনেক আগের বলে প্রতীয়মান হয় (৩) [হিউয়েনসাং এর দেখা ভারত ঃ ১৯৮ পৃঃ সম্পাদনায় ঃ শ্রী প্রেমময় দাসগুপ্ত -১৯৮২ খৃঃ] তাছাড়া চট্টগ্রামের ইতিহাস লেখক মাহাবুব আলম, এম, নুরুন্নবী এবং পূর্ণচন্দ্র দেব বর্ম্মার বর্ণনায় এই রাং-উ রাংকূট নিয়ে বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এতদ্সত্ত্বেও বর্তমান প্রজন্মের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষকগণের মধ্যে প্রিয় ভাজন মাসুম খান লিখিত "বৌদ্ধ ঐতিহ্য ঋদ্ধ স্থাপত্য ঃ রামকোর্ট বনাশ্রম বিহার" শিরোনামের লেখাটির মতো এত বিশদ্

বর্ণনা এযাবত কোথাও দৃষ্টি গোচর হয়নি। (৪) বৌদ্ধ ঐতিহ্য ঋদ্ধ এই রাংকূট ১৯৭৭ খৃস্টাব্দ থেকে এই পর্যন্ত বাংলাদেশের অনেক খ্যাত নামা প্রত্নতত্ত্ববিদের দ্বারা পরিদর্শন ও সুরক্ষা মূলক মন্তব্য ধন্যই কেবল হয়েছে, কিন্তু এ নিয়ে তেমন উচ্চ-বাচ্য এযাবত হয়নি। তন্মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রাক্তন পরিচালক ডক্টর নাজিমুদ্দিন সাহেব রাংকূট এর দশটি স্থান প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খননযোগ্য বলে চিহ্নিত করে ১৯৭৭ সালে কক্সবাজার জেলার তৎকালিন জেলা প্রশাসক মহোদয়কে দাপ্তরিক ভাবে পত্র দিয়ে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন এসকল স্থান জরুরী সংরক্ষণের জন্যে। কিন্তু, বাস্তবে সামান্যতম পদক্ষেপ ও নেয়া হয়নি সেই জেলা প্রশাসক মহোদয় হতে। ফলে এক পর্যায়ে ভূমি দস্যুদের কবলে পড়ে উক্ত দশটি প্রাচীন স্থাপনার অধিকাংশ বিলুপ্তির পর বর্তমানে যেই ৩/৪ টি মাত্র বিদ্যমান আছে, তাও নানা ভাবে ভূমি দখলের শিকারে পরিণত হয়ে এখন বিপন্ন প্রায়।(৫)

"বৌদ্ধ ঐতিহ্য ঋদ্ধ স্থাপত্য ঃ রামকোট বনাশ্রম বিহার" বংশদীপ স্মারক-২০০৯-এ প্রকাশিত নিবন্ধে কিছু ভুল তথ্য ও মন্তব্য থাকলেও রাংকূট বৌদ্ধ ঐতিহ্যটির উপর লেখকের বিশদ্ গবেষণাধর্মী আলোচনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার মাটিতে হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাস আর ঐতিহ্যের পুণরুদ্ধারে গবেষক মাসুম খান সাহেবের এই আন্তরিক প্রচেষ্টাকে জানাই অসংখ্য সাধুবাদ আর কৃতজ্ঞতা। মাসুম খান সাহেবের নিবন্ধটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে তা সংযোজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং গবেষক ডক্টর আব্দুল মাবুত খান সাহেব 'সংঘরাজ সারমেধ ও বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম' [প্রজ্ঞা ঃ স্মরণিকা ১৭ই মার্চ ২০১০ ঃ মহানন্দ সংঘরাজ বিহার কমিটি; মহামুণি, পাহাড়তলী] (৬) নামক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন- 'রাখাইন রাজওঁয়ে' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় খৃঃ পূঃ ২৬৬৬ থেকে খৃস্টীয় ১৭৮৪ অব্দ পর্যন্ত বহুরাজ বংশ আরাকান শাসন করেছেন। এই রাজবংশগুলির মধ্যে ধন্যবতী, চন্দ্র ও থ্রাউক-এই রাজবংশ ত্রয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই সকল রাজবংশের রাজারা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ। সাম্প্রতিক কালের গবেষণার ফলেও তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

কথিত আছে যে, খৃঃ পূঃ ৬ষ্ট শতাব্দীতে আরাকানে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করে। এই সময় আরাকানের সিংহাসনে ছিলেন ধন্যবতী রাজবংশের সম্রাট চন্দ্র-সুরিয়। একথা সুবিদিত যে, সম্রাট

অশোক বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত বা ধর্ম প্রচারক পাঠিয়ে ছিলেন। তদীয় সন্তান মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাকে শ্রীলংকায় এবং সোণ ও উত্তরা নামক ভিক্ষুদ্বয় ও ব্রহ্মদেশ এবং শ্যামদেশে পাঠানো মিশন এক এবং অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন।....."

মাসুম খান সাহেবের অনুমান সত্য যে, রাংকূট (রামকোর্ট) বনাশ্রম বিহারটির জন্ম সম্রাট অশোকের হাতে নহে, আরো আগে। ইহার জন্ম খৃঃ পূর্ব ৫ম শতকের সমসাময়িক বলে দাবী করলে সন্দেহের কারণ থাকে না। কারণ, ধন্যবতীর রাজা চান্দা-সুরিয়ার আমন্ত্রণে বুদ্ধ তথায় গমণ কালে রাংকূটের এক বৃক্ষ মূলে রাত্রি যাপন করেছিলেন, আর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে এ স্থানে তাঁর বক্ষাস্থি স্থাপিত হবে (ধাতু বংসো ঃ পৃঃ ১০৮-২২পৃঃ)। (৭) ধন্যবতী রাজবংশের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মধ্যভারতের প্রাচীন বৈশালী রাজ্য হতে কিছু ক্ষত্রিয় এবং পাশ্ববর্তী মগধরাজ্য হতে কিছু ক্ষত্রিয় খৃস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাগজ্যোতিষপুর (আসাম) হয়ে এবং গৌড় হয়ে চেতিয়গাম (চট্টগ্রাম) এই দুই পথে বার্মায় এসে ইরাবতী নদের উভয় তীরে রাজ্য স্থাপন করেন। বৈশালীর ক্ষত্রিয় বজ্জীদের স্থাপিত রাজ্যের নামও রাখেন বৈশালী। অপরদিকে মাগধী ক্ষত্রিয়দের স্থাপিত রাজ্যের নাম ম্রোহং বা আরাকান। বৈশালীর বজ্জীদের নাম পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে দোঁড়ায় বজ্জী>বৃজী>বড়ু>বড়ুয়া/বরুয়া। আর মাগধী ক্ষত্রিয়দের নাম পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় মাগধী>মাগহি>মগ>মারম্মা>মারমা; অথবা মাগধী>মাগহি>ম্রোহান>রাক্খান>রাখাইন। ইরাবতী অঞ্চলে বজ্জী তথা বড়ুয়াদের আগমণ ছিল আগে। তাই পরবর্তী আগমণকারী মাগধী তথা মারম্মগণ তাদের প্রতি গৌরবনীয় সৌভ্রাতৃত্ব প্রদর্শনের নিমিত্তে 'মারম্মা ওয়াগ্রী' নামে সম্বোধন করতেন। বৃজীদের স্থাপিত রাজধানীর নাম ছিল 'ধাঈয়া ওয়াদি' তথা ধন্যবতী। মাগধী তথা মগদের রাজধানী ছিল পাথর কিল্লা (ম্রোহং)। ঐতিহ্যগত ভাবে আপন ধর্ম, দর্শন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির অনুসারীদের চোখে তারা কোন কোন সময়ে একই নামে চিহ্নিত হতো। যেমন- বৃটিশেরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক সংগ্রহ কালে, সমধর্মীদের নিয়ে প্লাটুন করতে গিয়ে বড়ুয়া ও মারমা সৈনিকদের নিয়ে গঠণ করলেন 'মগপ্লাটুন'। এই কিছুকাল আগেও এমনকি এখনও চট্টগ্রামে প্রতিবেশি হিন্দু-মুসলমানেরা বড়ুয়া বৌদ্ধ পল্লীকে মগ-পাড়া এবং বড়ুয়াদেরকেও মইগ্যা বা মগ বলে অভিহিত করে থাকেন। বস্তুতঃ বর্তমান বড়ুয়াদের তিনপুরুষ আগেও পোষাক-পরিচ্ছেদে, আচারে-ব্যবহারে, খাদ্যাখাদ্যে, ধর্মে-দর্শনে এমনকি

নামাকরণে (চাতুপ্রং, মমপ্রং, চরপ্রং) পর্যন্ত কোন পার্থক্য ছিল না। ভাষাই ছিল উভয়ের মাঝে কেবল ব্যবধান। রাক্‌খাইন তথা মারমা সম্প্রদায়ের আদিভাষা মাগধী তথা পালি-প্রাকৃত এর উপর চীনা-থাই ভাষার প্রভাব পড়েছে খুব বেশি। অপরদিকে বড়ুয়াদের মাগধী তথা ভাষা পালি প্রাকৃত অন্যকোন ভাষা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজস্ব গতিতে কেবল নিবর্তিত হয়ে চট্টগ্রামী ও আসামী বাংলায় এসে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজগণ গণ আন্দোলনের মুখে ভারত সম্রাজ্য হারালেও তাদের ভাষার সম্রাজ্য (ইংরেজী) এই উপমহাদেশে যেমন অদ্যাবধি অক্ষুন্ন রয়ে গেল, ঠিক একই ভাবে এদেশের বড়ুয়ারা তাঁদের আদি ভাষা পালি প্রাকৃতের বিবর্তিত রূপ আজকের চট্টগ্রামী বাংলা ভাষার রাজত্ব এতদঞ্চলে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের কাছে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'চট্টগ্রামী বাংলার রহস্য ভেদ' (৮) নামক গবেষণা গ্রন্থে পালি প্রাকৃত>চট্টগ্রামী ভাষা>বাংলা ভাষার সম্পর্কটি এভাবে তুলে ধরেছেন-

পালি প্রাকৃত	চট্টগ্রামী	বাংলা
উজু	উজু	ঋজু/সোজা
উজ্বতি	উজ্বতি	তর্ক/গোয়ার্তুমি
উদক্	উদ (বিলাই)	উদবিড়াল
মজ্ঝিম	মাইজ্ঝা/মেজ	মধ্যম
মঙ্কু	মাউঙ্গা	নীরব

বৃহত্তর চট্টল গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে এম, নজরুল হক এম, এ মহোদয় উল্লেখ করেছেন-

"বড়ুয়ারা এই জেলার আদি আর্য বংশধর। পূর্ববঙ্গে তাদের পূর্বে কোন আর্যসন্তান এদেশে আসিয়া ছিল কি-না বলা যায় না।" হক সাহেবের এই দাবী সমর্থনযোগ্য হলেও তৎপরবর্তী উক্তি-

"খৃস্টীয় ৬ষ্ট/৭ম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আর্য বড়ুয়ারা এ জেলায় পদার্পন করেন"- এমন দাবী সঙ্গত কারণে সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ আরাকানের 'ধন্যবতী রাজবংশের ইতিহাস গ্রন্থের তথ্য মতে ধন্যবতীর রাজা চান্দা-সুরিয়ার বংশধরগণ ছিলেন ভারতের মধ্য ভূমি বৈশালীর বজ্জী জাতি। এই বজ্জী জাতির দলটি আসাম হয়ে বার্মার ইরাবতী নদীর অববাহিকায় উপস্থিত হয়ে ছিলেন তারা আসামের ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা (প্রাগজ্যোতিষ পুরে) এবং বার্মার ইরাবতী নদের অববাহিকায় বৈশালী নামে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। বজ্জী জাতির অপর দল, যারা তৎকালীন গৌড়

তথা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ হয়ে আসাম ও পূর্ববঙ্গের দিকে অগ্রসর হলেন তারাই পরবর্তীকালে বজ্জী > বড়ু > বড়ুয়া (চট্টগ্রামে) > বরুয়া (আসামে) এবং বজ্জী > বড়ু > বাড়ুজে > বন্দোপাধ্যায় (পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে) এভাবে নাম পরিবর্তনের ধারায় বর্তমান অস্থিত্ব বজায় রাখলেন। (১০) [মধ্যযুগের গীতি কবিতা 'বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলী' এবং 'অহোম বুরুঞ্জী' ও 'অসমীয়া অভিধান'- দ্রষ্টব্য]

ঐতিহাসিক নজরুল হক সাহেবের 'বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখিত হয়েছে-

"পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ 'চন্দ্ররাজবংশ' ৬ষ্ঠ শতাব্দী হতে ৮ম শতাব্দী ব্যাপী রাজত্ব করেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে এই বংশের বিমল চন্দ্র রাজা হন। তিনি সুপ্রদত্ত, আচার্য রত্নকীর্তি (১৯৮৩ খৃঃ?), অমর সিদ্ধি প্রভৃতি মহাযান সম্প্রদায়ের প্রচারকদের শিষ্য (?) শ্রীগুপ্তের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তখন বিমল চন্দ্রের রাজধানী ছিল চাটগাঁয়ে।"

হক সাহেবের উল্লেখিত রাজা 'বিমল চন্দ্র' এবং 'চন্দ্ররাজ বংশ' আরাকানের 'চান্দা-সুরিয়া' রাজবংশেরই বিস্তার মাত্র এমন অনুমান করলে ভারতের মধ্য ভূমির বজ্জী জাতি যারা আসাম হয়ে বার্মা ইরাবতী অববাহিকায় চলে গেলেন; আর যারা আসাম হতে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হলেন তাদের উভয়ের মেলবন্ধন হয়ে থাকবে চাটগাঁয়ে- এমনই বুঝাবে 'অহোম বুরুঞ্জী' তে তাই চট্টগ্রামী বড়ুয়াদেরকে 'ভাগরিয়া বরুয়া বলে উল্লেখিত হয়েছে। ফলে এমন মেলবন্ধনের সুবিস্তীর্ণ সময়টি তখন হয়ে দাঁড়াবে খৃঃ পূঃ ৫ম শতক বা তারও অনেক আগে খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত। কিন্তু ঐতিহাসিক নুরুল হক সাহেব দাবী করলেন- '৬ষ্ঠ শতকের রাজা বিমল মিত্র মহাযান সম্প্রদায়ের প্রচারকদের শিষ্য শ্রীগুপ্তের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন;' তখন এমন দাবী সমর্থন যোগ্যতা হারায়। কারণ বিশ্বখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (৬২৯-৪৫ খৃঃ) যখন ৭ম শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধন কামরূপ (আসাম) হয়ে পূর্ববঙ্গের 'সমতট' বৃহত্তর চট্টগ্রাম-এর মধ্যবর্তী রামু পর্যন্ত পরিভ্রমণে এলেন তখন তিনি পুণ্ড্রবর্ধনে ('পুন-ন-ফ-তন-ন') দেখলেন- "এখানে কুড়িটির মতন সঙ্ঘারাম আছে। ভিক্ষু আছেন তিন হাজার প্রায়। হীনযান ও মহাযান দু'য়েরই চর্চা করেন তারা। [হিউয়েন সাংয়ের দেখা ভারত ঃ ১৯৫ পৃঃ]

আর 'সন-মো-ত-চ' বা সমতটে এসে দেখলেন- "সাগর কুলে থাকা এ রাজ্যটির আয়তন তিন হাজার লি মতো।..... সত্য ধর্ম অন্যধর্ম দুয়েরই অনুগামী আছেন এখানে। তিরিশটি বা তার

কাছাকাছি সঙ্ঘারাম আছে, প্রায় দু'হাজার ভিক্ষু থাকেন। সকলেই স্থবির শাখার অনুগামী। ..... শহরে বাহিরে একটু খানি গেলে অশোক রাজার তৈরী একটি স্তূপ দেখা যাবে। এর কাছাকাছি একটি সঙ্ঘারাম আছে। সেখানে সবুজ পাথরে (Jade) গড়া একটি বুদ্ধমূর্তি দেখতে পেলাম। মূর্তিটি আট ফুট উচু।

এখান থেকে উত্তর-পূর্বদিকে সাগরকূল ধরে এগিয়ে গেলে শ্রীক্ষেত্র রাজ্যে (Shi-li-cha-to= Burma) আসা যায়।
এরপর দক্ষিণ-পূর্বদিকে গেলে সাগরকূলে কামলঙ্কা (Kia-mo-long-ka=Pegu) আরো পূর্বদিকে গেলে দ্বারপতি (To-lo-pati= Probably Shyam)।

তারপর আরো পূর্বদিকে এগোলে মহাচম্পা (Mo-ho-chem-po)। এরপর দক্ষিণ পশ্চিমে চললে যমনদ্বীপ। এ ছ'টি দেশ এতো পাহাড় পর্বত নদীতে ভরা যে, সেখানে যাওয়া অসম্ভব।

এখানে লক্ষনীয় যে হিউয়েন সাং এই ছয়টি রাজ্যের দিক নির্দেশনা যেখানে দাঁড়িয়ে দিলেন তা যে, বর্তমান রামু উপজেলার তৎকালের রম্যবতী রাং-উর মাটিতে দাঁড়িয়েই, এমন ছবিটি দিবালোকে মতই যেন উজ্জ্বল। রাংকূট তীর্থে হিউয়েন সাং এর দেখা 'অশোক স্তূপ'টি তে সংরক্ষিত 'বুদ্ধের বক্ষাস্থি' টি ধন্যবতী রাজবংশের পরবর্তী প্রজন্ম রাজা চন্দ্রজ্যোতি কর্তৃক খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বর্তমান রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহারের বড়ো মন্দিরে স্থাপিত ৮ ফুট উঁচু স্থানীয় হালকা সবুজ পাথরের মূর্তিটির মস্তকে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এই তথ্য মন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে উল্লেখ ছিল। সাগর পথে রামু উপস্থিত হয়ে হিউয়েন সাং এখান থেকেই উত্তর চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ ভারতের 'তান-মো-লি-তি বা তাম্রলিপ্তির দিকে গেলেন। অতঃপর গেলেন 'কিএ-লো-ন-সু-ফ-ল-ন' বা কর্ণ সুবর্ণ; এসকল রাজ্যে। [হিউয়েন সাং এর দেখা ভারত পৃঃ ১৯৫-২০১ ঃ প্রেমময় দাস গুপ্ত]

পূর্বোক্ত এই দীর্ঘ উদ্বৃতির মূল উদ্দেশ্য আলোচ্য রাং-উ রাংকূট এর ঐতিহাসিক গুরুত্বের পাশাপাশি বঙ্গদেশ চট্টগ্রাম আসাম ও বর্তমান মায়ানমা মাটিতে মধ্য ভারতের বজ্জী জাতি তথা আজকের ঁবড়ুয়া বৌদ্ধদের সঠিক ইতিহাস আর ঐতিহ্যকে পৃথিবীর মুখ দেখানো।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন বছর পর খৃঃ পূঃ ৫৪০ অব্দে রাজা অজাতশত্রু বৃজিরাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন। ফলে অধিকাংশ বজ্জীরা সপরিবারে বৃজিরাজ্য ত্যাগ করে ক্রমে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের গৌড়ে এবং প্রাগজ্যোতিষপুর তথা আসামে আশ্রয় গ্রহণ করে খৃস্টীয় একাদশ শতকে বৌদ্ধ পালরাজা ও অহোমী বৌদ্ধরাজাদের

আমল পর্যন্ত নিরাপদে জীবন যাপন করেন। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতক থেকে খৃস্টীয় ৭ম শতকের মধ্যে কিছু বৃজী ও মগধ বংশীয় লোক বিশেষ করে উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী পুষ্যমিত্র ও গুপ্তবংশীয় রাজাদের অত্যাচারে ক্রমে আসাম হতে একদল বার্মার ইরাবতী নদের অববাহিকায় এবং অপর একদল চৈত্যগ্রাম তথা চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ত্রয়োদশ শতকের বৈষ্ণব পন্থীরাজা কুমারিল ভট্টের ধর্মান্তর করণ অভিযানের হাত থেকে স্বধর্ম রক্ষায় আরো কিছু বরুয়া আসাম তথা কামরূপ থেকে, চট্টগ্রামে পালায়ে আসেন। আসামী বৈষ্ণব পন্থী বরুয়ারা তাই চট্টগ্রামী সেই বরুয়াদেরকে 'ভাগরিয়া বরুয়া' নামে আখ্যায়িত করেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সমাজতাত্ত্বিক ধর্মাধার মহাস্থবির বললেন যে, পূর্বে চট্টগ্রামী বড়ুয়ারা কেহ রাজবংশীয়, কেহ মুৎসুদ্দি, সিকদার, তালুকদার, চৌধুরী ইত্যাদি নামেও পরিচয় দান করতেন। বৃটিশ আমলে এক আসামী বরুয়া চট্টগ্রামে D.C. হয়ে আগমণের সময় থেকে অধিকাংশ বড়ুয়া পূর্বে আত্মপরিচয়ে ফিরে যান। ধন্যবতী রাজবংশের স্রষ্ঠা এই মারমাও বড়ুয়া বৌদ্ধগণের হাজার বছরের একতা ও সংহতির শক্তি এককালে সমগ্র মায়ানমা ভূখণ্ড সহ সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব ভারত উপমহাদেশকে যে সবিশেষ প্রভাবিত করেছিল তারই স্বীকৃতি পাওয়া যায় Department of the Mayanmar Education হতে প্রকাশিত Mayanmar English Dictionary- তে উল্লেখিত History of Mayanmar Alphabet নিবন্ধটিতে। (১০) এখানে এভাবে বর্ণনাটি পাওয়া যায়- "Scripts developed from Brahmi ঃ

5. The first Brahmi script was seen about 500 B.C. It has spread throughout India by 300 B.C. in the reign of king Asoka.
6. After the disolution of the maurya Kingdom established by king Asoka the first, kusana dynasty, and later the Gupta dynasty appeared and ruled in northern India. The Brahmi script gradually changed during those reigns.
   The scripts which devoloped during those reigns were named Kusan and Gupta for the kings. Then such convoluted scripts as kutila and urban Nagari, simple script like Sanskrit and Bengali developed progressively according to region and period. Writing forms

in those scripts become gradually differentiated regionally and historically.

7. In South India, the Andhra dynasty arose after the dissoluation of the Mouryan kingdom. Then arose such dynasties as Pallava, kadamba, Calukya, Rastrakuta and cola. During those dynasties there descend from Brahmi such scripts in the west as pacchimi script, Madhya Pradesh script in the middle reigion, and in the south, such scripts as Telugu, Kanati, academic Grontha, Tamil which are contained in kadamba, Calukya and Rashtrakuta.
8. These Indian scripts descended from Brahmi spread to Tibet, Srilanka, Thiland, Combodia and Indonesia along with ithe Indian beliefs and culture in the period 100 A.D. to 800 A.D. and helped in the developement in those regions of indigenous scripts.

SPRED OF INDIAN SCRIPTS TO MYANMAR ৪

9. During the period 100 A.D. to 1200 A.D when the Brhami script developed gradually into Brahmi derived scripts in India, there developed in Myanmar the civilization of Pyu, Myanmar, Mon and Rakhine. This civilizations communicated with the countries in the East and west. There was specil communication with India in the west by land and sea. Buddhism reached Myanmar very early because of such intercourse....."

উপরোক্ত বর্ণনায় জানা যায় যে, খৃস্টপূর্ব ৫ম শতকের ব্রাহ্মীলিপি খৃস্টপূর্ব ৩য় শতকে সম্রাট অশোক দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে কালক্রমে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভাবে সমগ্র ভারত সহ ইহার প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, তিব্বত, শ্রীলংকা, মায়ানমা, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়াকে প্রভাবিত করেছে; তার ও অনেক আগে স্থল ও জলপথে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বাস মায়ানমাকে

সবিশেষ প্রভাবিত করেছিল। আর সেই প্রভাব বিস্তারে যারা সবিশেষ ভূমিকা রাখেন তারা ছিলেন বার্মার ইরাবতী অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী ভারতীয় জনগোষ্ঠী মাগধী ও বজ্জীরা।

এ প্রসঙ্গে ড. স্বপ্না ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী) লিখিত "মায়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ঃ ভারতীয় দৃষ্টিকোন থেকে পর্যালোচনা" শীর্ষক নিবন্ধে ২নং-এ উল্লেখিত হয়েছে-

"যদিও পাগান রাজন্য বর্গকে (১০৪৪-১২৮৭) বিবেচনা করা হয় বৌদ্ধ ধর্মের নিয়মতান্ত্রিক উন্নতিকারী রূপে, বৌদ্ধ ধর্ম বহুপূর্বেই সুবর্ণ রাজ্যের মাটি স্পর্শ করেছিল। ইহা হয়েছিল ভারত উপমহাদেশের জনগণের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে; যাতে করে নিম্ন বার্মার লোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা লাভ করেছিল। আরাকানের প্রাচীনতম রাজবংশের একটি খৃস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে ধন্যবাদ্দি শাসন করেছিলেন। প্রাচীন আরাকানী ঘটনাপঞ্জী অনুসারে, ৫৮০ খৃস্টপূর্ব থেকে ৩২৬ খৃস্টাব্দ সময়কালে বৌদ্ধ ধর্ম ৩য় ধন্যবাদী রাজ্যে উন্নতি লাভ করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার পাঁচশত শিষ্য সহ রাখাইন রাজ্য (আরাকান) পরিদর্শন করেছিলেন। পরবর্তীকালে বেসালী থেকে চন্দ্র রাজবংশ (ভারতে একই স্থানের নামানুসারে নির্মিত) ৩২৭ খৃস্টাব্দ থেকে ৭৭৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান শাসন করেছিল, তারা থেরবাদ নিকায়ে বৌদ্ধ মতবাদ অবলম্বন করেন, অতিরিক্তভাবে তান্ত্রিক নিয়মের পূজা পদ্ধতি প্রচলন করেন। বেসালীর চন্দ্র রাজগণ বৃহৎ আকার মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ করেন; ফলে বৃহদাকার বুদ্ধমূর্তি ছাড়াও বিষ্ণু, শিব, ও বোধি সত্ত্ব মূর্তি বেসালীর ধ্বংসস্তুপে প্রাপ্ত হয়েছিল।"

কক্সবাজার জেলার রাং-উ রাংকূট ও উপরোক্ত মন্তব্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষ্য বহন করছে। ইহার পূরকীর্তি অধ্যুষিত এলাকা থেকে সংগৃহীত এক মূর্তি বেদীতে মহাযানী বৌদ্ধদের বিষ্ণু নামক হিন্দু গণেশের মূর্তি উৎকীর্ণ দেখে প্রথমে আমি হতভম্ব হয়ে গেছি এই মূর্তির ব্যবহার থেরোবাদের এই ঘাটিতে (৭ম শতকে হিউয়েন সাং এর দেখা) হলো কি করে। উপরোক্ত নিবন্ধের বর্ণনায় এবং আমার দেখা শ্রীলংকার স্মৃতি স্মরণ করে আমি নিশ্চিত হলাম যে, থেরোবাদী শ্রীলংকার প্রাচীন বহু বিহারে আমার দেখা বিষ্ণুমূর্তি (গণেশ) গুলো পূজিত হওয়ার ন্যায় আরাকানের ধন্যবতী (ধন্যবাদ্দি) এবং কক্সবাজারের রম্যবতী রাজ্যের রাং-উ তীর্থেও সেই প্রাচীনকালে পূজিত হয়েছিল বুদ্ধের পাশাপাশি বিষ্ণুদেবও। ইহা বৌদ্ধ মহাযান সংস্কৃতির প্রভাব।

ইরাবতী নদীর অববাহিকার ভারতীয় জনগোষ্ঠকে নিয়ে আমার উপরোক্ত আলোচনার দ্বিতীয় মূল উদ্দেশ্য গবেষক ও ঐতিহাসিক মাসুম খানের অনুমান যে সঠিক তার সমর্থন যোগানো। তিনি অনুমান করেছেন- "সম্রাট অশোকের রাজত্ব কাল হচ্ছে খৃস্টপূর্ব ২৬৮ হতে ২২৮ অব্দ পর্যন্ত মোট ৪০টি বছর। তাই রামকোর্ট (রাংকূট) বনাশ্রম বিহারের জন্ম মায়ানমার তালপত্রের রেকর্ড মতে যদি খৃস্টপূর্ব ৩০৮ অব্দেই হয়ে থাকে তা সম্রাট অশোকের আগেই স্থানীয় ভিক্ষু বা ভিক্ষুসংঘ দ্বারা কোন ধনবান ভক্ত এ বিহার নির্মাণ করেছিলেন।" বস্তুতঃ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই বিহারে সম্রাট অশোক খৃস্টপূর্ব ৩য় শতকে বুদ্ধের বক্ষাস্থি প্রেরণ করার লক্ষ্যে তৎ সম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ৮৪ হাজার চৈত্যের অন্যতম স্তুপ বা চৈত্যটি প্রতিষ্ঠা করায়ে ছিলেন। এমন অনুমান যথার্থ।

আরাকানের ধন্যবতী রাজবংশের ইতিহাস গ্রন্থকে যদি আমরা প্রমাণ্য হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে তৎ বর্ণিত উপাখ্যানটিকে ইতিহাসের অঙ্গীভূত করাতে দোষনীয় কিছু নাই। উল্লেখ আছে যে, "খৃস্টপূর্ব ৫ম শতকে ধন্যবতীর বুদ্ধ ভক্ত রাজা চান্দা-সুরিয়ার ঐকান্তিক প্রার্থনায় বুদ্ধ আকাশ পথে ধন্যবতী নগরে গমণ করেছিলেন।" এই বক্তব্যকে সমর্থন করার মতো অনেক ঘটনার উল্লেখ পবিত্র ত্রিপিটক গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহান ত্রিপিটকে দেখা যায় কোন দূরবর্তী স্থানে গমণ কালে বুদ্ধ তথাগত প্রায়শ তাঁর ঋদ্ধিমান শিষ্য সংঘকে নিয়ে আকাশ পথে গমণ করতেন। তবে সেই একই সময়ে নীহারঞ্জন রায়ের 'বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম' গ্রন্থে আরো একটি কাহিনী পাওয়া যায়। সে সময়ে মগধ বংশীয় সুমাগধা নামে এক ক্ষত্রিয় কন্যার বিয়ে হয়েছিল পুণ্ড্রবর্ধনের রাজার সাথে। বুদ্ধগত প্রাণা এই কন্যার আকুল প্রার্থনায় বুদ্ধ সশিষ্যে পুণ্ড্রবর্ধন নগরীতে (বর্তমান উত্তরবঙ্গের মহাস্থানগড়) গমণ করেছিলেন। (১২) সেই একই যাত্রায় তিনি যদি আরাকানের ধন্যবতীর রাজা চান্দা সুরিয়ার প্রার্থনাপূরণের দায়িত্বও পালন করেন, তাতে সন্দেহের কোন কারণ থাকার কথা নয়। বস্তুতঃ বুদ্ধের সময়েই বঙ্গ ও মায়ানমাতে স্থল ও জলপথে বুদ্ধ-ধর্ম বিস্তার যে ঘটেছিল পিটকীয় গ্রন্থ থেরো গাথা, ধাতুবংশ সহ নানাস্থানে প্রাপ্ত শিলালিপিতে তার বহু প্রমান পাওয়া যায়। (১৩) অতএব, আরাকানের রাজা চান্দা-সুরিয়ার প্রার্থনায় বুদ্ধ আকাশ পথে ঋদ্ধিযোগে গেলেও গমণ পথে ধর্মপ্রচারের বহু বুদ্ধরীতি অনুযায়ী তিনি কোন কোন সময়ে স্থলপথে ও বিচরণ করতেন। সেই সুত্রে চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার হাইতগাঁও এর চক্রশালায়, এবং রামু উপজেলার রাংকূটে ধর্মপ্রচারের স্বার্থে বুদ্ধের সশিষ্যে রাত্রিযাপনের লোক প্রবাদকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

[বৃহত্তর চট্টল ২০পৃঃ এম, নুরুল হক]

'বৃহত্তর চট্টল' নামক ইতিহাস গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক নুরুল হক, এম. এ মহোদয় আরো দাবী করেছেন যে, "বড়ুয়ারা এই জেলার প্রাচীন আর্যবংশ ধর। পূর্ববঙ্গে তাদের পূর্বে কোন আর্য সন্তান আসিয়াছিলেন কি-না, জানা যায় না।" হক সাহেবের এই দাবীর সাথে আরও কিছু তথ্যে একমত পোষণ করা যায় এজন্যেই যে, চট্টগ্রামী প্রবীণ বড়ুয়া মহিলারা গ্রাম-গ্রামান্তরে এখনও স্বামীর মাতাকে শ্বাশুড়ী না বলে- 'আঁজমা' তথা 'আর্যমাতা' সম্বোধন করে থাকেন। এবং ভাসুরকে বলে থাকেন 'বউরগা' বা 'বড় আর্য'।

ধন্যবতী রাজবংশের ইতিহাসে আরো উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ ধন্যবতীর রাজা চান্দা-সুরিয়ার প্রার্থনায় তথা বুদ্ধের সমক্ষে অবিকল অবয়বে বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন। আরাকানের 'মহামুণি' নামে এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক মূর্তিই পরবর্তীকালে ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে বর্মীরাজ বোধফয়া কর্তৃক বর্তমান মান্দালয় শহরে স্থানান্তর করা হয়। [ডক্টর আব্দুল মাবুত খান ঃ সংঘরাজ সারমেধ ও বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্ম]।

বৌদ্ধ সাহিত্যে এমন একটি উপাখ্যান মগধরাজ বিম্বিসারকে নিয়েও আছে। তিনি না-কি বুদ্ধের অবিকল সৌষ্ঠবে চন্দন কাঠের এক মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। বৌদ্ধ জগতে এই মূর্তিটিকে আদি বুদ্ধ মূর্তি বলে ধরা হয়। আসলে ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত সত্য যে বৌদ্ধ জগতে মূর্তি নির্মাণ ও বুদ্ধ মূর্তির প্রচলন শুরু হয়েছিল খৃস্টীয় ১ম শতকে কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের প্রেরণায়। তিনি বংশ গোত্রে ছিলেন গ্রীক দেশীয় যোদ্ধা। গ্রীক দেব-দেবীর মূর্তি গড়া এবং তা উপাসনার যেই রীতি তৎকালে গ্রীসে প্রবর্তিত ছিল সেই আপন সংস্কৃতি প্রভাবিত গ্রীক বংশোদ্ভূত ভারতীয় বৌদ্ধ রাজা সম্রাট কণিষ্ক বৌদ্ধ জগতে সর্বপ্রথম গান্ধার রাজ্যে গান্ধার ভাস্কর্য শিল্পে গ্রীক দেবতা এ্যাপোলোর অনুকরণে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে প্রেরণা দান করেন। অথচ স্বয়ং বুদ্ধ কখনও দেব-দেবীর মূর্তি বা বুদ্ধের নিজের মূর্তি নির্মাণ ও পূজায় উৎসাহিত করেছেন, এমন প্রমাণ মূল ত্রিপিটকে কোথাও মিলে না। অধিকন্তু তিনি প্রায়শঃ বলতেন- "যো মং ধম্মং পস্সতি সো মং পস্সতি"- অর্থাৎ যে আমার দেশিত ধর্মকে দর্শন করতে বা বুঝতে সক্ষম হবে, সে-ই আমার দর্শন পাবে। অতএব, যিনি বুদ্ধের উপদিষ্ট ধর্ম আচরণ করবেন না তিনি কখনও বুদ্ধ অর্থে কি বুঝায় তা বুঝতে পারবেন না।

বুদ্ধ আরো বলেছেন- "চতুসচ্চ বিনিমুত্ত ধম্মং নাম নত্থি"- অর্থাৎ চারিটি সত্য ব্যতীত 'ধর্ম' বলে আমি আর কোন কিছুই প্রকাশ করিনি।

বুদ্ধের প্রকাশিত এই চারি সত্য কি? (১) জীবনে 'দুঃখ' নামক বিষয়টির উপস্থিতি অনিবার্য সত্য। (২) বিনা কারণে এই 'দুঃখ' এর আগমণ হয় না; ইহাও একান্ত সত্য। (৩) এই দুঃখ কিন্তু কারো জীবনে চিরস্থায়ি হতে পারে না। কারণ প্রাণী মাত্রেই স্বীয় দুঃখ হতে মুক্তির আপ্রাণ চেষ্টা অবশ্যই করে থাকে- ইহা 'নিরোধ সত্য'। তৎ সত্ত্বেও দুঃখটি নানা ভাবে জীবনে ঘুরে ফিরে একবার আসে একবার যায়, এভাবে পুণঃ পুণঃ আক্রমণ করে। যেমন- 'ক্ষুধা'র পীড়ন। খাদ্য খেলেই ক্ষুধা জ্বালার উপশম হয়। কিন্তু কার্যকারণ ভিত্তিতে সেই ক্ষুধার পুণরাগমণ সময় মতো হয়েই থাকে। এমনিতরো ধর্মতা জীবনে সমস্ত দুঃখের মধ্যেই বিদ্যমান। অথচ মানব চায় দুঃখের কোন স্পর্শ যেন তার জীবনকে অতিষ্ট না করে। মানব মনের এই প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যেই বুদ্ধ তথাগত আবিষ্কার করেছেন। (৪) 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে এক বিকল্পহীন উপায়; ইহা চতুর্থ আর্যসত্য। তিনি একে বলেছেন মধ্যপন্থী জীবন মার্গ; যার অর্থ পার্থিব ভোগ সুখে নিমজ্জিত না থাকা, আবার ত্যাগের নামে অতিকঠোর জীবনকে গ্রহণ না করা। এই দুই অন্তের মধ্যবর্তী জীবন গঠনের উপাদান যেই আটটি তা হচ্ছে- (১) সম্মাদিট্ঠি যথার্থ সঠিক ধারণা বা বিশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করা, (২) সম্মা বাচা (যথার্থ সৎ বাক্য ভাষণ করা), (৩) সম্মা সঙ্কপ্পো (যথার্থ সৎ সংকল্প গ্রহণ) (৪) সম্মা আজীবো (যথার্থ সৎ জীবিকার্জন) (৫) সম্মা কম্মন্তো (যথার্থ কর্ম সম্পাদন করা) (৬) সম্মা বাযামো (যথার্থ প্রচেষ্টা, (৭) সম্মা সতি (যথার্থ স্মৃতি সংরক্ষণ), (৮) সম্মা সমাধি (যথার্থ বিষয়ে মনযোগ স্থাপন)।

জীবন দুঃখের অবসানগামী উপরোক্ত ৮টি জীবন যাপন উপায় দ্বারা একটি আদর্শ জীবন গঠণের মাধ্যমেই কেবল অর্জন সম্ভব হয় 'নিব্বাণং পরমং সুখং' সব দুঃখহীন পরম সুখ, পরমা শান্তিময় নির্বাণ। ইহাই একমাত্র বুদ্ধের ধর্ম, ইহাই বুদ্ধের দর্শন। মূর্তি তথা দৈহিক অবয়বকে গুরুত্ব না দিয়ে মনন এবং আচরণের উপরোক্ত বিধি-নীতির অনুসরণ এবং অনুশীলনকে বুদ্ধ যেখানে জীবন দুঃখের চির অবসানের একমাত্র পথ বলে ঘোষণা দিয়ে গেলেন, সেই আদর্শ শিক্ষকের অনুগামী যারা, তাদের পাঁচশো বছরের পরবর্তী প্রজন্মের জীবনে কিভাবে বুদ্ধমূর্তি পূজার প্রচলন এলো তৎবিষয়ে উল্লেখ প্রয়োজন।

মানব স্বভাবে 'আবেগ' নামে এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতা বিদ্যমান আছে। ইহা অনুরাগ বর্ধক, চিত্ত প্রসন্নতা উৎপাদক এবং আনন্দ উৎফুল্লতা বর্ধক দৃশ্য বা বিষয় হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। মানব মনে এই আবেগের চাহিদা মেটানোর তাগিদেই জীবিত অবস্থায় বুদ্ধকে

দর্শন এবং শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে দূরদূরান্ত থেকে বুদ্ধের অবস্থান স্থলে ভক্ত অনুরাগীদের নিয়মিত আগমণ ঘটতো। বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পর ভক্ত অনুরাগীরা বুদ্ধের এই দৈহিক উপস্থিতির শূণ্যতা পূরণের তাগিদে প্রথম পাঁচশত বছর অবলম্বন করেছিলেন মহাকারুণিক বুদ্ধের শারিরীক অস্থি খণ্ড বা দেহাবশেষ এবং বুদ্ধের জীবৎকালে ব্যবহার্য চীবর, ভোজন পাত্র ও অন্যান্য দ্রব্য সমাগ্রীকে দর্শন আর শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের বেদী রূপে। তাই এগুলোর সযত্ন সংরক্ষণে ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে নির্মাণ করেছিলেন স্তুপ বা চৈত্য নামকপাথর বা পোড়া ইটের মন্দির স্তুপাদি। বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের শত বছর পরে সম্রাট অশোক যখন তাঁর সমগ্র সম্রাজ্যে এধরণের চুরাশি হাজার চৈত্য নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন সকল চৈত্যে কেবল বুদ্ধের দেহাস্থি খণ্ড গুলোই বিতরণের ব্যবস্থা করতে দেখা যায়। কোথাও সামান্যতম উল্লেখ পাওয়া যায়নি বুদ্ধের মূর্তি বা ছবি জাতীয় কিছু বিতরণ বা প্রতিস্থাপনের।

অতএব বলাই বাহুল্য খৃস্টপূর্ব ৫ম শতকে বুদ্ধের স্বয়ং উপস্থিতিতে আরাকানের ধন্যবতী নগরে মহামুণি বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণকে সম্ভব বলে ধরে নিলেও তৎকালের রম্যবতী নগর এই রামুর রাংকূটে বুদ্ধ মূর্তিটি স্থাপিত হয়েছিল বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের আরো বহুপরে সেই খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের দিকেই। কারণ খৃস্টীয় ৭ম শতকে বিশ্বখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং রাংকূটে যেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন সেদিন তিনি সম্রাট অশোক নির্মিত স্তুপ এবং ৮ ফুট উঁচু সবুজ পাথরের বুদ্ধমূর্তির সন্ধান পেয়েছিলেন।

রাং-উ রাংকূট-এর উৎপত্তি কাহিনী ঃ

বস্তুতঃ ধন্যবতী নগরের খৃঃ পূঃ ৫ম শতকের রাজা চান্দা-সুরিয়ার ৬ষ্ঠ শতকের বংশধর রাজা চন্দ্রজ্যোতির আমলেই নির্মিত হয়েছিল এই বুদ্ধ মূর্তি এবং তিনিই সম্রাট অশোক প্রেরিত বুদ্ধের সেই বুকের অস্থি খণ্ডকে তৎনির্মিত বুদ্ধ মূর্তির মস্তকে স্থাপন করেছিলেন। আর তখন থেকেই প্রাচীন রম্যবতী নগরের নাম পরিবর্তিত হয়ে রাং-উ হয়ে যায়। পাহাড় চুড়ায় বুদ্ধের বুকের অস্থি স্থাপিত হয়েছিল বলে- এ স্থানের নাম হয় রাংকূট। 'রাং' ইহা আরাকান ভাষা জাত শব্দ। আরাকানী ভাষায় বুকের অস্থিকে 'রাং' বলা হয়। আরাকানীরা 'উ' শব্দ বা অক্ষরটি ব্যবহার করে থাকেন শ্রদ্ধেয় বস্তু বা ব্যক্তির নাম উচ্চারণ কালে। যেমনটি বাংলা ভাষায় সম্মানিত কারো নাম উচ্চারণে সম্মান প্রদর্শনার্থে, শ্রী, জনাব, শ্রদ্ধেয়, ভদন্ত- ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে, আরাকানীরা ঠিক একই ভাব প্রকাশে 'উ' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। যেমন বর্মী সন্তান জাতি সংঘের সেক্রেটারী যিনি ছিলেন- সেই 'থানট'

মহোদয়কে বলা হতো 'উ-থানট' । অনুরূপ ভাবে পরম শ্রদ্ধার পাত্র বুদ্ধে বুকের অস্থিকে উচ্চারণ কালে 'উ' শব্দটির সংযোজনে 'রাংউ' বলা হলো । আর সেই 'রাং-উ' নামক পবিত্র নামটিই পরবর্তীকালে এতদঞ্চলের সামগ্রিক পরিচিতির প্রতীক হয়ে পুরো অঞ্চলটার নামই হয়ে গেল 'রাং-উ' । ক্রমে শব্দ বিপর্যয়ে, উচ্চারণ অশুদ্ধিতার শিকার হয়ে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে বিশাল ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারক সেই 'রাং-উ' হয়ে গেল 'রামু' । যেমনটি হয়েছে চট্টগ্রাম এর বেলায় । চট্টগ্রাম অঞ্চলটিতে খৃস্টপূর্ব ৫ম শতকের পরবর্তী কালে বৌদ্ধ গণের দ্বারা পাহাড়ে-পর্বতে, গ্রামে-নগরে বহু চৈত্য স্থাপিত হয়েছিল বুদ্ধের উদ্দেশ্যে । তাই পুরো অঞ্চলটির নাম ছিল 'চেতিয়াগাম' অর্থাৎ চৈত্য বিশিষ্ট অঞ্চল বা গ্রাম । ইহা একটি বিশুদ্ধ পালি প্রাকৃত ভাষার শব্দ । 'চেতিয়া' অর্থে চৈত্য বা মন্দির বা জাদি বুঝায় । 'গাম' অর্থে গ্রাম । কালে শব্দ বিপর্যয়ে সেই 'চৈত্য' হয়ে গেল চট্ট । চাঁটি; আর 'গাম' হয়ে গেল 'গ্রাম' । দু'য়ে মিলে হলো চট্টগ্রাম>চট্টলা>চাঁটিগাও । ফলটি এভাবেই দাঁড়ালো চেতিয়গাম । চেতিয়গাম>চট্টগ্রাম>চাঁটিগা>চট্টলা>চিটাগং ইংরেজেরা এই শব্দটি উচ্চারণে অক্ষম হয়ে বললেন Chittagong । বস্তুতঃ বিদেশী ভিন্ন ভাষা-ভাষীরা নামের এরূপ বিকার সাধন করে উচ্চারণ অক্ষমতায় যেমন চীনারা 'বাংলাদেশ' এই শব্দটির উচ্চারণ করেন 'মঞ্জালা' । কিন্তু স্বদেশী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হাতে এই উচ্চারণ বিপর্যয় হয়ে থাকে ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্যমূলক ভাবে । ইহা কখনও কখনও পর ধর্ম বা পরমত অসহিষ্ণুতা জাতই হয়ে থাকে । যেমন- হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা কোন স্থান বা প্রতিষ্ঠানের নামাকরণে তাঁদের উপাস্য দেবতার নামে মহাদেবপুর রাখলেন (রাউজান উপজেলা সদর) । পাকিস্তান আমলে ইসলামিক উগ্রতায় সেই 'মহাদেবপুর' বর্তমানে 'মুহম্মদপুর' নামেই পরিচিত । আমাদের রাজনৈতিক নেতারাও ইদানিং একই ঈর্ষা কাতরতার শিকার হয়ে বিমান বন্দরের নাম, সড়ক-মহাসড়ক, এভিনিউ, চত্ত্বর প্রতিষ্ঠান এগুলোর নাম অহরহ পরিবর্তনের সংস্কৃতি চালু করেছেন ।

সুপ্রাচীন ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারক এক কালের রাং-উ এবং রাংকূট শব্দ দ্বয় ও একই মানসিকতার শিকার হয়ে 'রাং-উ' হয়ে গেল 'রামু' আর 'রাংকূট' হয়ে গেল 'রাম-কোট' । অথচ ভারত উপমহাদেশের প্রায় সবাই জানেন যে, রামের জন্ম স্থান দক্ষিণ ভারতের অযোধ্যায় । তিনি বনবাসে যেই পঞ্চবটি বনে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাও সে অঞ্চলেই । সীতার রূপ মুগ্ধ লংকাদ্বীপের রাজা রাবণ সেই রূপসী সীতাদেবীকে পঞ্চবটি বন হতে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন স্ব-রাজ্য লংকাদ্বীপে । তাই সীতা উদ্ধারে রাম-রাবণে

যুদ্ধ হয়েছিল সেখানেই। বিশ্বখ্যাত মহাকাব্য 'রামায়ণ' গ্রন্থের স্পষ্ট বর্ণনা ইহাই।

কিন্তু, ভারত উপমহাদেশের সর্ব দক্ষিণ পূর্ব বিন্দু এই কক্সবাজার অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায় কোন মানসিকতার বশে বৌদ্ধ ইতিহাস আর ঐতিহ্য সমৃদ্ধ রাং-উ এবং রাংকূটকে ভূমি জরীপে রামু এবং রামকোট বানালেন তা প্রশ্ন সাপেক্ষ বৈ-কি।

'ধাঈয়া ওয়াদি রাজোয়াঈং'- (১৩) নামক আরাকানের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে- ধার্মিক রাজা সম্রাট অশোক তৎ সম্রাজ্যের সর্বশেষ দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত সীমায় পশ্চিম সমুদ্রের পূর্বকুলে পর্বত চূড়ায় ৮৪ হাজার চৈত্যের অন্যতম চৈত্যটি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি 'ধাতুবংশ' নামক পিটকীয় গ্রন্থে (১০৮-২২ পৃঃ) উল্লেখিত বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীর নির্দেশনায় বুদ্ধের বুকের অস্থি খণ্ডটিই প্রেরণ করেছিলেন রম্যবতী নগরের চৈত্যে সংরক্ষণের জন্যে। আর বর্তমান রাংকূট বুদ্ধ মূর্তিটি তৎপরবর্তীকালে খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা চন্দ্রজ্যোতির আমলে নির্মিত। এ সময়ে তিনি সম্রাট অশোক নির্মিত পুরো চৈত্যটি সংস্কার সাধন করে প্রতিষ্ঠানটিকে মহাতীর্থে রূপদান করেন। রাংকূট মন্দির চৈত্যের বর্তমান অবস্থাটি সেই ৬ষ্ঠ শতকের। গবেষক মাসুম খান সাহেব এই সনটিকে দ্বাদশ শতকে নিয়ে এসেছেন "বৌদ্ধ ঐতিহ্য ঋদ্ধ স্থাপত্য ঃ রামকোর্ট বনাশ্রম বিহার" নামক নিবন্ধটিতে। রাজা চন্দ্রজ্যোতি ৭ম শতাব্দীর ব্যক্তি না হলে তৎপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ মূর্তির সন্ধান ৭ম শতাব্দীর পরিব্রাজক হিউয়েন সাং পেলেন কি করে? কথিত আছে রাজা চন্দ্রজ্যোতি এক পর্যায়ে রাজ্য ভার তৎউপযুক্ত সন্তান চেঁদির উপর অর্পন করে তিনি ভিক্ষুত্ব ধর্ম গ্রহণ করেন। এ সময়ে তিনি তাঁর প্রাদেশিক রাজ প্রাসাদ বর্তমান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান স্থর 'রাজবাড়ীয়ার' অদূরে পশ্চিমের পর্বত শিখরে ধ্যান-সাধনায় দিন অতিবাহিত করতেন। ফলে, সেই সাধন পীঠের নাম হয় চন্দ্রনাথ ধাম (বর্তমানে সীতাকুণ্ড নামে হিন্দুতীর্থ); আর সমগ্র পর্বতটির নাম হয় 'চন্দ্রনাথ পাহাড়'। সাধনায় ঋদ্ধিময় সিদ্ধি লাভের পর ধর্ম প্রচারে তিনি হাটহাজারী উপজেলার কাটির হাটের (কোটের হাট) মন্দা কিনিতে, দক্ষিণ ফটিকছড়ির কোঠের পাড়ে (জাঁহাপুর), রাউজান উপজেলার কদলপুর মহামুণি পাহাড়তলীতে, চট্টগ্রাম মহানগরীর আন্দরকিল্লা এবং দেবপাহাড়, দক্ষিণ পটিয়ার জুলদার দেয়াং পাহাড়ে ও উত্তর পটিয়ার চক্রশালায় ও ঠেগরপুণিতে, আনোয়ারার বড়ো উঠান-ঝিঁয়রীতে, সাতকানিয়ার চেঁদিরপুনিতে, রামুর রাংকূট-এ অবস্থান করেন। পিতার ধর্মপ্রচার জীবনে অবস্থান স্মৃতিধন্য এসকল স্থানে তৎপুত্র রাজা চেঁদি

পরবর্তীকালে মন্দির, পুকুর, কোট বা দূর্গ ইত্যাদি স্থাপন করেন। সীতাকুণ্ডের পর্বতে বুদ্ধমূর্তি ও মন্দির, মন্দাকিনি তীর্থে স্নান ঘাট, কাটির হাট ও কোঠের পাড়ে দূর্গ, আন্দরকিল্লায় প্রাপ্ত বিশাল বুদ্ধমূর্তি (চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে রক্ষিত), ঝিয়রিতেও দেয়াং পাহাড়ে প্রাপ্ত অনেক ছোট বড়ো বুদ্ধমূর্তি ও পুরাকীর্তির নিদর্শন (চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে রক্ষিত), পটিয়ার জংলী গোয়াই এবং ঠেগরপুণিতে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি, মন্দিরও পুকুর, চক্রশালায় প্রাপ্ত বুদ্ধ মন্দির ও মূর্তি, চেঁদিপুণিতে দিঘী ও প্রাচীন মন্দির, রাংকূটে বিশাল পুরাকীর্তি অধ্যুষিত পাহাড় ও টিলা এবং পুরাকীর্তির স্থাপনা ও নিদর্শন সমূহের মধ্যে রাজা চেঁদির স্মৃতি বিজড়িত অনেক কিছু বিদ্যমান আছে।

উল্লেখ্য যে, রাংকূট মহাতীর্থের একাংশ এক সময়ে চন্দ্রজ্যোতি বিহার নামেও পরিচিত ছিল। কারণ, রাজা চেঁদির পিতা চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির বহুকাল এই রাংকূটে অবস্থান করেন। তখন রাংকূটের সমৃদ্ধি ছিল তুঙ্গে। সাতশত ভিক্ষু অধ্যুষিত এই রাংকূট তখন মহাবিহারে রূপ নিয়েছিল। এই বিহারে শিক্ষা গ্রহণকারী ভিক্ষুরাই সমগ্র মায়ানমা, এবং বাংলার নানা স্থানে বিচরণ করে তখন বুদ্ধের ধর্ম-প্রচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হতেন। ষোড়শ শতাব্দীর ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে মোগল সেনাপতি ফতেখাঁ কর্তৃক চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার ও রাংকূটের বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন আক্রান্ত হয় তখনও রাংকূটে ৭শত ভিক্ষুর অবস্থান ছিল বলে জানা যায়। এ আক্রমণে বহু সংখ্যক ভিক্ষু এবং গৃহী নিহত হয়। আর তাঁদেরই দেহ সমাহিত হয় রাংকূট-এর ধনু আকৃতির পাহাড়ের পূর্ব ও পশ্চিম পাশের বিস্তীর্ণ শ্মশান ভূমিতে। নিহত ভিক্ষু-গৃহীদের স্মৃতি সৌধ রূপে রাংকূটের উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত পাহাড়ের ঠিক মধ্যখানে নির্মিত হয় দুটি যুগল স্মৃতি সৌধ। ইহাদের একটিতে এখনও বুদ্ধ মূর্তি বিদ্যমান আছে, এবং অপরটি হিন্দুরা দখল করে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছেন।

অনুমান করা হয় যে, বড়ুয়াদের পূর্বপুরুষ রাজভিক্ষু চন্দ্রজ্যোতি রাজা চেঁদি ধন্যবতীর রাজা চান্দা-সুরিয়ার স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্যেই চৈত্যগ্রামের বড়ুয়া সন্তান চাইঙ্গা ঠাকুর ষোড়শ শতাব্দীতে আরাকানের মহামুণি তীর্থে গমণ করেন এবং তথাকার মহামুণি বুদ্ধমূর্তির ছবি অঙ্কন করে চট্টগ্রামের কদলপুরে তথা বর্তমান মহামুণি পাহাড়তলীতে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত করেন। এপ্রসঙ্গে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সমাজে একটি জনপ্রিয় প্রবাদ এভাবেই লোক মুখে শোনা যায়-

"ছোট খাটো চাইঙ্গা ঠাকুর,
এত বুদ্ধি জানে;
রোসাং এর মহামুণি,
কদলপুরে আনে।"

দুর্ভাগ্যক্রমে এই ইতিহাস ও ঐতিহ্য মণ্ডিত বুদ্ধ মূর্তিটি পরবর্তী কালে বিংশ শতকে দায়িত্ব প্রাপ্ত বিজয়ানন্দ নামে রাজগুরু মহোদয় সংস্কারের নামে পূর্বের অবয়ব সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে ফেলেন।

অপরদিকে ১৭৮০ খৃস্টাব্দে বর্মীরাজ বোধফয়া আরাকান আক্রমণ ও অধিকার করে মহামুণি বুদ্ধমূর্তিটি আরাকানের কেয়ক্ত শহরের শিলাগিরি পর্বত হতে আপার বার্মার মান্দালয় শহরে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। এবং এখনও তা সগৌরবে তথায় বিদ্যমান আছে।

গবেষক মাসুম খান রামুর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে গিয়ে ঐতিহাসিক পূর্ণচন্দ্র দেবর্ম্মা প্রণীত 'চট্টগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থের উদ্বৃতিতে উল্লেখ করেন যে, "আরাকানের 'রাজোয়াং' গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, অতিপুরা কালে আরাকান রাজ্যে কাশীধামের কোন নৃপতি আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার অনেক পুত্রগণের মধ্যে কোমি সিংহ আরাকান রাজ্য প্রাপ্ত হন। এবং বর্তমান চাঁদা শহরের নিকটবর্তী রামাবতী বা রামারী নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। .....মহারাজোয়াং মতে এই মরু বা মৌরিয় বংশের রাজাগণের সিংহাসন অধিগ্রহণের কাল খৃঃ পূঃ ২৬৬৫ বৎসর। এই বংশীয় রাজাগণ ১৮৩৩ বৎসর তথায় রাজত্ব করেন। এ থেকে অনুমান করা যায় বুদ্ধদেবের জন্মের আগেও 'রামরি' বা 'রামবতী' পরবর্তীতে 'রামু'র ঐতিহাসিক ভূমিকা। এমন প্রসিদ্ধ স্থানে সম্রাট অশোক বিহার নির্মাণ করবেন না, তা ভাবা যায় না। আর বিহারের সংখ্যা যদি চুরাশি হাজার, তা হলে তো কথাই নাই।"

এখানে লক্ষণীয় যে, চৌধুরী পূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহোদয় প্রথমে 'আরাকানের রাজোয়াং' নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, পরবর্তী কয়েক লাইনের ব্যবধানে লিখলেন 'মহারাজেয়াং'। প্রশ্ন থাকছে- এ দুইটি এক, না ভিন্ন গ্রন্থ? যদি একই গ্রন্থ হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় 'আরাকান রাজ্যে কাশী ধামের কোন নৃপতি আসিয়া বাজ্য স্থাপন করেন'- এই উক্তির সাথে পরবর্তী বক্তব্য- 'মরু বা মৌরিয় বংশের' সাথে কোন অবস্থাতেই সম্পর্ক যুক্ত নহে। কারণ ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে 'মগধরাজ্য' এবং 'কাশীরাজ্য' বরাবরই দুই পৃথক রাজার দ্বারা শাসিত ছিল। মগধ রাজ্য একপর্যায়ে খৃঃ পূঃ ৩য় শতকে মৌরিয় তথা মৌর্যবংশের চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা প্রথম শাসিত হতে থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা বিন্দুসার; রাজা বিন্দুসারের

পর তৎপুত্র রাজা অশোক পরাক্রান্ত হয়ে বিশাল সম্রাজ্যের অধিকারী হন [2500 Years of Buddhism: Bapat P.V Publication Socity, Kendy, Srilanka] ।

বস্তুতঃ মৌরিয় তথা মৌর্য বংশের উত্থান খৃস্ট পূর্ব ৪র্থ থেকে ৩য় শতকের মধ্যেই হয়েছিল কখনও ২৬৬৫ খৃস্ট পূর্বাব্দে নহে । রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং গবেষক ডক্টর আব্দুল মাবুত খান সাহেব বলেন- "রাখাইন রাজওঁয়ে" নামক গ্রন্থে থেকে জানা যায় খৃঃ পূঃ ২৬৬৬ থেকে ১৭৮৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বহু রাজবংশ আরাকান শাসন করেছে; এই রাজবংশ গুলির মধ্যে ধন্যবতী, চন্দ্রবংশ, ও থ্রাউক বংশের নাম উল্লেখযোগ্য ।"

আসলে ইতিহাসের সন তারিখ নিয়ে চুলছেড়া অংক না কষে এখানে যদি ঘটনার বর্ণনাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়, তাহলে ঐতিহাসিক পূর্ণচন্দ্রের পরবর্তী বক্তব্য- 'মৌরিয় বংশ' থেকে 'রমারি' বা 'রামাবতী' এবং পরবর্তীতে 'রামু' নামের উৎপত্তি কিছুটা মেনে নেয়া যায় । তবে অনেক ঐতিহাসিকের মতে এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মেও 'রমারি'>রমাবতী>রম্যবতী হওয়া কিছুটা যক্তি সংগত । কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধিটি অনেক ঐতিহাসিককে নিজের পাতে ঝোল ফেলার চেষ্টায় রত রাখতে দেখা যায় । তাই ঐতিহাসিক পূর্ণচন্দ্র মহোদয় মগধের মৌর্যবংশকে 'কাশী ধামে' নিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে আরাকানে নিয়ে এসে 'রামুতে' বসালেন । আর এপথ ধরেই বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ধারক 'রাং-উ' আজ 'রামু' হয়ে গেল, এবং 'রাংকূট' হয়ে গেল 'রামকোট' । কলম, মুখ, বাহু ও অর্থের জোর যার থাকে এ পৃথিবীতে তারাই বীর । আর সংস্কৃত শাস্ত্রীয় বাণী 'বীরভোগ্য বসুন্ধরা' কথাটি তাদের জন্যেই প্রণীত হয়েছে । তাই আমার চোখের সামনেই দেখলাম হিন্দু আমলের 'মহাদেবপুর' মুসলিম আমলে অনায়াসে 'মহম্মদপুর' হয়ে গেছে ।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডক্টর আব্দুল মাবুদ খান মহোদয় ২৬৬৬ খৃঃ পূঃ থেকে ১৭৮৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানে রাজত্বকারী রাজাদের সকলেই যেখানে বৌদ্ধ বলে উল্লেখ করলেন, সেই রাজাগণের পরবর্তী বংশধরগণ রাং-উ কে 'রামু' বা রাংকূট কে 'রামকূট' বলে গর্বীত হতেন কি-না সন্দেহ । অথচ পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক চৌধুরী পূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মণ মহোদয়ের প্রদর্শিত পথে বৃটিশ আমলে হিন্দু R.S. ভূমি জরীপ কর্মকর্তা এবং তৎকালে ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের কমিশনার G.K.Bose মহোদয় এর আশীর্বাদে 'রাং-উ' হয়ে গেল 'রামু', আর 'রাং-কূট' হয়ে গেল 'রামকোট' । রামের জন্মের ৬০ হাজার বছর আগেই ঋষি বাল্মিকী রামায়ণ রচনা করতে যেখানে

অসুবিধা হয়নি, সেস্থলে রাংকূটে সীতার পঞ্চবটি বন, এবং বৌদ্ধ ইতিহাসের প্রমাণ্য দলিল শিলালিপিকে ঘষে মেঝে সীতার পাটা বানাতে ঠেকায় কে?

ভারত উপমহাদেশে কিছু কিছু স্থানের নামের সাথে 'কোট' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়; যেমন- পাকিস্তানের শিয়ালকোট, ভারতের সীতাকোট, বাংলাদেশের চট্টগ্রামে কোঠের পাড়, কোটের হাট (কাঠির হাট), কক্সবাজারের উখিয়ার কোটবাজার, রামুর রামকোট, এই 'কোট' শব্দটি হিন্দিতে দূর্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়। মোগল আমলে 'কোট' শব্দটি ফার্সী ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'কেল্লায়' রূপান্তরিত হয়। যেমন ভারতের 'রাওর কেল্লা' বা চট্টগ্রামের 'আন্দরকিল্লা', আরাকানের পথরকিল্লা এ সকল দূর্গ অর্থে ব্যবহৃত। বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও আকিয়াব মোগল ও বৃটিশের অধিকারের আগে ১৫৮৫ খৃস্টাব্দে আরাকান রাজা মংফলা-উ এর সাথে ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের যেই যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে রাংকূট এলাকা মংফলা-উ এর দূর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর তখন বৈষ্ণব রাজা অমর মণিক্য ইহা দখল করে সম্ভবতঃ 'রাংকূট' কে 'রামকোট' নামে উচ্চারণ করে থাকলে ও তা ভূমির দলিলে রেকর্ডকৃত হয়নি।

ঊনবিংশ শতকের গর্বীত বাঙ্গালী বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ১৮৮৭ খৃঃ লিখিত তাঁর 'রাজর্ষী' উপন্যাসের ৮৭ পৃষ্ঠায় 'রামু'র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে গিয়ে ও 'রামকোট' শব্দটি ব্যবহার করেন নি। তিনি বর্ণনাটি এভাবেই দিলেন-

"রামুর দক্ষিণে রাজার কুলের নিকটে মগদিগের যেই দূর্গ আছে, আরাকান রাজের অনুমতি লইয়া সেইখানে তিনি (গোবিন্দ মণিক্য) বাস করিতে লাগিলেন।

গ্রামবাসীদের যতগুলো ছেলে পিলে ছিল, সকলেই দুর্গে গোবিন্দ মাণিক্যের নিকটে আসিয়া জুটিল। গোবিন্দ মাণিক্য তাহাদিগকে লইয়া একটা বড়ো পাঠশালা খুলিলেন।

ছেলেরা সাধারণত যে নিতান্তই স্বর্গ ইহতে আসিয়াছে এবং তাহারা যে দেব শিশু তাহা নহে, ...এই জন্য মগের দূর্গে মগের রাজত্ব হইয়া উঠিল- (রাজর্ষি ঃ পৃঃ ৮৭)

রাজর্ষি গ্রন্থের একই পষ্ঠায় 'ত্রিচত্বারিংশ' পরিচ্ছেদে স্যারজন স্টুয়ার্ট মিল কৃত 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থ হতে আরো একটি ঐতিহাসিক উদ্বৃতি এখানে প্রণিধান যোগ্য। ইহা মোগল আমলের ষোড়শ শতাব্দীর ঘটনা-

"এদিকে শাহ্ সুজা তাঁহার ভ্রাতা ঔরংগ জীবের সৈন্য কর্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এলাহাবাদের নিকটে যুদ্ধ

ক্ষেত্রে তাহার পরাজয় হয়। যেখানেই যান পশ্চাতে শত্রুসৈন্যের ধুলি ধ্বজা ও তাহাদের অশ্বের ক্ষুরধ্বনি তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে সুজা কহিলেন, "আর যুদ্ধ করিব না। চট্টগ্রামের বন্দর হইতে জাহাজ লইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব।"

বলিয়া ঢাকা ছাড়িয়া ছদ্মবেশে চলিয়া গেলেন। (রাজর্ষি-৮৯ পৃঃ) অতঃপর রাজর্ষির ৮৯ পৃষ্ঠার চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদের বর্ণনা এরূপ-

"যে দূর্গে গোবিন্দ মাণিক্য বাস করিতেন, একদিন বর্ষার অপরাহ্নে সেই দূর্গের পথে একজন ফকির, সঙ্গে তিনজন বালক ও একজন প্রাপ্ত বয়স্ক তল্পিদার লইয়া চলিয়াছেন। বালকদের অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতেছে। মধ্যম বালকটি ফকির কে জিজ্ঞাসা করিল, পিত! আমরা কোথায় যাইতেছি? ফকির কহিলেন "ঐযে দুর্গের চূড়া দেখা যাইতেছে, সেখানে যাইতেছি।"

"ওখানে কে আছে পিতা?"

"শুনিয়াছি কোথাকার একজন রাজা সন্ন্যাসী হইয়া ওখানে বাস করেন।"

"রাজা সন্ন্যাসী কেন হইল পিতা!"

ফকির কহিলেন, "জানিনা বাছা! হয়তো তাহার আপনার সহোদর ভ্রাতা সৈন্য লইয়া তাহাকে একটা গ্রাম্য কুকুরের মতো দেশ হইতে দেশান্তরে তাড়া করিয়াছে। রাজ্য ও সুখ সম্পদ হইতে তাহাকে পথে বাহির করিয়া দিয়াছে। এখন হয়তো কেবল দারিদ্রের অন্ধকার ক্ষুদ্র গহ্বর ও সন্ন্যাসীর গেরুয়া বসন পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার একমাত্র লুকাইবার স্থান। আপনার ভ্রাতার বিদ্বেষ হইতে, বিষদন্ত হইতে, আর কোথাও রক্ষা নাই।

বলিয়া ফকির দৃঢ় রূপে আপন ওষ্ঠাধর চাপিয়া হৃদয়ের আবেগ দমন করিলেন। ...." (রাজর্ষি-৯০পৃঃ)

"সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দুর্গে সন্ন্যাসী ও ফকিরের দেখা হইল। উভয়েই উভয়কে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন.... (রাজর্ষি-৯১ পৃঃ)

রাজর্ষি গ্রন্থের উপসংহার ঃ

"এই খানে বলা আবশ্যক তিনটি বালক সুজার তিন ছদ্ম বেশী কন্যা। সুজা মক্কা যাইবার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গুরুতর বর্ষার প্রাদুর্ভাবে একখানিও জাহাজ পাইলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার পথে, গোবিন্দ মাণিক্যের সহিত দুর্গে দেখা হয়।"

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, কবিগুরু এই শেষের বাক্যে রামু এবং চট্টগ্রাম বন্দরের ভৌগলিক অবস্থান জ্ঞানে দুর্বল বিধায় লিখেছেন- "....গুরুতর বর্ষার প্রাদুর্ভাবে একখানিও জাহাজ পাইলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার পথে, গোবিন্দ মাণিক্যের সহিত দুর্গে দেখা হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর হতে রামুর দুর্গটি সর্বশেষ দক্ষিণে প্রায় সাগর পাড়েই অবস্থিত। তারও দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত হচ্ছে আরাকান রাজ্য। অতএব, সঙ্গত কারণেই বলা যায়- শাহ সুজা চট্টগ্রাম বন্দর হতে ফেরার পথে নহে, বরঞ্চ নিরাপদ স্থান লাভের উদ্দেশ্যেই আরো আরো দক্ষিণে অবস্থিত আরাকান রাজের নিরাপদ আশ্রয় লাভের প্রত্যাশায় যাত্রা পথে- "গোবিন্দ মাণিক্যের সাথে দূর্গে দেখা হয়।"

".....কিছু দিন দূর্গে বাস করিয়া সুজা সংবাদ পাইলেন এখনো সম্রাট সৈন্য তাহাকে সন্ধান করিতেছে। গোবিন্দ মাণিক্য যানাদি বিস্তর অনুচর সমেত তাঁহার বন্ধু আরাকান পতির নিকটে তাঁহাকে প্রেরণ করেন।.....

এদিকে বিশ্বাসঘাতক আরাকান পতি সুজাকে হত্যা করিয়া তাহার সর্ব কণিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করেন।....."

১৬৯৬ খৃস্টাব্দে গোবিন্দ মাণিক্য মানব লীলা সংবরণ করেন। ...." (রবীন্দ্র নাথ কর্তৃক শেষ দুই প্যারাগ্রাফ শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত)

ত্রিপুরার ইতিহাস গ্রন্থে শ্রী কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহোদয় 'শাহ সুজার হত্যা' সম্পর্কীয় যেই বর্ণনা দিলেন তা বেশ বিতর্কিত। তিনি আরাকান রাজাকে শাহ সুজার হত্যাকাণ্ডের জন্যে 'বিশ্বাসঘাতক' এমন অপবাদ কখনও দিতে পারতেন না, যদি আরাকান রাজ সভায় রচিত মহাকবি আলাওলের (১৫৯৭-১৬৭৩) 'হস্তপয়কর' (১৬৬০ খৃঃ) গ্রন্থটি পাঠ করতেন। অথবা Alexander Daw, London কর্তৃক প্রণীত The History of Hindustan (1872) গ্রন্থের ৩২৭-৩১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ঘটনার বিবরণটি দেখতেন। এই গ্রন্থ এবং আকিয়াবে প্রাপ্ত তালপাতার পুঁথি অবলম্বনে Maurice Callis লিখিত The land of the Great Image (1943) গ্রন্থদ্বয় এর আলোকে লিখিত এবং ২০০৮ খৃস্টাব্দে আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত 'আলাওল পদ্মাবতী' (১৯৬৮) নামক গ্রন্থের ভূমিকাটিতে আরাকান রাজত্ব এবং আরাকান রাজ্যে শাহ সুজার আগমণ ও তাঁর পরিণতি বিষয়ে ঐতিহাসিক দলিল গুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ-

খৃস্টীয় ১৫ শতাব্দীর দিকে নাতসিন মে- এর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে 'সলিম শাহ' উপাধি ধারী মেঙরাজগীর থিরি থুধম্মা (১৫৯৩-১৬৩৮) এর জীবনাবসান হয় নরপদিগ্রীর (১৬৩৮-১৬৪৫) হাতে। অতঃপর নরপদিগ্রীর একমাত্র কন্যাকে তৎ ভ্রাতুষ্পুত্র থদোমিন্তার (১৬৪৫-৬২) বা চান্দ-উ মংদারা বিয়ে করে সিংহাসন লাভ করেন। ১৬৬২ খৃস্টাব্দে থদোমিন্তার মৃত্যুর পর একমাত্র শিশুপুত্র শ্রী চন্দ্র সুধম্মার প্রতিনিধি হয়ে তৎমাতা মাগন ঠাকুর নামে প্রধান অমাত্যের অভিভাবকত্বে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। এই মাগন ঠাকুরের উৎসাহেই মহাকবি আলাওল (১৫৯৭-১৬৭৩) ফার্সী কবি জয়সীর 'পদুমাবত' কাব্যের আলোকে মধ্যযুগীয় বাংলায় 'পদ্মাবতীর পুঁথি' ১৬৫৮ খৃঃ এ রচনা শুরু করেন। এই মহাকাব্য রচনা সমাপ্ত না হতেই মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হলে শ্রী চন্দ্র সুধম্মার (১৬৬২-৭৩ এর আরো বহু পরে মৃত্যু) প্রধান অমাত্য পদ লাভ করেন শ্রীমন্ত সোলায়মান। তিনি আলাওলকে 'হস্তপয়কর' পুঁথি (১৬৬০) রচনার অনুরোধ জানান। ঠিক এ সময়েই ১৬৬০ খৃস্টাব্দে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজীবের সেনাপতি মীরজুমলা কর্তৃক তাড়িত হয়ে আওরঙ্গজেব ভ্রাতা শাহ সুজা আরাকান রাজের আশ্রয় নেন। এ সম্পর্কে কবি আলাওন 'হপ্তপয়করে' লিখলেন-

"দিল্লীশ্বর বংশ আসি যাহার শরণে পাশি
তার সম কাহার মহিমা।"

Alexander Daw লিখলে- আরাকানরাজ শুরু থেকেই শাহসুজার এই উপস্থিতিকে ভীতি ও সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন। তাছাড়া মীরজুমলা আরকান রাজের উপর অনবরত চাপ দিচ্ছিলেন শাহ সুজাকে প্রত্যার্পনের জন্যে। আরাকান রাজ ভীত হয়ে শুজাকে আরাকান ত্যাগে অনুরোধ করেন। ....শাহ শুজা এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে মাত্র ৪০ জন অনুচরকে নিয়ে আরাকান রাজের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল। যুদ্ধে প্রায় সকলেই নিহত হলে শাহ সুজা নৌকা যোগে পেগু-তে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করেন। ....রক্ষী হিসেবে যারা তার সঙ্গে এ নৌকায় আরোহন করেন, তারাই নদীমধ্যে নৌকা ডুবিয়ে সুজাকে নিহত করেন।"

'রাজর্ষি' গ্রন্থটি লেখা হয় ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে, আজ (২০১০খৃঃ) থেকে ১২৩ বছর আগে। তারও পূর্বে লিখিত হয়েছিল কৈলাস চন্দ্র সিংহের 'ত্রিপুরার ইতিহাস' গ্রন্থ এবং স্যার জন স্টুয়ার্ট মিল এর History of Bengal নামক গ্রন্থদ্বয়। এসকল গ্রন্থে কক্সবাজারের উল্লেখ নেই, কিন্তু 'রামুর' উল্লেখ আছে। আরাকানীজ ভাষার 'রাং-উ' বাংলা ভাষা-ভাষিদের মুখে উচ্চারণ বিপর্যয়ের শিকার হয়েই- 'রাং' (বক্ষাস্থি) এর অনুস্বার 'ং' এর স্থলে 'ম' এর আগমটি ব্যাকরণ

এবং ধনিতাত্ত্বিক উভয় নিয়মেরই অন্তর্গত। 'রাং-উ' 'উ' শব্দটি শ্রী জাতীয় সম্মনার্থে আরাকানীরা ব্যবহার করেন। তাই বাংলা ভাষীদের উচ্চারণে ও ব্যাকরণ গত নিয়মে 'রাং-উ' শব্দের উ-কার 'ম' আগম এর সাথে যুক্ত হয়ে 'মু' হয়ে যাওয়াটাও ব্যাকরণিক এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক বিধানেরই অন্তর্গত। তাই ধ্বনিতাত্ত্বিক এসব নিয়ম কানুন যাদের বোধ্যগম্য নহে, তারাই 'রামু' শব্দের মধ্যে 'রাম' এর গন্ধ আবিষ্কার করেন। অতএব, তেমন ব্যক্তিদের মগজ হাজারো ধোলাই করলেও তারা জেগে থেকেই নিদ্রার ভাণ করবেন; আর 'রাংকূট'কে 'রামকোট' 'রামকোট' বলে বেঘোরেই আওড়াতে থাকবেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের প্রায় পাঁচশত বছর পরে খৃস্টীয় প্রথম শতকে গ্রীক বংশ জাত সম্রাট কণিষ্কের আমলে গ্রীক ভাস্কর্যের আলোকে বৌদ্ধ জগতে সর্ব প্রথম বুদ্ধ মূর্তির প্রচলন শুরু হয় পাকিস্তানের গান্ধার রাজ্যে। তাই সঙ্গত কারণেই বলা যায় রাং-উ রাংকূটে বুদ্ধ মূর্তি স্থাপন খৃস্টপূর্ব ৩য় শতকের সম্রাট অশোক কর্তৃক আদৌ সম্ভব ছিল না। অধিকন্তু তৎপ্রতিষ্ঠিত চুরাশি হাজার ধাতু চৈত্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে কোথাও তৎনির্দেশে সে সকল চৈত্যে বুদ্ধ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে, এমন প্রমাণ অদ্যাবধি মিলেনি। তিনি এই ৮৪,০০০ চৈত্যে বুদ্ধের দেহাস্থিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে বর্ণনায় পাওয়া যায়। অতএব রাং-কূট এর বুদ্ধমূর্তি সম্রাট কণিষ্কেরও পরবর্তী কালের হওয়াই স্বাভাবিক। আরাকানী ধন্যবতী রাজবংশের ইতিহাস গ্রন্থের বর্ণনার আলোকে বলা যায় ঐ রাজবংশের খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের রাজা চন্দ্রজ্যোতিই রাং-উ রাংকূট বুদ্ধ মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি স্থানীয় সবুজ পাথরের দ্বারা উক্ত বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণ করে তৎ মস্তকে বুদ্ধের বুকের পবিত্র অস্থি খণ্ডটি সংরক্ষণ করেছিলেন। এই তথ্য আরাকানে তালপত্রে লিখিত সেই প্রাচীন ইতিহাস 'ধাঈয়া ওয়াদি রাজোয়াঈং' এবং রাংকূট মন্দির অভ্যন্তরে প্রাপ্ত শিলালিপির বর্ণনায় পাওয়া গেছে।

সম্রাট অশোক বুদ্ধের বক্ষাস্থি সংরক্ষণ ও জনগণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে স্তুপাকার যেই চৈত্যটি স্থাপন করেছিলেন, ১৯২৯ খৃস্টাব্দে তা আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত রাংকূট এর বড়ো মন্দির বা মূল মন্দির হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে বর্মী ভাস্কর্যের নমুনায় তার পরিবর্তিত চূড়াটি ধারিত হয়ে। এই মন্দির অভ্যন্তরে স্থানীয় হালকা নীল পাথরের নির্মিত প্রায় ৮ ফুট উচুঁ যেই বুদ্ধ মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত আছে তা খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের রাজা চন্দ্রজ্যোতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল সেনাপতি ফতেখাঁর সেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে এই মূর্তি তিন টুকুরা

হয়ে যায়। এ অবস্থায় ১৯২৯ খৃস্টাব্দে ইহা আবিষ্কৃত হয়। ভক্তদের শ্রদ্ধার আতিশয্যে এই ত্রিভঙ্গ বুদ্ধমূর্তি সিমেন্ট ও রং এর আস্তরে এখন পুণঃ সংস্কার সাধিত হয়েছে পূর্বের দেহ ও মুখাবয়ব অবিকল রেখে। গবেষক মাসুম খান সাহেব এ প্রসঙ্গে ভুল তথ্যের শিকার হয়ে লিখেছেন- "অশোক এখানে একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন মাত্র।"

মাসুম খান সাহেব তাঁর নিবন্ধে লিখেছেন- "পুকুরের দক্ষিণে অনুচ্চ পাহাড়টির পূর্বদিকে ঘুরে উত্তরের মূল বিহারের পাশে এসেছে। পূর্ব দিকের অনুচ্চ পাহাড়ে ১৬ কোণ বিশিষ্ট প্রাচীন বুদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও নজর কাড়ে। পাহাড়ে উঠার নতুন সিঁড়ি, দুই পাশে প্রাচীন ইটের ধ্বংসাবশেষ নজরে পরে। বিশেষ করে উঠতে ডান পাশে বাঁধানো সিড়িটি। দীর্ঘ দিনের অবহেলায় সিঁড়ি ভেঙ্গে গাছ জন্ম নিয়েছে। সে গাছের বয়সও অনেক। ভাঙ্গা এ সিঁড়ির ইটের মাপ একই। এখানে একটি শিলালিপি পাওয়া যায়, জনশ্রুতি বলে অশোক লিপি। সে লিপি আমাদের সময় পর্যন্ত টিকে নেই ডাকাত কর্তৃক লুণ্ঠিত এবং ধ্বংস প্রাপ্ত। বর্তমানে এ পাহাড়ে বুদ্ধ মন্দির ছাড়া ও রয়েছে রাম সীতার মন্দির। হিন্দুর দাবী এ শিলা লিপি নয়, এটা সীতাদেবীর মরিচ পেষার পাটা। এ বিষয়ে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন- "এখন এটি পুরোপুরি একটি হিন্দু মন্দির। এখানে একটি শিব লিঙ্গ আছে।" [বংশদ্বীপ স্মারক-৫৭ পৃঃ সংখ্যা-২০০৯, বংশদ্বীপ স্মৃতি সংরক্ষণ কমিটি, কর্তালা বেলখাইন সদ্ধর্মলংকার বিহার, পটিয়া, চট্টগ্রাম।]

হ্যাঁ, শক্তিমানের দাপট এভাবেই গ্রাস করে ফেলে দুর্বলের অস্থিত্বকে। মাসুম খান সাহেবের 'নজর কাড়া' সেই মন্দির এবং প্রাচীন সিঁড়ি স্থানীয় হিন্দু ভাইদের রোষানলে এখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। এর সামান্য স্মৃতি চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন। 'ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ' শব্দটির অর্থ কি এমনই হয়? 'যার ধর্ম তার' কিন্তু দুর্বলকে শক্তিমানের গ্রাস থেকে রক্ষার ভার কার? মধ্য যুগীয় পেশী শক্তি এখন প্রশাসনে স্বপক্ষীয় আমলা শক্তিতেই রূপ নিয়েছে। আইন এখন সর্বাবস্থায় তাঁদেরই পক্ষে যাদের রয়েছে এই তিন শক্তিতে প্রভূত্ব অর্থ আমলা আর জনশক্তি। হাজার বছরের বৌদ্ধ ইতিহাস আর ঐতিহ্যকে বিলুপ্ত করতে আজ রাং-উ রাংকূটের উপর উপরোক্ত তিন শক্তিই যেন ভর করেছে। প্রশাসনের রন্ধে রন্ধে বসে থাকা হিন্দু ভায়েরা এবং এখানকার বিত্তশালী সনাতন ধর্মীরা জোটবদ্ধ হয়ে গবেষক মাসুম খানের দেখা সেই বৌদ্ধ ঐতিহ্যের স্মৃতি চিহ্ন এখন আর তেমন কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। আর আবুল

কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া সাহেবের অনুমানকেই সত্যে পরিণত করতে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সনাতন ধর্মীরা।

১৯৩১ খৃস্টাব্দে রাংকূট বৌদ্ধ ঐতিহ্যের আবিষ্কারক ভদন্ত জগতচন্দ্র মহাস্থবির হিন্দুদের এই জবর দখলের প্রতিবাদে কক্সবাজার মহকুমার তৎকালীন হিন্দু প্রশাসক মি. জি. কে. বোস মহোদয়ের শরণাপন্ন হলে তিনি স্বধর্মীদের পক্ষ নিয়ে এই বলে রায় প্রদান করেন যে, এই স্থানের নাম 'রাংকূট' নহে 'রামকোট'; এবং এই মন্দিরের সংশ্লিষ্ট ভূমিতে হিন্দু-বৌদ্ধ উভয়েরই সমান অধিকার। মন্দিরের সিঁড়ি, পুকুর উভয় সম্প্রদায়ের সমান অধিকারে ব্যবহার্য। কমিশনার মহোদয়ের এই রায়ের প্রেক্ষিতেই বৃটিশ আমলে১৯৩১-৩২ খৃস্টাব্দে ১০৫/১০৬/১০৮/১০৯ ধারার পরিবর্তন মামলা মূলে R.S. খতিয়ান সৃষ্টি করা হয়।

১৬৬৬ খৃস্টাব্দে মোগল সেনাপতি ফতেখার সেনাবাহিনীর সাথে আরাকান রাজ চন্দ্র সুধম্মার যুদ্ধ হয় এই রাজার কুল রাংকূটে। সেই যুদ্ধে নিহত হয় ৭০০ ভিক্ষু অধ্যুষিত রাংকূট তীর্থের অধিকাংশ ভিক্ষু এবং গৃহী সেবক বৃন্দ। ধ্বংস প্রাপ্ত হলো হাজার বছরের বৌদ্ধ ধর্ম ও শিক্ষা সংস্কৃতির প্রাণ কেন্দ্র এ বিশাল রাংকূট। জীবিত শোকাহত জ্ঞাতীরা যুদ্ধে নিহত ভিক্ষু এবং গৃহীদের স্মরণে দুই যুগল স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করলেন পুকুরের পূর্ব পাশের অনুচ্চ পাহাড়ে। ধনুকাকৃতি এই পাহাড়ের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম পাশের বিস্তীর্ণ সমতলের শ্মশানে সমাহিত জ্ঞাতীদের দেহাবশেষের উপর মট (কবর) ও নির্মাণ করলেন সেই শোকাহত জ্ঞাতীরা। তারপর ক্রমে জনশূন্যতার শিকার হলো এ বিশাল তীর্থ ভূমি আর বিদ্যাপীঠ। প্রায় ২৬৩ (দুই শত তেষট্টি) বছর ধরে উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে এ পুণ্য তীর্থ।

রাংকূট পুন্যতীর্থ আবার জেগে উঠার সেই সোনালী সূর্যের মুখ দেখে ১৯২৯ খৃস্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক ভদন্ত জগতচন্দ্র মহাস্থবিরের হাতে। কিন্তু তারপর ও অশুভ কালো হাতের থাবা হতে নিস্তার পাওয়া গেল না এখনও। যুগল স্মৃতি সৌধের একটি হিন্দু সম্প্রদায়ের জোর দখলের শিকার হয়ে বর্তমানে শিবলিঙ্গ মন্দির হয়ে গেল। ১৬ কোণ বিশিষ্ট নজর কাড়া বুদ্ধ মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে তুলল তারা রামসীতার মন্দির। যুগলস্মৃতি সৌধের একটিতে বুদ্ধমূর্তি এখনও অবশিষ্ট আছে প্রবল প্রতাপী হিন্দুদের করাল গ্রাস থেকে। রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু শ্রামণেরা তার সংস্কার ও সংরক্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সেই জগতচন্দ্র আর প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের আমল থেকে। কিন্তু, রামু উপজেলায় বর্তমানে বৌদ্ধ ভোটারের চেয়ে হিন্দু ভোটার সংখ্যা

বেশি হওয়ায় তারা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদেরকে ভোট বাণিজ্যের শিকার করে থাকেন যেকোন সরকারের আমলে। ফলে বৌদ্ধ ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বৌদ্ধ পুন্যতীর্থ রাংকূট রক্ষায় রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকাও এখন অকার্যকর।

২০০৮ খৃস্টাব্দের ৩রা জুলাই রাংকূট এর অন্যতম সংস্কারক ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরোর প্রধান শিষ্য আমি প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো এই রাং-উ রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থের অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিলাম। এ প্রসঙ্গে আরো কিছু উল্লেখ প্রয়োজন। ১৯৭১-এর বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনায় স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদানকারী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস (EPR) বাহিনীর রামগড় সীমান্তের ব্যটেলিয়ান কর্তৃক চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ সময়ে হাটহাজারী অঞ্চলের বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রাম থেকে তাদের খাদ্য রসদ যোগানোয় স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন শেষে পথে রামু রাংকূট বনাশ্রমে তৎকালীন আশ্রম অধ্যক্ষ ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরোর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জোবরা গ্রামের আমরা দুই যুবক নতুন চন্দ্র বড়ুয়া ও আমি সুব্রত বড়ুয়া। এই সুযোগে ভদন্ত মহোদয় আমরা দুই উচ্চশিক্ষিত যুবককে বুদ্ধের জীবন, ধর্ম ও দর্শনের মহনীয়তার প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। তাতেই এক সময় আমি আমার মাতা-পিতা প্রদত্ত নাম সুব্রত বড়ুয়ার পরিচয় ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মের বর্তমান প্রথায় 'প্রজ্ঞাবংশ' নামটি ধারণ করি প্রব্রজ্যা নামক দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। সেই সুবাদে এই রাংকূট তীর্থের ইতিহাস আর ঐতিহ্য সম্পর্কেও বিশদ জ্ঞাত হই দীক্ষাগুরু ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো থেকে। গুরুদেবের স্বপ্নে ক্রমে আমিও উদ্বুদ্ধ হই রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থের হারানো গৌরব পুণরুদ্ধার সংকল্পে। ২০০৭ খৃস্টাব্দে গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর রাংকূট এর অপর অধ্যক্ষ আমার কণিষ্ট গুরু ভাই চন্দ্রজ্যোতি মহাথেরো ও প্রয়াত হন ২০০৮ খৃস্টাব্দে। তাঁদের শুণ্যতা পূরণের তাগিদেই ২০০৮ এর ৩রা জুলাই রাংকূট এর দায়িত্ব ভার আমাকে গ্রহণ করতে হয়। এ হিসেবে সেই ১৯৬৬ খৃস্টাব্দ থেকে অদ্যাবধি এই রাংকূট সুরক্ষিত হয়ে আসছে আমাদের গুরু-শিষ্য পরম্পরা। কিন্তু, দায়িত্ব ভার হাতে নিতে গিয়েই দেখি অর্থবিত্তে প্রতাপশালী রামুর হিন্দু সম্প্রদায় এবং রামু উপজেলা ও কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের রন্ধে রন্ধে দায়িত্ব পালন রত হিন্দু কর্মচারীরা জোটবদ্ধ হয়ে বৌদ্ধ তীর্থ রাংকূটকে রামকূট হিন্দু তীর্থ ধামে পরিণত করার এক গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে ফেলেছেন। (১৫) তারা ২০০১ খৃস্টাব্দে কক্সবাজার জেলার তৎকালীন জেলা প্রশাসক বাবু পুলিন বিহারী দেবনাথ মহোদয়ের

দৌলতে ৫১/০১-০২ নং মামলা মূলে ৭-১৭/৯৬-২৬১৮ এস,এস, তাং ১/৮/২০০১ খৃস্টাব্দে ১৯৩১-৩২ সালে প্রদত্ত রায়কে ও অতিক্রম করে রামকোট হিন্দু-সম্প্রদায়ের ব্যবহার্য বলে আদেশ জারি করে ফেলেছেন।

স্থানীয় বৌদ্ধগণকে নিয়ে আমি বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনুকুলে সমস্যার সমাধান চেয়ে বিগত ২০০৯ খৃঃ থেকে বর্তমান অবধি স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা রামু উপজেলার বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব সোহেল সরোয়ার কাজলের শরণাপন্ন হয়ে আছি। তিনি স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে বিগত দেড়টি বছর ধরে বহুবার বৈঠক করেছেন। কিন্তু, অজ্ঞাতকারণে অদ্যাবধি এ সমস্যার কোন সমাধান তিনি দেননি। অধিকন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা বৌদ্ধদের অংশে গাইডওয়াল বসানোয়, বৌদ্ধদের অংশের বনায়ন ধ্বংস করা, ধ্বংস মুখে পতিত বুদ্ধ মন্দির সংরক্ষণে সরকার প্রদত্ত অনুদান কাজে লাগানোয় বাঁধা প্রদান করা- ইত্যাদি অন্যায় কর্মে তিনি প্রশ্ন বিদ্ধ আচরণ করেছেন।

দুর্বলের অধিকার এভাবেই ভূলুণ্ঠিত হয়, সকলের অগোচরে। নীরবে নিভৃতে কাঁদে ন্যায়-নীতি আর সুবিচার যুগে যুগে এভাবেই। তবে পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর মতো সৎ সাহসের কিছু ব্যক্তিত্ব এখনও আছেন বলেই হয়তো এ পৃথিবী শেষ প্রলয়ের হাত থেকে এখনও বেঁচে আছে। তেমনই একজন ব্যক্তিত্ব কক্সবাজারের বর্তমান জেলা প্রশাসক জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ মহোদয়। তিনি ঐতিহাসিক রাংকূট-এর ভূমি সমস্যার ন্যায় ও নিরপেক্ষ একটি সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন আমাদেরকে। তাছাড়া হাজার বছরের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারক এই রাংকূট যাতে একটি আদর্শ পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয় সেই প্রয়াসও তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ, এমন একজন সৎরাষ্ট্র সেবককেও কূটকৌশলে অপদস্থ করতে কার্পণ্যতা কোথায় এদেশে? তবুও সত্য ধর্ম ও ন্যায়ের পক্ষে এই বাণী চিরন্তনীতে অকৃত্রিম বিশ্বাসী হয়েই বলবো-

'সচ্চ মেব জয়তে!' সত্যের জয় সুনিশ্চয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে আবারো এই রাংকূট বৃটিশদের যুদ্ধ ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বৃটিশ সৈনিকেরা তাদের সাজোয়া যান চলাচলের সুবিধার জন্যে এবং আরাকান সড়ককে সোজা করতে গিয়ে ধনু আকৃতির রাংকূট পাহাড়ের পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত বাহুকে তিনখণ্ডে বিভক্ত করে ফেলেন এবং এ সময়ে রাংকূট এর প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের ও ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেন। তাদের দ্বারা

শ্মশানের প্রত্নতাত্ত্বিক মট (কবর) গুলো সহ বৌদ্ধ স্তুপ ও অশোক স্তম্ভ বিলুপ্ত হয় এবং কয়েকটি মূল্যবান মন্দির ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে পাকিস্তান আমলে বৃটিশ যোদ্ধাদের হাতে ক্ষতি গ্রস্ত বিশাল স্তুপ এবং মন্দিরের অপসারণ ঘটিয়ে স্থানীয় বন বিভাগ কর্তৃক রাজার কুল ফরেষ্ট রেঞ্জ এর কার্যালয় স্থাপিত হয়। শুধু তা-ই নহে স্থানীয় বন বিভাগ রাংকূটের সমুদয় ভূমিকে P.F. তথা বনবিভাগের আওতাভূক্ত করে স্থানীয় প্রভাবশালী ভূমি গ্রাসীদের সহায়তায় ধ্বংস প্রাপ্ত প্রাচীন স্থাপনা সমূহের উপর বাণিজ্যিক ভাবে জনবসতি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করে। তাদের এই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধের জন্যে ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে রাংকূট এর বিহারাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই চেষ্টা যত্ন শুরু করেন। তিনি রাংকূট তীর্থ এলাকা সহ অবশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ব সমৃদ্ধ পাহাড় সমূহ রক্ষার্থে বনভূমির আওতা মুক্ত করতঃ রাংকূট (রামকোট) বনাশ্রমের নামে পৃথক খতিয়ান খোলার জন্যে ১৯৭৭ খৃস্টাব্দে ২০ জানুয়ারীতে আবেদন করেন তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি বরাবরে। এই আবেদনে সাড়া দেন বন বিভাগের কক্সবাজার এবং চট্টগ্রাম বনবিভাগের কর্মকর্তা বৃন্দ। তাঁরা সরোজমিনে তদন্ত পূর্বক বনভূমির আওতা মুক্ত করার সুপারিশ পত্র প্রেরণ করেন প্রধান কর্মকর্তার বরাবরে। কিন্তু প্রক্রিয়াটি ২৮-৬-৭৭খৃঃ এ প্রধান বন অধিদপ্তর, ঢাকা পর্যন্ত গিয়েই অদৃশ্য হয়ে যায় অজ্ঞাত কারণে। এদিকে স্থানীয় বনকর্মচারী এবং স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালী ভূমি দস্যুদের দ্বারা বার কয়েক আক্রমণের শিকার হন ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো। জীবন নাশের হুমকির মুখে তিনি ১৯৮৭ খৃঃ বাংলাদেশের বৌদ্ধ সংগঠন সমূহ সহ সরকারী-বেসরকারী মহল ও পত্র-পত্রিকার শরণাপন্ন হন। ২০/২/৮৭ তাং এর দৈনিক খবর এবং ২০/১২/৮৬ এর দৈনিক ইত্তেফাঁক বিষয়টি জাতীয় ভাবে তুলে ধরেন। ভদন্ত মহোদয়ের আকুল আবেদনে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রতিনিধি দল চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক যাদুঘরের উপ-পরিচালক, স্বপন বিকাশ ভট্টাচার্য, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহাপরিচালক ডক্টর নাজিমুদ্দিন, পরিচালক ড. এ,কে,এম শামসুল আলম এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ভাষ্কর্যবিদ ডক্টর এম,এ,গফুর প্রমূখরা রাংকূট এলাকা সরোজমিনে পরিদর্শন করেন। অতঃপর ২৬/৯/৮৭ খৃঃ তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা-৭, হতে জেলা প্রশাসক কক্সবাজার বরাবরে স্মারক নং ৯/৭/৭৬ প্রত্ন/৫৮০০ মূলে রাংকূট এলাকার ১০টি দাগ নং ৩২৫৭, ৩২৭৯, ৩২৫৫, ৩২৬৯, ৩২৫৬, ৩২৫৪, ৩২৫৯, ৩২৫৮, এবং ৩২৪৭ দাগ ভূক্ত সমুদয় ভূমি

প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তৎকালীন জেলা প্রশাসক মহোদয় বিষয়টিকে বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব না দেয়ার সুযোগে পর পর দুইবার গভীর রাতে ডাকাতের ছদ্মবেশে ভূমিদস্যুরা রাংকূট বিহারাধ্যক্ষ ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরকে জীবন নাশের জন্যে তাঁর আবাস কক্ষে আক্রমণ করে। তিনি তখন মারাত্মক আহত হয়ে ও প্রাণে. বেঁচে যান। এসময়ে আমিও স্বয়ং সেই ভূমি দস্যুদের হাতে লাঞ্ছিত হই। চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন কালে গুরুদেবের জীবন বিপন্ন দেখে ১৯৯০ খৃস্টাব্দে আমি তাঁকে চট্টগ্রাম মহানগরীর ডি,সি, হিল সংলগ্ন সেই বৌদ্ধ বিহারে চিকিৎসার্থে নিয়ে যাই। গুরুভাই চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরকে রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থ ও বনাশ্রম বিহার রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি সুদীর্ঘ ২৬টি বছর গভীর আন্তরিকতায় এ দায়িত্ব পালন করে ২০০৮ খৃস্টাব্দে প্রয়াত হন। অতঃপর ২০০৮ এর ৩রা জুলাই আমাকেই দায়িত্ব নিতে হলো হাজার বছরের এই বৌদ্ধ ঐতিহ্য রক্ষার। কিন্তু, আমি এ দায়িত্ব নেয়ার আগেই রাংকূট এর দুই তৃতীয়াংশ ভূমি জবর দখলে চলে গেছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ রাংকূট এখন কণ্ঠাবরোধেরই শিকার হয়ে পড়েছে। চোর, ডাকাত লুঠেরা আর সন্ত্রাসীদের যেমন কোন জাত নাই, ধর্ম নাই, এই প্রাচীন তীর্থ ভূমি রাং-উ রাংকূটকে বাস্তবে রক্ষার দায়িত্ব যাদের সেই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অযত্ন, অবহেলা আর উদাসীনতায় সেই ভূমি লোলুপ সবাই যেন এখন জোট বদ্ধ হয়ে গেছে রাংকূট এর ভূমি আত্মসাৎ অভিযানে।

এ পর্যায়ে সবচেয়ে দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক বিষয়টাই এখন তুলে ধরা সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে অত্যাবশ্যক হয়ে গেছে। এ দুঃখ এ লজ্জা একান্তভাবে আমারই। ১৯৯০ খৃস্টাব্দে জীবন নাশের হুমকির মুখে আমার গুরুদেবকে রাংকূট থেকে আমার সান্নিধ্যে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে নিয়ে যাই। তখন আমি সেই প্রতিষ্ঠানের উপ-অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলাম। গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে ভূমি দখলকারীদের হাতে আমার প্রব্রজ্যিত জীবনের জন্মস্থান রাংকূটকে বিপন্ন দেখে অনেক প্রয়াস প্রযত্নের মাধ্যমে ইতালির এন,জি,ও, সংস্থা 'কারিতাস ইতালিয়ানা' থেকে ১৯৯১ এর প্রলয়ঙ্করী ঘুর্ণিঝড়ের পরবর্তী কালে ১৯৯৪ সালে এক কোটি টাকার বেশি এক অনুদান সংগ্রহে সক্ষম হই। সেই ফাণ্ড বাংলাদেশে ব্যবহারের দায়িত্বে ছিলেন 'কারিতাস ইতালিয়ানার' বাংলাদেশ প্রতিনিধি ইতালিয়ান ফাদার লুঁইজি লুপি সাহেব। তাঁকে দিয়ে এই রাং-উ রাংকূট রক্ষার পরিকল্পনায় আমি 'জগজ্জ্যোতি চিলড্রেন

ওয়েলফেয়ার হোম' এর জন্মদান করি ১৯৯৪ খৃঃ রাংকূট-এর প্রাচীন শ্মশান ভূমির এক পাশে। মাত্র ৯৬ শতক ভূমিতেই এই প্রতিষ্ঠান সীমাবদ্ধ থাকবে, স্থানীয় রাংকূট এলাকার বৌদ্ধ জনগণকে এমন প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও তারা যখন সম্মত হচ্ছিলেন না, তখন এই বলে তাদের সম্মতি আদায় করলাম যে, এই শিশু সদন আশ্রমটি এখানে প্রতিষ্ঠিত হলে আপনাদের শিশুরা এখানে আশ্রয় লাভ করে শিক্ষায়-দীক্ষায় সমুন্নত হবে, এবং সেই সাথে তারা নানা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ লাভের সহায়তা পেয়ে আপনাদের জীবন থেকে দারিদ্রতার অভিশাপ মুক্তির সুযোগ ও আসবে। শিক্ষা-দীক্ষা বঞ্চিত, চিরদারিদ্রতার শিকার ভূমিহীন এই মানুষ গুলোকে যেদিন আমি এসকল আশ্বাস দিচ্ছিলাম, সেদিন এই এলাকার ৩/৪ কি.মি. পরিধিতে একটি প্রাথমিক স্কুল ও ছিল না। বাস্তবিকই জনগণ আমাকে সেদিন আন্তরিক বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁরা আমাকে তাদের সুপ্রাচীন শ্মশানভূমির অংশ বিশেষ ব্যবহারে সম্মতি দিলেন এই শর্তে-

১) চিরকাল আশ্রমটি রাংকূট বিহারাধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে।

২) আশ্রমের আবাসিক শিশুদের মধ্যে অর্ধেক থাকবে রাংকূট এলাকার বৌদ্ধ শিশুরা।

৩) শিশুদের জন্যে একটি উন্নত মানের প্রাইমারী ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল থাকবে।

৪) রাংকূট এলাকার বৌদ্ধ কিশোর ও যুবকদের যারা স্কুল বা কলেজগামী নহে তাদের কর্মসংস্থান উপযোগী কারিগরী প্রশিক্ষণ গ্রহণে শিক্ষাকালীন কোটাভিত্তিক ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

৫) আশ্রমের কর্মচারী গ্রহণে রাংকূট এর বৌদ্ধদের অগ্রাধিকার থাকবে।

মূলতঃ 'শরণ' নামে বহুমুখি এক NGO সংস্থা তখন আমরা জন্ম দিয়েছিলাম। ইহার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলাম আমি, এবং সম্পাদক ছিলেন শ্রীমান বড়ুয়া। আমাদের বহুমুখি কর্মপরিকল্পনায় রাংকূট বাসীদের এ সকল দাবী পূরণ কোন অবাস্তব কল্পনা ছিলনা। অধিকন্তু, এ সকল ছিল, দীর্ঘকাল কয়েক প্রজন্ম ধরে দারিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত মানুষ গুলোর বাঁচার দাবী। বাস্তবতা নিরীখে আমরা আশ্বস্ত করেছিলাম, ক্রমিক পর্যায়ে তাদের এসব বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হবে। আমাদের এই আশ্বাস যাতে পরবর্তীতে কেহ ভুলে না যায়, তাই জগজ্জ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম-এর সংবিধানের আদর্শ-উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূক্ত করার পরামর্শ দিলাম শরণের সম্পাদক শ্রীমান বড়ুয়াকে। অতঃপর ১৯৯৬ এর মাঝামাঝি

আমি রাঙ্গামাটিতে পূজ্য বন ভান্তের সান্নিধ্যে দীর্ঘ ছয়টি বছর অবস্থান কালে এসকল কর্মকাণ্ড হতে কিছুকাল বিচ্ছিন্ন থাকি। পরবর্তীতে দেখতে পাই শিশুসদনটির সংবিধান সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণ কালে আশ্রম সংলগ্ন বৌদ্ধ গ্রামটির শিশুদের শিক্ষা এবং বেকারদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে আর্থিক সহায়তা দানের উল্লেখ ব্যতীত অপর সকল শর্ত জগজ্জ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম এর সংবিধান থেকে উদাও হয়ে গেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগলো রাংকূট এলাকার শিশুদের থেকে প্রতি ভর্ত্তি সংবৎসরে মাত্র দুইজন করে শিশু সদনটিতে ভর্তি করার প্রথা আশ্রম কমিটি চালু করেছে, আর আশ্রমের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লুপি সাহেব সুকৌশলে নিজের হাতেই নিয়েই নিয়েছেন দেখে এবং রাংকূট বিহারাধ্যক্ষ ভদন্ত চন্দ্রজ্যোতিকে নামে মাত্র পরিচালনা কমিটির সভাপতি পদে দীর্ঘ ১৪টি বছর ধরে রাখলেও ২০০৮ সালে আমি যখন রাংকূট বিহারের অধ্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন আমাকে বাদ দিয়ে রামুর উকিল মনহরি বড়ুয়াকেই সভাপতি পদে গ্রহণ করা হল। অপরদিকে দেখলাম, এই দীর্ঘ ১৪/১৫ বছরেও স্থানীয় শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি, বেকারদের পুনর্বাসনেও কিছু করা হয়নি। অথচ, আশ্রমের নামে গরুর খামার, মুরগীর খামার, ট্রাক-মাইক্রো-জীপ ইত্যাদি নানা জাতীয় পরিবহন ব্যবসা কার্যক্রম শুরু করলেও কোথাও রাংকূট এলাকার একজনকেও এসকলের মূল দায়িত্বে রাখা হয়নি এবং কর্মসংস্থানও করা হয়নি। রামুর একটি ধনী পরিবারের সদস্যরাই লুপি সাহেবের পরবর্তী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে, তারা রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহারে আমার আগমণ এবং অবস্থানকে ঠেকানোয় নানা প্রকার ষড়যন্ত্রের জালপেতে আছে। কেন এমনটি হলো? যেজন এই জগজ্জ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম-এর জন্ম দিল সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা এখন তার প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে কেন এমন বৈরী হয়ে গেল? তাদের আচরণে বাঙ্গালী জাতির আধুনিক স্বপ্ন দ্রষ্টা মহাত্যাগী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উক্তিটিই তাই আমার মনে বার বার ধ্বনিত হচ্ছে- "আমি লোকটার কোন উপকার করিনি বলেই সে আমার প্রশংসা করছে।" হাস্যকর ব্যাপার হলো- "জগজ্জ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম" তাদের গরুর খামারের দুধ, এবং মুরগীর খামারের ডিম কিনেই খায়। আর আশ্রমটির সমস্ত ব্যয় ভার বহন করে থাকে বেশ কয়েকটি বিদেশী দাতা সংস্থা। এখাতে তাদের আয় এতো বেশি যে, বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর হতে আশ্রমের সকল (৮০ জন) আবাসিকের যেই'ক্যাপিটেশন গ্রাণ্ড' দেওয়া হতো তা-ও লুপি

সাহেব প্রত্যাখ্যান করেছেন, বেশি হিসাব-নিকাশের ঝামেলায় পড়তে হয় বলে। আশ্রমের বেতন ভোগী সকল কর্মচারী ও পরিচালক মণ্ডলী সম্পূর্ণ ভাবে যাতে লুপি সাহেবের অনুদান নির্ভর হয়ে চির অনুগত থাকে এ জন্যেই চিরাচরিত নিয়মের এই খৃস্ট মিশনারী অস্ত্র এখন 'জগজ্জ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম' এ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই এখন প্রতিষ্ঠানটি রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে পরিচালক মণ্ডলী আরো যেই মোংরামিতে মেতে উঠেছে বস্তুতঃ সেটাই আমার নিকটে সবচেয়ে বেশি দুঃখও লজ্জাস্কর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগে (২০১০ খৃঃ) আমি রাংকূট এলাকার দুঃস্থ শিশুদের ৫০/৬০ জনকে সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত পাঠদানের লক্ষ্যে একটি স্কুল ঘর তৈরীর উদ্যোগ নিলাম রাংকূট এর আওতাভূক্ত একটি পাহাড়ে। আমার সাথে বিন্দুমাত্র আলাপ না করে জগজ্জ্যোতি শিশু সদনটির পরিচালক মণ্ডলী রামু থানা থেকে পুলিশ এনেই আমার এই উদ্যোগটি বন্ধ করে দিলেন। তাদের অভিমত আমি আশ্রমটির ভূমি ও গাছ বাগান দখলের জন্যেই এমন পায়তারা করছি। অথচ স্থানীয় বৌদ্ধরা বলেন রাংকূটের বনায়ন করেছেন তারাই, স্বেচ্ছা শ্রমদানের মাধ্যমে। আশ্রমের বর্তমান পরিচালকদের দাবী রাংকূট এলাকায় এখন থেকে কিছু করতে হলে তাদের পূর্ব অনুমতি নিতে হবে। দেখলাম স্থানীয় প্রশাসন থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সবাই বিদেশী অর্থপুষ্ট এই জগজ্জ্যোতি আশ্রমটির অনুগত। তাইতো বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি- "রাজার হস্ত, করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।"

আজ আমার দারুন অনুতাপ এজন্যেই যে, কেন সেদিন (১৯৯৪ খৃঃ) আমার গুরুদেব ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের বাঁধাকে উপেক্ষা করে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারক এই পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থে 'জগজ্জ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম'টির জন্ম দিলাম। কেন আমি রাংকূট এর আবিষ্কারক, ভদন্ত জগতচন্দ্র মহাস্থবির এবং সংস্কারক ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির দ্বয়ের পুন্যস্মৃতি ও কৃতজ্ঞ পূজা দানে এই অনাথ আশ্রমটির নামাকরণ করেছিলাম 'জগত+জ্যোতি শিশু সদন'। এই নামটিই পরবর্তী পরিচালকেরা 'জগজ্জ্যোতি চিলড্রেন ওয়েল ফেয়ার হোম' এই নামে নামাকরণ বিকৃতির শিকার করে ফেলেছেন। রাংকূট এর ভূমি নিয়ে এ সকল অন্যায়ের প্রতিকারে আমি মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীর শরণাপন্ন হই। অবশেষে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের শরণাপন্ন হলে, তিনি (জনাব গিয়াস উদ্দিন) আমাকে

আশ্বস্ত করেছেন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এই পবিত্র তীর্থের রক্ষায় তিনি সাহায্যের হাত প্রসারিত করবেন। মহোদয়ের এই আশ্বাসের দিকেই এখন আমি চেয়ে আছি তৃষিত চাতকের মতো।

রাংকূট এর ভূমি নিয়ে এত সমস্যার মাঝে আরো একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে 'গোদের উপর বিষফোঁড়া তুল্য হয়। তা হচ্ছে, রামুর এক বিশিষ্ট ভিক্ষু এবং তৎ শিষ্যদের দারুণ ঈর্ষাকাতরতা। ১৯৭১ এ আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণ কালেও এই মহাস্থবিরকে আমার আমার গুরুদেবের প্রতি যেরূপ ঈর্ষাকাতর দেখেছি এই ৩৯ বছর পরও ঠিক একই মানসিকতা সম্পন্ন দেখতে পাচ্ছি। 'যেমন বৃক্ষ তেমন ফল' সদৃশ হয়ে তিনি এখন সশিষ্যে আমার প্রতি ঈর্ষার রোষানল নিক্ষেপ কর চলেছেন নানা অজুহাতে। উনার শিষ্য দুই মহাপুরুষ সংঘ সংস্থার তোয়াক্কা না করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিহার গুলোতে দলবাজি করে করে থাকতে পারেন। কিন্তু আমি স্বীয় প্রব্রজ্যার জন্মস্থানও গুরুর প্রতিষ্ঠানে থাকা না-কি গুরুতর অপরাধ। আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত সকল অপমান আর লাঞ্ছনাকে আমি নীরবে-সরবে সহ্য করে যাচ্ছি এই ভেবে যে, ১৯৬৬ খৃস্টাব্দ থেকে আমার গুরুদেব আমৃত্যু এই পবিত্র তীর্থ রক্ষায় যেখানে নিজ জীবনকে বার বার বিপন্ন করেছেন; আমার গুরু ভাই ভদন্ত চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির যার পেছনে তাঁর সমগ্র প্রব্রজ্যা জীবনটি উৎসর্গীত করেছেন, তাদের ন্যায় আমাকেও এই পবিত্র তীর্থ রক্ষায় সব অত্যাচার, অপমান মাথা পেতে অবশ্যই নিতে হবে। তাছাড়া আর বিকল্প কী-বা আছে?

বৌদ্ধ মহাতীর্থ ঐতিহাসিক রাংকূট-এর এই কালো অধ্যায়ের অচিরেই অবসান হোক! 'সচ্চ মেব জযতে'- সত্যের জয় সুনিশ্চয় এই অমোঘ বুদ্ধ বাক্যের প্রতি অগাধ আস্থা রেখেই আমি এখন প্রিয় ভাজন 'গবেষক মাসুম খান' সাহেবের লিখিত নিবন্ধ "বৌদ্ধ ঐতিহ্য ঋদ্ধ স্থাপত্য ঃ রামকোট (রাংকূট) বনাশ্রম বিহার"- এর উপর আরো সামান্য আলোচনা করে এ গ্রন্থের ইতিটানতে চাই।

মাসুম খান সাহেব নিবন্ধের স্মরণিকায় ৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- "শ্রীলংকার প্রত্ন খননে আবিষ্কৃত শিলালিপির সুত্র ধরে, মায়ানমারের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক ভিক্ষু জগৎচন্দ্র মহাথেরো ১৯৩০ সালে এ বিহার আবিষ্কার করেন।"

রাংকূট এর আবিষ্কার নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা এ গ্রন্থের সূচনাতেই উল্লেখ আছে। তারপরও এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, ভদন্ত জগৎচন্দ্র মহাথেরো কোন মায়ানমার ভিক্ষু নহেন। তিনি আমাদের এই চট্টগ্রামেরই সন্তান। পটিয়া উপজেলা সদরের অতি নিকটবর্তী উনাইন পুরা নামক রত্নগর্ভা এক বৌদ্ধ পল্লীতে এই মহান বৌদ্ধ

ভিক্ষুর জন্ম হয় ১৮৫০ খৃস্টাব্দে। তিনি ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে তৎ আবিষ্কৃত এই রাংকূটেই কালগত হন। ভদন্ত মহোদয়ের এবং রাংকূট এর পুণর্জাগরণ নায়ক আমারই গুরুদেব ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের দেহাবশেষ তাঁদেরই কর্ম তীর্থ রাং-উ রাংকূট-এ বর্তমান মূল মন্দির প্রাঙ্গণের পূর্ব প্রান্তে একটি স্মৃতি মন্দির তৈরী করে তাতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে সেই স্মৃতি মন্দিরে আমি নিম্নোক্ত ভাবে একটি শ্বেত পাথরের শিলালিপি উৎকীর্ণ করায়ে দিয়েছি 'ঐতিহাসিক স্মৃতিবেদী' নামে এই স্থানে পবিত্র দেহাবশেষ সংরক্ষিত আছে মহামতি সম্রাট অশোক প্রতিষ্ঠিত ২০০০ (দুই হাজার) বছরের বৌদ্ধ পুন্যতীর্থ রাং-উ রাংকূট মহাচৈত্য ও ঋদ্ধিময় সধাতুক বুদ্ধ মূর্তির আবিষ্কারক পুরাতাত্ত্বিক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভদন্ত জগতচন্দ্র মহাস্থবির (জন্ম ১৮৫০ খৃঃ মহাপ্রয়াণ ১৯৪৮ খৃঃ) এবং ঐতিহাসিক রাং-উ রাংকূট চৈত্যের সংস্কারক ও রাংকূট বনাশ্রম সাধন পীঠ এর প্রতিষ্ঠাতা মহাসাধক বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির (জন্ম ১৯৩৩ খৃঃ, মহাপ্রয়াণ ২০০৬ খৃঃ)।

হে কীর্তিমান দ্বয়!
স্মরি ভক্ত জনে হৃদয়ের অমরাসনে,
তোমাদের যুগে যুগে প্রতিক্ষণে ক্ষণে।
যখনই আসি এথা এই শান্তির নীড়ে,
সবুজের ছায়া ঘেরা স্নিগ্ধ তপোবনে।

সৌজন্যে ঃ অধ্যাপক ধুতাঙ্গসাধক ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো, বি,এ (অনার্স), এম, এ, (ডবল)

২৫৫৩ বুদ্ধবর্ষের শুভ প্রবারণা ১৮ই আশ্বিন ১৪১৬ বাংলা, ৩রা অক্টোবর ২০০৯ খৃস্টাব্দ।"

মাসুম খান সাহেব বলেছেন, শ্রীলংকার প্রত্ন খননের সুত্র ধরে ১৯৩০ সালে এ বিহার আবিস্কার করেন; এই তথ্যটি ভুল। আসলে রাংকূট আবিস্কৃত হয় প্রতিবেশী আরাকানের এক প্রাচীন বিহারে রক্ষিত তালপাতায় লিখিত 'ধাঈয়া ওয়াদি রাজোয়াঈং' নামে এক ইতিহাস গ্রন্থের বর্ণনা হতে। ইহা আরাকানের প্রাচীন ধন্যবতী (ধাঈয়া ওয়াদি) এবং রম্যবতী (রাং-উ) রাজবংশের ইতিহাস গ্রন্থ হতে। এই গ্রন্থে উল্লেখিত ছিল বুদ্ধ রাজা মহাচান্দা সুরিয়ার আমন্ত্রণে ধন্যবতী নগরে আগমন পথে রম্যবতী (রামু) নগরের এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করেন সশিষ্যে। পরে তিনি সেবক শিষ্য আনন্দকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; "হে আনন্দ! ভবিষ্যতে পশ্চিম সমুদ্রের পূর্ব পাশের এই পাহাড়ে আমার বক্ষাস্থি স্থাপিত হবে। তখন ইহার নাম হবে 'রাং-উ'।

স্মরণিকার ৫৮ পৃষ্ঠায় প্রথম প্যারার প্রথম লাইনে উল্লেখ আছে- "বাকখালি নদী অতিক্রম করে একটি ছোট খাল পার হয়ে কিছু দূর গেলে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ২/৩ টি এবং অনুচ্চ পাহাড়ী টিলা দেখা যায়। এ সমস্ত টিলার প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বা ধ্বংসাবশেষের স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায়।

এই কয়েকটি টিলা সংরক্ষণের জন্যে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. নাজিমুদ্দিন সাহেব ১৯৭৭ সালে কক্সবাজার জেলা প্রশাসক মহোদয়কে দাপ্তরিক পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন জেলা প্রশাসক মহোদয় এই নির্দেশনায় বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দেয়ায় বর্তমানে এখানে রামু রাজারকুল ফরেষ্ট বিট অফিস, হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্মশান এবং বেশি কিছু ঘরবাড়ী গড়ে উঠেছে। ফলে এখন প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতি-চিহ্ন লুপ্ত হওয়ার পথে।

একই পৃষ্ঠার ২য় প্যারাগ্রাফে আরো বলা আছে- "এই ধ্বংসাবশেষের প্রায় ৩০০ মিটার দক্ষিণ পূর্বদিকে বড় রাস্তার পূর্বপার্শ্বে একটি টিলা আছে। এ টিলা থেকে কিছু দক্ষিণে একটি ছোট নেড়া টিলা আছে। এখানেও প্রচুর ইট এবং ইটের ভগ্নাংশ দেখা যায়। এখানে কোন বৌদ্ধ মন্দির বা 'যাদুঘর' জাতীয় কোন ইমারত ছিল।"

বস্তুতঃ এখানেএকটি ছোট্ট স্তুপ এবং অশোক স্তম্ভ ছিল। বড়ো আকারের স্তুপটি ছিল ফরেস্ট বিট অফিসের পাহাড়ের চুড়ায় এবং স্তম্ভটি ছিল এই নেড়া টিলায়। খৃস্টীয় ৭ম শতকে বিশ্বখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং যখন এ স্থানে এসেছিলেন তখন অশোক রাজার যে স্তুপটি দেখেছিলেন তা বর্তমান ফরেস্ট বিট অফিসের পাহাড়েই ছিল। আর সেই স্তুপ এর কাছাকাছি যেই 'সঙ্ঘারাম'টি তিনি দেখেছিলেন, তার অবস্থান ছিল ধনুক আকৃতির বর্তমান রাংকূট পাহাড়টি সহ ইহার পূর্ব ও পশ্চিম পাশের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে। ষোড়শ শতাব্দীর মোগল সেনাপতি ফতেখাঁর আক্রমণে নিহত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের জন্যে পরবর্তীতে ইহার সমগ্র এলাকা শ্মশান ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয় ১৯৮৯ এর পরে এখন পূর্বপাশের শ্মশান ভূমি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে জনবসতি গড়ে উঠেছে; এবং পশ্চিম পাশের শ্মশান ভূমির প্রায় অধিকাংশ ভূমি দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে হিন্দু সম্প্রদায় ও জগজ্জ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম কর্তৃপক্ষ। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থ ও প্রাচীন শ্মশানের ভূমি, ভূমি দস্যুদের আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্যেই ১৯৯৪ সালে জগজ্জ্যোতি শিশু সদনের জন্মদান হয়েছিল। আর এখন সেই রক্ষকই ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ভূমি দস্যুতে পরিণত হতে

যাচ্ছে। বিষয়টি আরো একটু খোলসা করে বলা দরকার। ১৯৯৪ সালে রাংকূট শ্মশানের অব্যবহার্য অংশের ৯৬ শতকে শিশু সদনের জন্যে একটি আবাসিক স্থাপনা নির্মাণের অনুমতি চাইতে হয়েছিল রামু A.C. ল্যাণ্ড বরাবরে। আমার প্রতিষ্ঠিত N.G.O. সংস্থা 'শরণ' এর পক্ষে থেকে মহাসচিব শ্রীমান বুড়ুয়ার আবেদন A.C. ল্যাণ্ড কর্তৃক এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, শ্মশান ভূমি উপর একমাত্র শবদেহ সৎকার সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ব্যতীত অন্যকোন প্রকার স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। অধিকন্তু, শবদেহ সৎকারের জন্যে নির্মিত স্থাপনার ব্যবহার ও সংরক্ষণ দায়িত্বে থাকবে রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার কর্তৃপক্ষ। তাঁরা ইহার রক্ষণাবেক্ষণে অক্ষম মাননীয় সরকারই ইহার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করবেন।

প্রস্তাবিত জগজ্জ্যোতি শিশু সদনের স্থাপনাটি কিন্তু, A.C. ল্যাণ্ড-এর এই নির্দেশনা দানের আগেই কোটি টাকা ব্যয়ে ইউরোপীয় ষ্টাইলে নির্মিত হয়ে গেছে। অতএব, তার বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে রাংকূট বিহারের তৎকালীন অধ্যক্ষ ভদন্ত চন্দ্রজ্যোতি ভিক্ষু মহোদয়কে শিশুসদন পরিচালনা কমিটির সভাপতি রেখে, শিশুসদন কমিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালায়ে নিতে থাকে।

এখানে প্রশ্ন থাকছে, কেন বিষয়টি A.C. ল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষের কাছে গেল? বাস্তবে শ্মশান ভূমি যে সরকারী খাস ভূমি রূপে রেকর্ড কৃত, তার ধারণা আমাদের কারও ছিল না। তাই স্থানীয় জনগণের স্বীকৃতি নিয়েই আমার দায়িত্বে শিশুসদনের দ্বিতল ভবনের নির্মাণকাজ ১৯৯৬-এর প্রথম দিকে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তখন আমি ছিলাম শরণের সভাপতি এবং শ্রীমান বড়ুয়া সম্পাদক ছিলেন। ফাদার লুপি অর্থের যোগানদার এবং ব্যয়ের ভারও ছিল তাঁর উপরেই। তিনি ফ্রান্স এর একজন আর্কিটেক্ট দিয়েই ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাদের (শরণের) হাতে ভবনটি হস্তান্তর করলেন 'জগজ্জ্যোতি শিশুসদন' এর কার্যক্রম শুরু করার জন্যে। দায়িত্বটি এক বৈঠকে আমরা (শরণ) বুঝে নিলাম এবং শিশুসদনের পরিচালক প্রসূন বড়ুয়া, লোপা বড়ুয়া সহ অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে দিলাম। শিশুসদন পরিচালনা কমিটির সম্পাদক দায়িত্বে মনোনীত করা হলো রামুর ঐতিহ্যবাহী মহাজন পরিবারের এক সন্তান বাবু মানস বড়ুয়াকে। তার জন্যেও সাত হাজার টাকা ভাতা নির্ধারণ করা হলো। শিশুসদনের এই পর্যন্ত দায়িত্ব সমাপ্ত করে আমি ১৯৯৬ এর জুন মাসের দিকে চলে গেলাম রাঙ্গামাটি বন বিহারে, শ্রদ্ধেয় বনভান্তের সান্নিধ্যে ধ্যান-সাধনায় আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে। আমার এই অনুপস্থিতিতির সুযোগে শরণের সম্পাদক শ্রীমান বড়ুয়া সহ

অন্যান্যরা ফাদার লুপি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'জগজ্জ্যোতি শিশুসদন' এই নাম পরিবর্তন করে 'জগজ্জ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম' লিখলেন। ইহার সংবিধানের আদর্শ উদ্দেশ্য থেকে রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার এবং শিশুসদনের ভূমি ব্যবহারে সম্মতি দাতা স্থানীয় বৌদ্ধ জনগণের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার যাবতীয় বিষয় মুছে দিলেন। অধিকন্তু অর্থের মোহে গুটিকয় স্থানীয় ব্যক্তিকে হাতের কব্জায় নিয়ে সংরক্ষণের নামে ঘেরা দিয়ে সমগ্র রাংকূট শ্মশানে ভূমি নিজেদের অধিকারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়েই শিশুসদন কর্তৃপক্ষ জনরোষে পড়ে গেল। এই দ্বন্দ্বের নিরসনেই রামু উপজেলার A.C. ল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপে বাধ্য হয়ে পূর্বোক্ত নির্দেশ নামা জারি করেছিলেন।

বর্তমান রাংকূট বিহার ও জগজ্জ্যোতি শিশুসদন প্রসঙ্গটি একারণেই এখানে উল্লেখিত হলো যে, রাংকূট এর ভূমি আগ্রাসনের পরিকল্পনায় এই শিশুসদন কর্তৃপক্ষ বনায়নের নামে এবং গরুর খামারের নামে পুরো শ্মশানের অনেক প্রাচীন মট (কবর) এবং নেড়া টিলার স্তুপটি ধ্বংস করে ফেলে। সেই স্তুপের উপর শিশুসদন কর্তৃপক্ষ বর্তমানে জলের ট্যাঙ্ক স্থাপন করেছেন। আমার অনুপস্থিতে বর্তমান জগজ্জ্যোতি শিশুসদনটিও এখন পুরোপুরি খৃস্টান মিশনারী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে। সেই মিশনারী স্থানীয় একটি পরিবারের কিছু উগ্রপন্থী যুবককে পরিচালনা কমিটি এবং প্রকল্প গুলোর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে বসায়ে, অনৈতিক ভাবে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরকে প্রভাবিত করে সরকারী নিবন্ধনের বিধিবিধানের কোন তোয়াক্কা না করেই জগজ্জ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোমটি আর্ত-মানবতার সেবার নামে এখন পুরোপুরি এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেছে; যদি এমনটি বলা হয়, নিশ্চয় বেশী বলা হবে না। এ প্রসঙ্গে শিশুসদনটির বর্তমান ক্ষমতাধর ব্যক্তি ইতালিয়ান ফাদার লুইজি লুপির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তিনি আমাকে বলেন, NGO সংস্থা প্রত্যেকটি এভাবেই চলে। যখন প্রশ্ন করা হলো, মুরগীর খামারে পাঁচ হাজার মুরগী রেখে আপনারা ব্যবসা করতে পারেন। কিন্তু তার দুর্গন্ধে আমাদের এই তীর্থ স্থানের পবিত্রতা নষ্ট করলে এবং আমাদের অবস্থানকে দুর্বিসহ করে তুলেছেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন- "আপনারা গরীব, তাই আপনাদেরকে এমন দুর্গন্ধেই থাকতে হবে। যদি ধনী হতেন তাহলে ঢাকার মহাখালির নাবিস্কো কোম্পানির সুগন্ধি ভোগ করতে পারতেন।" বিশ্ব মানব হিতৈষী নামে বড়ুয়া নেতাদের কাছে আদরনীয় এই লুপি নামক ব্যক্তিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি রাংকূট তীর্থের জনগণের আবেদনকে উপেক্ষা করে

সংবিধানিক ক্ষমতার নামে বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির বাবু রাখাল দ্বারা এডভোকেট মনহরি, রাজু, আপ্পু, সানু প্রমূখ উগ্রবাদীদের নিয়ে কেন জগজ্জ্যোতি শিশুসদন পরিচালনা কমিটি গঠণ করলেন এবং স্কুল ঘর নির্মাণ করতে গেলে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভান্তেকে কেন অপদস্ত করা হলো, তার উত্তরে তিনি বললেন, তোমাদের হাতে বন্দুক না রাখলে ওরা এর চেয়েও উন্নতমানের অস্ত্র ব্যবহার করবে। স্কুল আমরাই করবো।"

বস্তুতঃ হাজার হাজার বছরের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারক এই পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থ এখন চতুর্দিক থেকে প্রবল আগ্রাসনের শিকার হয়ে গেল। জানিনা কবে, কোন্ হৃদয়বান শক্তিমানের করুণায় এই প্রবল আগ্রাসন থেকে হাজার বছরের ঐতিহ্যের ধারক এই বৌদ্ধ তীর্থটি রক্ষা পায়।

প্রত্নতত্ত্ব গবেষক মাসুম খান সাহেব 'বংশদীপ স্মরণিকার' ৫৮ পৃষ্ঠার এই নিবন্ধের তৃতীয় প্যারাতে লিখেছেন- "এটিলার পূর্বদিকে অবস্থিত যে টিলাটি আছে প্রধানত তাকে কেন্দ্র করেই বর্তমান 'রামকোট বিহার ও বনাশ্রম' নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানটি গঠিত। নিচ থেকে পাঁকা সিঁড়ি বেয়ে টিলার উপরে উঠতে হয়। সিঁড়ি প্রাচীন বলে মনে হয়। কিন্তু হাল আমলে এটিতে আমূল সংস্কার করা হয়েছে।"

এই সংস্কার কেবল সিঁড়িটির নহে; প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ জ্ঞানের অভাবে এবং তীর্থ পূজায় আগত পুণ্যতীর্থদের চিত্ত প্রসাদ উৎপাদনে সম্রাট অশোকের স্মৃতিধন্য মূল মন্দিরকেও ভেতরে বাইরে বর্তমানে সিরামিক টায়েলস বসায়ে তার প্রাচীনত্বকে বিলুপ্ত করে ফেলা হয়েছে। মূলতঃ প্রত্নতাত্ত্বিক ভাবে এসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্যে সরকারী যে সহায়তা প্রয়োজন, তা বাংলাদেশে একান্তই অপ্রতুল। পাকিস্তান আমল থেকে এ পর্যন্ত কোন সরকারই প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয় না। সরকার যদি এ বিষয়ে দূরদর্শী রাষ্ট্র ভারত, শ্রীলংকা, মায়ানমা এবং থাইল্যাণ্ডের মতো বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ অর্জিত হচ্ছে ট্যুরিজম ইণ্ডাষ্ট্রি থেকেই। আমাদের বুঝা উচিত, এদেশের সরকার গার্মেন্টস ব্যবসার মতো মুহু মুহু পরিবর্তনশীল এবং আন্তর্জাতিক (.....) শিকার একটি খাতকে যেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন, ঠিক তার অর্ধেক গুরুত্ব দিয়ে যদি ট্যুরিজম খাত সমৃদ্ধ করণে মনযোগি হতেন, তা হতো স্থায়ি, নিরাপদ এবং স্বাধীন এক জীবিকা। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে ট্যুরিজমের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ; তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহ।

সু-সংবাদ এই যে, কক্সবাজার জেলার বর্তমান প্রশাসক জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ মহোদয় তাঁর দূরদর্শী প্রাজ্ঞতায় এখন রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থটির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হয়েছেন তাই তিনি এই তীর্থকে এখন বেসরকারী বিমান যোগাযোগ ও পর্যটন কর্পোরেশনের উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভূক্ত করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি এই উদ্যোগটি যতই জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে, ততই সকর অশুভ কালো হাত গুঁটিয়ে যাবে এই মহা পুণ্য তীর্থের উপর থেকে। আমরা আকুল অন্তরে সেই শুভক্ষণের দিকে চেয়ে আছি।

গবেষক মাসুমখান সাহেব, একই প্যারাগ্রাফের মধ্যে লিখেছেন- "সিঁড়ির দক্ষিণ দিকের টিলার পাদদেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কয়েকটি পাকা কবর দেখা যায়। ....তবে কবর গুলি উত্তর দক্ষিণ লম্বা মুসলমানদের কবরের মত।"

আসলেই এগুলো প্রাচীন কবর নহে। এখানে সুপ্রাচীন কবর ছিল সিঁড়িটির গোড়ায় যেখানে প্রাচীন দুই তেঁতুল গাছ আছে, তার চতুর্দিকে। এগুলো এখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করেছে শিশুসদন কর্তৃপক্ষ, সৌন্দর্য বৃদ্ধির নামে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবরগুলো হচ্ছে আমার দেখা কয়েকজন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তির মূলতঃ শরত মহাজন, তাঁর পত্নী এবং প্রয়াত পুত্রদের। এদেশীয় বৌদ্ধগণ মৃতদেহ সৎকার ইদানি দুই ভাবেই করে থাকেন। যেখানে স্থান সংকুলানের অভাব আছে, সেখানে মরদেহের প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় দাহকৃত্যই সম্পাদন করেন। আর যেখানে বিস্তীর্ণ শ্মশান আছে, তথায় মট বা কবরস্থ করেন। এই কবর রাংকূট শ্মশানে, এজন্যেই উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত হয়, যেহেতু এ অঞ্চল থেকে ভারতে অবস্থিত বুদ্ধগয়া এবং বুদ্ধের শেষকৃত্য স্থান কুশিনগর উত্তর দিকেই স্থিত। বৌদ্ধগণ এ দুই স্থানকে, বিশেষ করে কুশিনগরের দিকে মৃতদেহের মাথা রেখেই সৎকার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকেন। আর একারণেই রাং-উ রাংকূট এর শ্মশানে মট বা কবরগুলো উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত।

গবেষক মাসুমখান সাহেবের নিবন্ধের উপসংহারে উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৫৯) চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক যাদুঘরের কর্মকর্তা জনাব আব্দুল ঘোষণা এবং সাইনবোর্ড দেওয়া হয়েছে"- এই দাবীটি মোটেই সঠিক নহে। বাস্তবে ইহাকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল তথা P.F. এবং সরকারী খাস ঘোষণা দেয়াতে স্থানীয় বিট কর্মীদের প্রশ্রয়ে স্থানীয় প্রভাবশালী ভূমি দস্যুদের জবর দখলকেই সেই ১৯৩১-৩২ খৃস্টাব্দ থেকে অদ্যাবধি পুণঃ পুণঃ উৎসাহিত করা হয়েছে। আর সে কারণেই বাংলাদেশের এমন মূল্যবান সম্পদটির আজকের এই

বেহাল অবস্থা। বর্তমানে যতটুকু অস্তিত্ব এর আছে তা বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং স্থানীয় দরিদ্র বৌদ্ধদের গুণেই যা-রক্ষা।
তাই আমরা ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের প্রাণের দাবী বাংলাদেশে একমাত্র প্রাচীন এই রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থটি রক্ষায় সরকার এগিয়ে আসুন এবং ইহার হারানো গৌরব পুণরুদ্ধার করুন।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম! সকলের শুভবুদ্ধির উদয় হোক!

--------০-------

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১। ঐতিহাসিক রাংকূট এর দ্বিতীয় প্রধান অধ্যক্ষ ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো লিখিত নিবন্ধ-১৯৭২ খৃঃ
২। 'রাজর্ষী ঃ পৃঃ ৮৭ ও ৮৯ ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৭ খৃঃ
৩। হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত ঃ ১৯৮ পৃঃ সম্পাদনা ঃ শ্রী প্রেমময় দাসগুপ্ত- ১৯৮২ খৃঃ
৪। বৌদ্ধ ঐতিহ্য ঋদ্ধ স্থাপত্য ঃ রামকোট বনাশ্রম বিহার (নিবন্ধ মাসুদ খান ঃ বংশদ্বীপ স্মারক-২০০৯
৫। রাংকূটে প্রাপ্ত রেকর্ড ফাইল- ১৯৭৭ খৃঃ থেকে ১৯৮৭
৬। সংঘরাজ সারমেধ ও বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম (নিবন্ধ) ঃ ডক্টর আব্দুল মাবুদ খান, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রজ্ঞা স্মরণিকা ১৭ই মার্চ ২০১০ খৃঃ
৭। ধাতুবংশ, পৃঃ ১০৮-২২
৮। চট্টগ্রামী বাংলার রহস্য ভেদ ঃ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক
৯। বৃহত্তর চট্টলা ঃ এম নুরুল হক, এম,এ
১০। Mayanmar- English Dictionary ঃ Department of Mayanmar Education
১১। মায়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ঃ ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা ঃ ডঃ স্বপ্না ভট্টচার্য (চক্রবর্তী)।
১২। মধ্যযুগের গীতি কবিতা ঃ বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলী ঃ সম্পাদনা ঃ বাংলা একাডেমী এবং অসম বুরুঞ্জী ও অসমিয়া বাংলা অভিধান ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
১৩। ডক্টর আব্দুল মাবুদ খান লিখিত নিবন্ধ ঃ 'সংঘরাজ সারমেধ'
১৪। ধাঈয়া ওয়াদি রাজোয়াঈং ঃ ইহা আরাকানের ধন্যবতী রাজধানীতে রাজত্বকারী রাজবংশধরগণের ইতিহাস গ্রন্থ। আচারিয়া পূর্ণাচার মহাস্থবির কর্তৃক আকিয়াবের এক প্রাচীন বিহারে তালপত্রের পুঁথিরূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।
১৫। আলাওল পদ্মাবতী ঃ সৈয়দ আলী আহসান- ১৯৬৮
১৬। ২০০৮ খৃঃ ৩রা জুলাই ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো ঐতিহাসিক রাংকূট এর অধ্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সৃষ্ট দলিল পত্র (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

বৌদ্ধ ঐতিহ্যঋদ্ধ স্থাপত্য ঃ রামকোট বনাশ্রম বিহার

মাসুম খান

বাংলাদেশে পূর্ব, পূর্ব-দক্ষিণ সীমানায় বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেষে হিমালয় পর্বত শ্রেণীর শেষ সীমা মৈনাক পর্বত কক্সবাজার জেলা শহরে অবস্থিত। কক্সবাজার জেলা কুতুবদিয়া, মহেশখালি, রামু, চকরিয়া, কক্সবাজার সদর, উখিয়া ও টেকনাফ চৌকির সমন্বয়ে ১৮৫৪ সালে বৃটিশ সরকার মহাকুমায় ভাগ করে এতদৃঞ্চলের শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করতে শুরু করে। ১৯৮৩ সালে রামু উপজেলায় রূপ লাভ করে। কক্সবাজার জেলা শহর থেকে পূর্ব দিকে সবচেয়ে কাছের উপজেলা রামু।

বাংলাদেশে অনেক প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, মন্দির, বিহার, মহাবিহারের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে। আরো প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার হচ্ছে। এ পর্যন্ত আবিষ্কারের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের দাবী 'উয়ারি বটেশ্বরে' অবস্থিত পর্যন্ত নগরই বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রাচীন কার্বন-১৪ ডেটিং পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান ৪৫০ খৃস্টপূর্বাব্দে এ নগর নির্মিত বলে মত প্রকাশ করেন। উয়ারি বটেশ্বর প্রত্ন এলাকা খননের পূর্ব পর্যন্ত বগুড়ার মহাস্থানগড় খননকৃত প্রত্ন নিদর্শনের মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন বলে মনে করা হত। কিন্তু তাদের নির্দিষ্ট কোন সময় বা তারিখের উল্লেখ করা হয় নাই বা উল্লেখ করা যায়নি। এ সব আবিষ্কৃত প্রত্ন নিদর্শন মন্দির, আশ্রম, বিহারের মধ্যে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার রামকোট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহারটি সন উল্লেখিত বিহার, যা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে দাবীদার। জনশ্রুতি ও বিহার তোরণে উল্লেখিত সন ৩০৮ খৃস্টপূর্বাব্দে। জনশ্রুতি আছে বিহার নির্মাণ তাছাড়া মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সীমানার দিকে দৃষ্টি দিলেও এর কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য ছিল মৌর্যদের। চন্দ্রগুপ্তের সীমানা ছিল বাংলা থেকে আফগাস্তিান সীমানার হিন্দুকুশ পর্বত মালা পর্যন্ত। আর মৌর্য সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী সম্রাট ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সম্রাট অশোক। অশোক তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন, তাঁর হাতে সাম্রাজ্য ছোট হয়নি। যেহেতু উত্তর ভারত সহ বাংলা থেকে হিন্দুকুশ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার পূর্বেই ছিল, তাই বলা যায় অশোক বাংলার দক্ষিণ পূর্বে তার সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকবে। 'ইতিহাসের খেরো খাতা'য় দিলীপ দেবনাথ বলেন-

"অশোক খ্রিস্টপূর্ব ২৪৭ অব্দ থেকে ২৩৬ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১ লামা তারা নাথের উদ্ধৃতি দিয়ে 'বৃহৎ বঙ্গ'- এ দীনেশ চন্দ্রসেন বলেন যে, চন্দ্রগুপ্তের সামাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত ব্যাপক ছিল। বিন্দুসার ২৯৮ খৃস্ট পূর্বাব্দে রাজা ইহয়া ২৭৩ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। বিন্দুসারের পুত্র অশোক ২৭৩ হতে ২৩২ পর্যন্ত ৪১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ২ অশোকের সময় ও রাজ্য সীমা নিয়ে 'প্রগতি প্রকাশন' মস্কোর 'ভারত বর্ষের ইতিহাস' এ বলেছে- "অশোকের শাসনামলে মৌর্য-সম্রাজ্য ক্ষমতা ও প্রগতির তুঙ্গে ওঠে। সাম্রাজ্যের পরিধি এ সময়ে আর বিস্তৃত হয় এবং প্রাচীন কালের প্রাচ্যদেশে এটি হয়ে দাঁড়ায় বৃহত্তম স্রামাজ্য গুলির একটি।" অশোকের সময় নিয়ে বলা হয়েছে যে, অশোকের রাজত্ব কালের সন-তারিখ নিরূপন নিয়ে ইতিহাস বোত্তাদের এখনও তুমূল বিতর্ক চলছে। তবে তাঁর অনুশাসন গুলি এই প্রশ্নটির সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি এর মীমাংসার পথে সহায়ক হতে পারে। অশোকের রাজ্যাভিষেকের বারো বছর পরে পর্বত গাত্রে উৎকীর্ণ তাঁর তথাকথিত প্রধান প্রধান অনুশাসনে সমকালিন পাঁচজন গ্রীক ও গ্রীক প্রভাবিত রাজার উল্লেখ আছে। এর অর্থ, যে-বছরে ওই অনুশাসন বা অনুশাসনগুলি পাথরে খোদাই করা হয়েছিল সে বছর উপরোক্ত পাঁচজন রাজাই জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ বছরটি তাহলে সম্ভবত ২৫৬ কিংবা ২৫৫ খৃস্টপূর্বাব্দ বলে অনুমিত হচ্ছে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, অশোকের রাজত্ব শুরু হয়েছিল আনুমানিক ২৬৮ খৃস্টপূর্বাব্দে। আবার অশোকের রাজত্ব কালের বিংশ বর্ষে প্রচারিত এক অনুশাসনে পাওয়া যায় বুদ্ধের জন্মস্থান দর্শনে ওই বছরে তাঁর যাত্রার উল্লেখ। এই সব কিছু একত্রে বিচার করলে আমাদের এমন অনুমান করার কারণ ঘটে যে, অশোকের রাজত্বকাল শুরু হয় ওই ২৬৮ খৃস্টপূর্বাব্দেই। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলা হয়েছে অশোক সিংহাসন গ্রহণ করেন বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২১৮ বছর পরে। বহু পণ্ডিত একমত যে বুদ্ধের মৃত্যু হয়- ৪৮৬ খৃস্টপূর্বাব্দে। এ হিসাবে দেখা যায়, অশোকের সিংহাসন গ্রহণের সন ২৬৮ খৃস্টপূর্বাব্দে। ৩ "সদ্ধর্ম রত্নাকর"- এ বলা হয়েছে, 'মহারাজ বিন্দুসার ধর্মত আটাইশ বসর রাজত্ব করিযাছিলেন। তাঁহার পরে মহারাজ অশোক সিংহাসনারূঢ় হন। অশোকের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে বিশেষত বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুইশত ছত্রিশ বৎসর পরে তাঁহার পুত্র মহীন্দ্র স্থবির লঙ্কায় পদার্পণ করিয়া ছিলেন'। ৪ এ হিসাবেও দেখা যায়- (৪৮৬-২৩৬+১৮)=২৬৮ খৃস্টপূর্বাব্দেই অশোক রাজত্ব লাভ করেন। অশোকের রাজ্যলাভ, কলিঙ্গের যুদ্ধ ও সীমা নিয়ে ড. এ. কে. এম.

শাহনাওয়াজ তাঁর 'দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় 'মৌর্য সাম্রাজ্য' শিরোনামে যে আলোচনা করেছে তার মূল কথা হলো, অশোক ২৭৩ খৃস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং এর চার বছর পর অর্থাৎ ২৬৯ খৃস্টপূর্বাব্দে অভিষিক্ত হন। জীবনের প্রথম অধ্যায় সে ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে কলিঙ্গ যুদ্ধ পূর্ব সময় কাল হচ্ছে অশোকের জীবনের প্রথম অধ্যায় এবং কলিঙ্গ পরবর্তী সময় তাঁর দ্বিতীয় অধ্যায়। এ যুদ্ধ তাঁর জীবন দর্শনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। অশোক পৈত্রিক সাম্রাজ্য লাভের প্রথম তের বছর সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন, অভিষিক্ত হওয়ার পর রাজত্বের ৮ম বা ৯ম বছরে অর্থাৎ ২৬০ অথবা ২৬১ খৃস্টপূর্বাব্দে তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। অনুশাসন লিপি'র ভাষ্যমতে অভিষেকের ৮ম বছরে 'দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী' কলিঙ্গ জয় করেছিলেন। কলিঙ্গ রাজ্য সুবর্ণ রেখা নদী থেকে গোদাবরী নদী পর্যন্ত ভারতের পূর্ব উপকূলে বিরাট অঞ্চলব্যাপি বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধ জয়ের পর অশোক ব্রাহ্মণ ধর্ম ত্যাগ করে বুদ্ধের অনুসারী হন। এ সময়ে অশোকের ধর্ম প্রচারের ইতিহাস কাল সম্পর্কে জানা যায়। ত্রয়োদশ শিলালিপিতে অশোক বলেছেন তাঁর সীমান্তবর্তী রাজ্যের ৬০০ যোজন পর্যন্ত সীমারেখায় ধর্ম বিজয় সাধিত হয়েছিল। মহাবংশসহ অনেক গ্রন্থে এর সমর্থন পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী গ্রিক শাসিত সিরিয়া, মিশর, মেসিডোন ও এপিরাসে তাঁর ধর্মবাণী প্রচারিত হয়েছিল। অশোকের সাম্রাজ্য হিন্দুকুশ পর্বত থেকে দক্ষিণে অন্ধ্র ও মহীশুর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে আরব সাগর থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" ৫ উপরে উল্লেখিত অশোকের সময় নিয়ে নানা মত পার্থক্য থাকলেও ৩০৮ খৃস্টপূর্বাব্দে অশোক ছিলেন এমন মন্তব্য কোথাও পাওয়া গেলনা। অর্থাৎ রামকোট বনাশ্রম বিহার অশোক কর্তৃক নির্মিত হলে তার নির্মাণ সহ হবে ২৬৮ খৃস্টপূর্বাব্দে পরে চল্লিশ বৎসরের (২৬৮-২২৮) মধ্যে। আর যদি ধরেই নেয়া হয় অথবা প্রমাণ মিলে, এ বিহার ৩০৮ খৃস্টপূর্বাব্দেই নির্মিত তাহলে বলতে হয়, স্থানীয় ভিক্ষু বা ভিক্ষুসংঘ দ্বারা ধনবান কোন ভক্ত এ বিহার নির্মাণ করেছিলেন। তাছাড়া স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ যেহেতু শিষ্য সহ চট্টগ্রামে এসেছিলেন। ৬ সেহেতু চট্টগ্রামের প্রাচীন বিহার নিয়ে তেমন প্রশ্ন করার থাকেনা। বুদ্ধের জীবিতাবস্থা সময়ের বিহার এতদঞ্চলে থাকা স্বাভাবিক। সে হিসাবে রামকোট বনাশ্রম বিহার অশোক কর্তৃক নির্মিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অশোক কর্তৃক ধর্মপ্রচার হয়েছিল তাঁর দেশের সীমার বাইরে পাশ্ববর্তী রাজ্যের ৬০০ যোজন (১ যোজন = ৪ ক্রোশ) ভিতর পর্যন্ত, তাছাড়া বন্ধু

রাষ্ট্রেও তাঁর গৃহীত ধর্ম প্রচার তিনি করেছিলেন। সে অবস্থায় তাঁর নিজ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একটি বিহার নির্মান এবং ধর্ম প্রচার তাঁর দ্বারা হতেই পারে। না হওয়াটাই এখানে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। অন্যদিকে রামু'র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্মা তত্ত্বনিধি প্রণীত 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, আরাকানের রাজেয়াং গ্রন্থ পাঠে জনা যায়, অতি পুরাকালে আরাকান রাজ্যে কাশী ধামের কোন নৃপতি আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অনেক পুত্রগণের মধ্যে কোমিসিংহ আরাকান রাজ্যপ্রাপ্ত হন, এবং বর্তমান চাঁদা শহরের নিকট রামাবতী বা রামরী নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। তথায় তাঁহার বংশধরগণ অনেক বৎসর উক্ত রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। তদনন্তর পরবর্তী কোন নৃপতির দুশমন পুত্রের হাতে রাজসিংহাসন পতিত হইলে তাহাদের অত্যাচারে রাজ্যে ঘোর অশান্তি জন্মে। সেইজন্য প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া ইহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়। এবং কয়েকজনকে হত্যা করে, পরে তাঁহাদের ঐ সিংহাসনের অধিকারিনী হয়। তিনি জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত রামাবতী ত্যাগ করিয়া আরাকান আসিয়া উপনিত হন এবং উক্ত ব্রাহ্মণকে পতিত্বে বরন করেন ও আরাকানে রাজধানী স্থাপন করেন। মহারাজোয়াং মতে এই মরু বা মৌরিয় বংশের রাজগণের সিংহাসন অধিগ্রহণের কাল খৃস্টপূর্ব ২৬৬৫ বৎসর। এই বংশীয়গণ ১৮৩৩ বৎসর তথায় রাজত্ব করেন।" ৭ এ থেকে অনুমান করা যায় বুদ্ধদেবের জন্মের আগেও 'রামরি' বা 'রামাবতী' পরবর্তীতে 'রামু'র ঐতিহাসিক ভূমিকা। এমন প্রসিদ্ধ স্থানে সম্রাট অশোক বিহার নির্মাণ করবেন না তা ভাবা যায় না। আর বিহারের সংখ্যা যদি হয় চুরাশি হাজার তাহলে তো কথাই নাই।

যা হোক, বুদ্ধ মূর্তি ও বিহার সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত কি না এ নিয়ে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। তবে আমরা এখানে এ বলতে পারি যে, বিহার অশোক নির্মাণ করেননি। এ বিহার নির্মিত হয়েছে তাঁর আগে। অশোক এখানে একটি বুদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন মাত্র। এমন মনে হওয়ার কারণ, পরিত্যক্ত বিহার আবিষ্কারক জগৎ চন্দ্র মহাথেরো এর মন্তব্য ছাড়াও বাহ্যিক কিছু প্রমাণ রয়েছে। যেমন, এ বিহারে প্রাপ্ত পত্র বস্তু বাংলাদেশের অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারে প্রাপ্ত প্রত্ন বস্তুর সাথে সদৃশ্যমান। বিশেষ করে ময়নামতি ও পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত প্রত্ন বস্তুর সাথে সাদৃশ্যমান। বিহারের আয়তন ৫২৫ শতক, অনুচ্চ পাহাড় শ্রেণী। বিহার নির্মাণের ইটের পরিমাপ- ৯''/৭''/২''। দেওয়ালের মাপ ৩৪'' পুরু। বর্তমান

বিহারটি ৩৪′/১৯′ আয়তনে নির্মিত। বর্তমান বিহারের দক্ষিণে একটি মজা পুকুর বিহারের সমসাময়িক সময়ের বলে মনে হয়। এ পুকুর থেকেই খাবার পানির যোগান হতো। পুকুরের পূর্ব ও পশ্চিম পাশে ঘাট বাঁধা ছিল, কালের স্রোতে তা এখন নেই, ভাঙ্গা ইটকালের সাক্ষ্যি হয়ে আছে। পশ্চিম পাশের ঘাটের ইট ফুরে যে গাছটি মাথা তুলেছিল একদিন, আজ তার পূর্ণ বয়স। পুকুরের দক্ষিণে অনুচ্চ পাহাড়টি পূর্বদিক ঘুরে উত্তরের মূল বিহারের পাশে এসেছে। পূর্ব দিকের অনুচ্চ পাহাড়ে ১৬. কোণ বিশিষ্ট প্রাচীন বুদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও নজর কাড়ে। পাহাড়ে উঠার নতুন সিঁড়ি, দুই পাশে প্রাচীন ইটের ধ্বংসাবশেষ নজরে পরে। বিশেষ করে উঠতে ডান পাশে বাঁধানো সিঁড়িটি। দীর্ঘ দিনের অবহেলায় সিঁড়ি ভেঙ্গে গাছ জন্ম নিয়েছে। সে গাছের বয়সও অনেক। ভাঙ্গা এ সিঁড়ির ইটের মাপ একই। এখানে একটি শিলালিপি পাওয়া যায়, জনশ্রুতি বলে অশোক লিপি। সে লিপি আমাদের সময় পর্যন্ত টিকে নেই ডাকাত কর্তৃক লুণ্ঠিত এবং ধ্বংস প্রাপ্ত। বর্তমানে এ পাহাড়ে বুদ্ধ মন্দির ছাড়াও রয়েছে রাম-সীতা মন্দির। হিন্দুর দাবি এ শিলালিপি নয়, এটা সীতাদেবীর মরিচ পেষার পাটা। এ বিষয়ে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন- "এখন এটি পুরাপুরি একটি হিন্দু মন্দির। এখানে একটি শিবলিঙ্গ আছে। স্থানিয় হিন্দুরা এর পূজা করে। শিবলিঙ্গের পশ্চিম পার্শ্বে একখণ্ড কাল পাথর (Black Baselt) আছে। পাথরের উপরিভাগ অর্ধবৃত্তাকার। ৯০˚৪০˚২৩˚ আয়তনের এ প্রস্থর খণ্ড সমগ্র অঞ্চলে যত পাথর ও পাথরের মূর্তি আছে, সেগুলির মধ্যে একমাত্র কাল পাথর। বাকি সবই স্থানিয় পাথর। স্থানিয় হিন্দুর মতে এ পাথর নাকি সীতা দেবী বনবাস কালে মরিচ-মসলা পিষতেন। প্রস্তর খণ্ডের উভয় দিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘষে-ঘষে এমন মসৃণ করা হয়েছে যে, প্রথম দৃষ্টিতে এটিকে শিল (শিল-পাটা) বলেই মনে হয়। কিন্তু এটকু মনোযোগ সহকারে পাথরটিকে পরীক্ষা করলেই বোঝা যায় যে, পাথরের উপরে এক বা একাধিক মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। স্থানিয় ভিক্ষু প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাদয়ের মতে পাথরের উপরে একটি শিলালিপি ছিল। প্রস্তর খণ্ডের নিচের দিকে ডান কোণে প্রায় ১৬ বর্গ ইঞ্চি স্থান জুড়ে একটি গর্ত (Deprerion) আছে। এতে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, পার্শ্ববর্তী উঁচু স্থানে কোন মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। প্রস্থর খণ্ডে যদি কোন লিপি উৎকীর্ণ বা খোদিত থাকত তবে এ গর্ত করার কোন আবশ্যকতা ছিল না। পাথর খানা আমরা খুব ভাল করে পরীক্ষা করে রেখেছি। এতে যে এক বা একাধিক মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নাই।" ৮ দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে,

আমাদের সময় পর্যন্ত কালো প্রস্তর খণ্ডটি টিকে নাই। ধ্বংস হয়েছে ডাকাতের হাতে এবং ভিক্ষু প্রজ্ঞাজ্যোতি মহোদয়কেও এ বিহারে পাওয়া যায়নি। তার পরিবর্তে ছিলেন চন্দ্র মহাথেরো। তিনিও এখন মানসিক ভারসাম্য হীন। তৃতীয় বারের মত যখন ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে রামকোট বনাশ্রম বিহার দেখতে যাই, তখন তিনি মৃত। সে যাই হোক প্রস্তর খণ্ডটি যে, সীতা দেবীর মসলা পেষার পাটা ছিল না তাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে পাথর খণ্ডে যে খুদিত মূর্তি ছিল তাও হলফ করে বলা যায় না। কেন না, জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া দেখেছেন প্রস্তর খণ্ডের নিচের দিকে গর্ত। তিনি বলেছেন ঝুলিয়ে রাখার জন্য এ গর্ত করা হয়েছিল। জনাব যাকারিয়া বলেছিলেন যে, পাহাড়টির মালিকানা নিয়ে স্থানিয় হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে দীর্ঘ দিন যাবৎ বিরোধ রয়েছে। হতে পারে হিন্দু কর্তৃক শিললিপির প্রমাণ ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তায় একটি গর্ত করা হয়েছে, উপর হলো না নিচে হলো তা তারা ধরতেই পারেননি। জনাব যাকারিয়ার মতে, খুদিত মূর্তির চিত্র যদি ঘষে ঘষে পাটা বানাতে পারে তা হলে গর্ত করা তেমন কি অসুবিধার?

শ্রীলংকার প্রত্ন খননে আবিস্কৃত শিলালিপির সূত্র ধরে, মায়ানমারের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক ভিক্ষু জগৎ চন্দ্র মহাথেরো ১৯৩০ সালে এ বিহার আবিস্কার করেন। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও খননে বাংলাদেশের এ প্রাচীন বৃহৎ প্রত্ন স্থানটি মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। মাটির উপরে ভেসে উঠে রামু'র প্রাচীন কৃষ্টি। বৌদ্ধ অধ্যুষিত চট্টগ্রাম বিশেষ করে দক্ষিণ চট্টগ্রামে প্রাচীন কালের ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক বাহক। এখান থেকে বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতি বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হতো তার প্রমাণ মিলে। এখনও "সারা দুনিয়াতে যে সমস্ত বৌদ্ধবিহার আছে সেগুলো পরিচালিত হচ্ছে চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের দ্বারা।" ৯ এ বিহারে পাওয়া প্রত্ন বস্তুগুলোর সাথে ময়নামতি-লালমাই, পাহাড়পুর বিহারে পাওয়া প্রত্নবস্তুর সাথে মিল পাওয়া যায়। এখানে পাওয়া উল্লেখযোগ্য প্রত্নবস্তুর মধ্যে রয়েছে স্থানিয় পাথরে নির্মিত বৃহাদাকার অভয় মুদ্রার বুদ্ধ মূর্তি। প্রচুর পরিমানে বুদ্ধ ভাস্কর্যের ভাঙ্গা মূর্তি। এর মধ্যে বুদ্ধের দু'টি পায়ের চিহ্ন ও হাত-পা ভেঙ্গে যাওয়া একটি মুখোবয়ব, এটি প্রত্নতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কার। ভাঙ্গা এ বুদ্ধ মূর্তিটি ভূমি স্পর্শ মুদ্রার নির্মিত। মূল বিহারের কাছে পূর্ব দিকের একটি পাহাড়ে ইটের ছোট ছোট টুকরো এবং বৃহদাকার ইমারতের গঠন বিন্যাসের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। যা দেখে প্রাথমিক ধারণা হয়, এখানে ভিক্ষুদের আবাসিক এবং শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। আবুল কালাম মোহাম্মদ

যাকারিয়া'র ভাষায়- "রামু-টেকনাফ রাস্তা ধরে বাঁকখালি নদী অতিক্রম করে একটি ছোট খাল পার হয়ে কিছু দূর গেলেই রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ২/৩ টি ও পূর্ব পার্শ্বে বেশ কয়েকটি অনুচ্চ পাহাড়ি টিলা দেখা যায়। এ সমস্ত টিলার প্রত্যেকটি কিছু না কিছু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বা ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায় দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রায় দুই বিঘা স্থান জুড়ে টিলার উপরে যে সমতল ভূমি আছে, তার প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্থানের (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে) মধ্যে একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বর্তমান ধ্বংস প্রাপ্ত অবস্থায় এবং উৎখনন না করে এর পরিচিতি সম্পর্কে সঠিক ভাবে কিছু বলা কঠিন। স্থানিয় ভিক্ষু মহোদয়ের মতে এখানে বৌদ্ধস্তুপ ছিল। থাকা বিচিত্র নয়। কারণ, এখানে পাথরে তৈরী বেশ বড় আকারের একটি বৌদ্ধ মূর্তির একাংশ জঙ্গলাকীর্ণ ধ্বংসাবশেষের উপর পড়ে আছে। এটি এখানকার ধ্বংস প্রাপ্ত ইমারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বলে ধারণা হয়। তবে এটি বৌদ্ধস্তুপ ছিল, না, মন্দির ছিল, তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কীর্তিটি যে বেশ বড় ধরণের ছিল, ধ্বংসাবশেষ দেখেই তা বোঝা যায়।

এই ধ্বংসাবশেষের প্রায় ৩০০ মিটার দক্ষিণ-পূর্বদিকে বড় রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে একটি টিলা আছে। পাশের সমতল ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন এ টিলার মধ্যে প্রচুর প্রাচীন ইট ও দু'একটি বুদ্ধ মূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখে ধারণা করা যায় যে, এখানে একটি বৌদ্ধ স্তুপ বা মন্দির ছিল। এ টিলা থেকে কিছু দক্ষিণ দিকে একটি ছোট নেড়া টিলা আছে। এখানেও প্রচুর প্রাচীন ইট এবং ইটের ভগ্নাংশ দেখা যায়। এখানে কোন বৌদ্ধ মন্দির বা স্থানীয় 'জাদুঘর' জাতীয় কোন ইমারত ছিল বলে মনে হয়।

এ টিলার পূর্ব দিকে অবস্থিত যে টিলাটি আছে প্রধানত তাকে কেন্দ্র করেই বর্তমান 'রামকোট বিহার ও বনাশ্রম' নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানটি গঠিত। নিচ থেকে পাঁকা সিঁড়ি বেয়ে টিলার উপরে উঠতে হয়। সিঁড়ি প্রাচীন বলে মনে হয়। কিন্তু হাল আমলে এটিতে আমূল সংস্কার করা হয়েছে। সিঁড়ির নিচে দক্ষিণ দিকের টিলার পাদদেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কয়েকটি পাকা কবর দেখা যায়। ভিক্ষু মহাশয়ের মতে এগুলি স্বর্গীয় বৌদ্ধদের কবর হতে পারে। তবে কবর গুলো উত্তর-দক্ষিণ লম্বা মুসলমাদের কবরের মত।

এ টিলার উপরে বর্তমান বনাশ্রমের যে মন্দির আছে, তা হাল আমলের। কিন্তু এর দেয়ালের গঠন প্রণালী ও ইটের নমুনা দেখে ধারণা যায় যে, একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষের উপর এবং তাকে কেন্দ্র করে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। পূর্বমুখি ও তিন কক্ষ বিশিষ্ট এ মন্দিরে বহু বৌদ্ধমূর্তি সংগৃহিত আছে। বেশ বড়

আকারের একটি বুদ্ধমূর্তিকে হিন্দু দেবদেবীর পূজার অনুকরণে চাল-ডাল, ফল-মূল ইত্যাদি নৈবদ্য দিয়ে নিত্য পূজা করা হয়। মন্দিরের চারপাশের সমগ্র টিলা জুড়ে অনেক বুদ্ধ মূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। আর দেখা যায় প্রাচীন ইট ও প্রাচীন ইমারতের ভিত্তির কিছু কিছু নিদর্শন। এখানে যে একটি প্রাচীন ইমারত ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।" ১০ রামকোট বনাশ্রম বিহারে প্রত্ন খনন কাজ না করে এর সঠিক নির্মাণ সময় বলা সম্ভব নয়, বলেই সবার ধারণা। তবে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হয় যে, অশোক কর্তৃক এ বিহার নির্মাণ হয়েছে ৩০৮ খৃস্টপূর্বাব্দে, পাহাড়পুর বিহারের নির্মাণ ধরা হয় ৩৫০ খৃস্টপূর্বাব্দে। অর্থাৎ পাহাড়পুর বিহার, রামকোট বিহার সমসাময়িক সময়ে নির্মিত। রামকোট বিহারের আবিস্কারক পণ্ডিত জগৎ চন্দ্র মহাথেরো এ বিহার ৩০৮ খৃস্টপূর্বাব্দের বলে মত দিয়েছেন। শ্রীলংকায় প্রাপ্ত শিলালিপির তথ্যকে ভিত্তি করে। তাঁর মতে, অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অস্ত্র ত্যাগ করেন এবং হিন্দু ধর্মও ত্যাগ করেন। সে সাথে তিনি বুদ্ধের অহিংস ধর্মে দীক্ষিত হন। এ সময়েই তিনি উল্লেখিত মূর্তিটি নির্মাণ করেন। তাহলে দেখা যায় বিহারটি পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত, অশোক সেখানে একটি বড় বুদ্ধ মূর্তি স্থাপন করেছিলেন মাত্র। ড. দীনেস চন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে সম্রাট অশোকের শাসন সময় দেখিয়েছেন-খৃস্টপূর্ব ২৭৩ অব্দ হতে ২৩২ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। ১১ অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ৩০৮ অব্দ সম্রাট অশোকের শাসন সময়ের মধ্যে পরে না। বর্তমান অবস্থায় পাওয়া এ বিহারের প্রাচীনত্বের সর্বশেষ সংস্কার বা নির্মাণ হয় 'আরাকানের চন্দ্রজ্যোতি রাজার রাজত্ব কালে দ্বাদশ শতকে'। ১২ বিহারটির প্রাচীনত্ব নিয়ে কোন সংশয় নাই, কিন্তু এ বিহার অশোক কর্তৃক নির্মিত হলে এর নির্মাণ সন দ্বারায় ২৭১ খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে ২৬৯ খৃস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। 'সদ্ধর্ম রত্নাকর' গ্রন্থ মতে- সম্রাট অশোক একদিন বুদ্ধের উপদেশ বাণী কত তা প্রশ্ন করেন। উত্তর- তাহা অঙ্গ অনুসারে নয় প্রকার, আর স্কন্ধ বিভাগ অনুসারে চুরাশী হাজার। তখন অশোক ঘোষণা করেন- 'প্রিয় অমাত্যগণ তোমরা চুরাশী হাজার নগরে চুরাশী হাজার বিহার নির্মাণ করাও।" এক সাথে এ চুরাশী হাজার বিহার নির্মাণ করতে সময় লাগে তিন বছর। চুরাশী হাজার বিহার নির্মাণ করিয়ে অশোক বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকারী দাবী করেন। ভিক্ষুসংঘ তা মেনে না নিয়ে বলে ঔরসজাত পুত্র শাসনে প্রব্রজ্যিত না হলে পিতা বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। তখন অশোক, পুত্র মহেন্দ্রকে মোগ্গলিপুত্র 'তিষ্য স্থবির উপাধ্যায়' ও মহাদেব স্থবির এর কাছে প্রব্রজ্যা করান। 'সদ্ধর্ম রত্নাকর' এর মতে মহেন্দ্রর প্রব্রজ্যার সময়

অশোকের রাজত্ব কাল ছয় বৎসর 'সুমন'কে হত্যা করে সমগ্র সাম্রাজ্য দখল করে নেয়। সুমনের অত্যসত্ত্ব স্ত্রী ছদ্মবেশে বাহির হয়া এবং এক চণ্ডাল গ্রামে আশ্রয় নেন। সেখানে তাঁর পুত্র সন্তান জন্মে যার নাম 'ন্যাগ্রোধ কুমার'। ন্যাগ্রোধ কুমারের সাত বৎসর বয়সে 'বরুণ' নামক জনৈক অর্হৎ স্থবিরের কাছে প্রব্রজ্যিত করিয়ে ছিলেন। ন্যাগ্রোধ কুমার অর্হৎ লাভ করে যখন তাঁর মায়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলেন, তখন অশোক এই বালক সাধু পুরুষ দেখে বুদ্ধ ধর্মের প্রতি মুগ্ধ হন। ১৪ তারপরই অশোক বুদ্ধ ধর্মের কার্যক্রম শুরু করেন। তাহলে ন্যাগ্রোধ কুমারের বয়সের সাথে অশোকের রাজত্ব পরিচালনার হিসাব সম্পর্কিত। সাত বছর বয়সে প্রব্রজ্যার জন্য গমন এবং অর্হত্বলাভের জন্য নুন্যতম সময় লেগেছে আট বছর। তাহলে দাঁড়ালো ৭+৮=১৫ বছর। অর্থাৎ অশোক যখন বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হলেন, তখন তাঁর রাজত্বের বয়স ১৫ বছরের কিছু বেশি। এর তনি বছর পর বিহার নির্মাণ শুরু করেন। অর্থাৎ ১৮ বছর পর। তাহলে সন দাঁড়ায় ২৬৮-১৮ =২৫০ খৃস্টপূর্বাব্দ। মোট কথা, রামকোট বনাশ্রম বিহার অশোক কর্তৃক নির্মিত হলে এ সময়েই নির্মাণ হয়েছিল। অন্যথায় এর নির্মাতা অশোক নয় অন্য কেউ।

রামকোট বনাশ্রম বিহারের আশ-পাশের জনবসতি থেকে জানা যায়, বর্তমান মূল বিহারের পাহাড় ছাড়াও অন্যান্য ষোলটি পাহাড় থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রাচীন প্রত্ন বস্তুর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের প্রত্ন তত্ত্ব বিভাগ এ বিহার সংরক্ষণ বা সংস্করণ বা অনুসন্ধান খনন কোন কিছুতেই হাত দেয়নি বলে জানা যায়। চট্টগ্রাম জাতি তাত্ত্বিক যাদুঘরের দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার জনাব আব্দুল বাতেন সাহেব কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এলাকাটি সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়েছে এবং একটি সাইন বোর্ড দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সরকারের প্রত্নবিভাগ একটি সাইন বোর্ড টানিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছেন বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু বিহারের আশে পাশে কোথায় এ ধরণের সাইন বোর্ড আমাদের চোখে পড়েনি। যা হোক, বালাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রয়োজনে বিহারটি খননের ব্যবস্থা সরকারের করা উচিত বলে মনে করেন সকল শ্রেণীর স্থানীয় জনগণ। এখানে প্রত্ন তাত্ত্বিক খনন কাজ হলে প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ বিহার, সমসাময়িক সভ্য নগর সহ মহামূল্যবান প্রত্নবস্তু পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে কারণে বেশ ক'বার অত্র অঞ্চলে দুস্কৃতিকারীর দল বেশি দূর যেতে পারে। কিন্তু তা কত দিন? দুস্কৃতিকারীর দলতো সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। বর্তমানে স্থানটি সম্পূর্ণ অরক্ষিত। তাকে রক্ষা করে জাতীয় গৌরবকে উন্নচিত করা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১. দিলীপ দেবনাথ- ইতিহাসের খেরো পাতা । পৃঃ ৩৪ দিব্য প্রকাশনী, ঢাকা । প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী ২০০৬
২. দীনেশ চন্দ্র সেন- বৃহৎ বঙ্গ । পৃঃ ১৫৩
৩. কোকা আন্তোনভা, গ্রি. বো. লেভিন, গ্রি. কতোভস্কি- ভারতবর্ষের ইতিহাস । পৃঃ ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৯৮৬ । অনুবাদ- মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ।
৪. শ্রী ধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনূদিত 'সদ্ধর্ম রত্নাকর' । প্রকাশঃ ১৯৩৬ খৃস্টাব্দ, রেঙ্গুন । বৌদ্ধ মিশন প্রেসে মুদ্রিত । পৃঃ ৩৪৪
৫. ড. এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ- দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস । পৃঃ ১৫০, ১৫১, ১৫৪, ১৫৯, ১৬০ । প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা । প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৩
৬. ড. আবুল কাশেম- চর্যাপদ আবিষ্কারের শতবর্ষ পূর্তি ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা । 'অনোমা' রজত জয়ন্তী স্মারক- পৃঃ
৭. চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্মা তত্ত্বনিধি- চট্টগ্রামের ইতিহাস । পৃঃ ২৯, ৩০ । গতিধারা, ঢাকা । গতিধারা'র প্রথম প্রকাশ- মার্চ ২০০৪
৮. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া- বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ । পৃঃ ৬৯৯ । দিব্য প্রকাশ, ঢাকা । প্রথম দিব্য প্রকাশ কর্তৃক সংস্করণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৭
৯. ড. আবুল কাসেম- প্রাগুক্ত
১০. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া- বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ । পৃঃ ৬৯৫, ৬৯৬ । দিব্য প্রকাশ, ঢাকা । প্রথম দিব্য প্রকাশ কর্তৃক সংস্করণ- ফেব্রুয়ারী ২০০৭
১১. ড. দীনেস চন্দ্র সেন- 'বৃহৎ বঙ্গ' । পৃঃ ১৫৩ । দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ- ১৯৯৯
১২. ড. সুনীথানন্দ- বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন । পৃঃ ১৮১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা । প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৫
১৩. সদ্ধর্ম-রত্নাকর । পৃঃ ৩৪০, ৩৪৩

লেখক ঃ- প্রাবন্ধিক ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষক ।

-------০-----

সধাতুক ইতিহাস প্রসিদ্ধ রামু রামকোট বুদ্ধ

বিদর্শক প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো

বড়ুয়াদের পূর্ব পুরুষ মগধ ক্ষত্রিয় রাজবংশ ধন্যবতীর (আরাকানের প্রাচীন রাজধানী) রাজা চান্দাসুরিয়ার সময়ে ভগবান গৌতম বুদ্ধ ধাতুবংশ দেশনাকালে আনন্দকে ভবিষ্যতবাণী করিয়াছিলেন, "হে আনন্দ! ভবিষ্যতে পশ্চিম সমুদ্রের পূর্বপার্শ্বে পাহাড়ের উপর আমার বক্ষাস্থি স্থাপিত হইবে, তখন উহা রাং-উ (রামু) নামে খ্যাত হইবে। এই ঐতিহাসিক রামু চৈত্য হইতেই (রামকোট বুদ্ধের মস্তকে স্থাপিত বক্ষাস্থি) এই দেশের নাম হয় রামু।

ঐতিহাসিক তথ্যমতে ভগবান বুদ্ধ ধন্যবতী যাওয়ার সময়ে অত্র পাহাড়ের এক বটবৃক্ষমূলে নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই মহাকরুণাচিত্তের অধিষ্ঠানের প্রভাবে "এই রামকোট চৈত্য" সকল দেবমনুষ্যের পবিত্র পূণ্য পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে। এই কারণেই শ্রদ্ধাবান মানুষেরা এই স্থানে পূজা ও প্রার্থনা করিয়া প্রার্থীতে সুফল লাভ করেন এবং তাদের রোগব্যাধি, বিপদ ও অন্তরায় মুক্ত হন। "ধন্যবতী রাজবংশ ১৫১ পৃষ্ঠা, ধাতুবংশ ১১২ পৃষ্ঠা।"

অতীতে রামকোট চৈত্যের চারিদিকে বিহার সঙ্ঘরাম স্তুপাদিতে এই স্থান উন্নত ছিল। এখানে ৭০০ শত ভিক্ষু থাকিতেন। ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে মোগল আক্রমনে ধ্বংস হইলে, ক্রমে ইহা গভীর জঙ্গলে ঢাকা পড়ে। বিগত ১৯২৯ খৃস্টাব্দে জগৎ চন্দ্র মহাস্থবির এই রামকোট চৈত্য ও প্রাচীন বৌদ্ধ এলাকা আবিস্কার করতঃ রামকোট মন্দির ও "সধাতুক বুদ্ধকে" কিছুটা সংস্কার করিয়া একটা বৌদ্ধমেলার প্রবর্তন করেন। উল্লেখ্য যে, জগৎ চন্দ্র ভান্তেকে দুইজন ঋদ্ধিবান ভিক্ষু ভবিষ্যতবাণী করিয়াছিলেন, "ভন্তে আপনার সময়ে আর কিছুই হইবে না।" আপনার পরবর্তী সময়ে একজন প্রতিভাবান ভিক্ষু আসিবেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় এই স্থান আবার

বিশেষ উন্নত হইবে। মহাস্থবিরের প্রশ্নে, তাঁহারা "হিমালয়ের নন্দবন হুহা" হইতে আগত বলিয়া জানাইলেন। জগৎ চন্দ্র মহাস্থবিরের মৃত্যুর ২২ বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত সংরক্ষকের অভাবে এই পীঠস্থান আবার বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন হইতেছিল। সেই মহাপুরুষদের আশীর্বাদ নিয়া ১৯৬৬ইং আত্মমুক্তি ও বুদ্ধ শাসনের উন্নতিকামী হইয়া আমি রামকোট পূণ্যতীর্থে আগমন করি। বিগত ২৬ বৎসর পূর্বে আমি আসার আগে, এই "সধাতুক রামকোট বুদ্ধের" পূজাও চলিতনা রীতিমত। আমার অদম্য কর্ম প্রচেষ্টায় আজ এই রামকোট বৌদ্ধ পীঠস্থান সর্ব্বতোভাবে উন্নত। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পূণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে।

---------o-------

A brief history of Raungkut (Ramcot) stupa of 3rd century B.C.

(Established by Emperor Asoka the great)

Venerable Prajna Bangsha Mahathero

ঃ Its present activities & future plan ঃ

Pre-Historic Era:

Dhayawati (Dhanyavati) was a prosperous capital of ancient kingdom of ARAKAN. 'Candasuriya was the king of the kingdom. He came from Vesali of Magada of central India. Once Buddha the Enlightened One disclosed to his chief attendant Ananda; "Oh Ananda! In near future on the Eastern mountain range of Western ocean (the Bay of Bengal) my chest bone relics will be preserved in a Stupa (Cetiya). Then the area will be called Raung-U (Ramu); means the sacred chest bone. As it was preserved on the hill-top, so it is called "Raungkut"(mountain with chest-bone).

Time passed with many ups & down. The local original Buddhist inhabitants called it "RAUNGKUT' On the other hand historians called it 'Ramcot' a cantonment of the Arakan Emperor. All the documentary evidences are noted in (i) The sacred book 'Datubangsha' at page No: 108-122, of 3rd century B.C. (ii) The history book of "Dhayanawati Raja Vangsa" at page no: 46-77, of 6th century A.D. (iii) The GEOGRAPHY OF TALE MI of 2nd century B.C. (in Greek language0 (iv) The history of Chittagong (Chattagramer itihash) at page No-127 by mahabubul Alam and (v0'Rajarsi' of 1868 A.D. by Rabindranath Tagore.

Historical Era:

In the 3rd century B.C. ASOKA, the most reputed emperor of the world history conquered & spread his vast kingdom to the east of the Bay of Bengal up to

Ramyavati Nagar, the ancient name of Raungkut (Ramu) which is in the south-eastern border of his empire. It is a historical truth that; ASOKA, the emperor erected & established countless pillars, cetiyas, stone-writings to display & commemorate the important doctrine of Buddha at the reputed public places for the welfare of the society & mankind. His devotion was so grave that the emperor excaved & collected the preserved Bone-Relics of Buddha, which was restored earlier by the king Ajatasatru of Magada after the Nibban (Final demise) of the Enlightened One Buddha. The excaved "Bone-relics" were preserved in 84 (eighty four) thousand Stupas through out the Emperor Asokan empire in 286 B.C. They are called "Cetiya" Each Cetiya was opened to public to pay homage & respect to "Buddha's Bone-Relics" which represents the Buddha. This Raungkut (Ramcot) Cetiya is one of those Cetiyas of Emperor Asoka. Thus the prediction of Buddha was miracally came true. By and by this "Ramkut Cetiya" grew rapidly & established like Nalanda, Sompur Vihar, Pandit Vihar etc in this India sub-continent. Large number of Monks & Novices dwelt here for study and meditation in this Raungkut Cetiya. The record is found in the sacred pali historical book "Datubangsha" at page No: 108-122 & in the historical book of Arakan Kingdom Dhayawadi Raja Wain page No: 46-77. In the 6th century a renowned Saint Chandra mani Bhikkhu with his brilliant psychic power stayed a certain period at "Raungkut Maha Cetiya" He came here from Chandranath hill, now called Sitakundu of Chittagong. He was also the enchastor of Cedi, a Buddhist king of Bajji race(Barua) of central India (Magada). He established a Buddha Image to preserved that Bone relic on the head of the image. It is also note worthy that in the 7th century A.D. the world famous pilgrimage of China, Rev. Hu-en-Sung visited this holy place and saw this Buddha image with Asokan pillar and Stupa. [Hu-en-Sung-er Dekha Bharat- page No. 198, By Premomoy Das Gupta- 1982].

Buddha Image: From the time of embodiment of Buddha Chest-Bone-Relics on the head of this Buddha image wonderful and miraculous psychic power is radiated from this Buddha Statue. People of all around began to assemble every day to pay homage and respect to this Buddha Image by performing various religious rites and rituals.

It is a matter of great regret that in 1666 A.D. a Mogul Muslim Commander named Phathekhan attacked this religious monument "Raungkut Cetiya" with his brutal forces, badly damaged all the ancient establishment & killed most of the innocent monks and devotees. The whole of this holy monument area became a deserted hill which ultimately turned into deep forest. In spite of this sad incidence, the Buddhist community of surrounding area far and near who escaped from battle field and alive, built a twine Cetiya (temple) putting Buddha image inside on a hill top in memory of the departed monks and devotees who were killed in battle in 1666 A.D. & some portion used as grave yard (Mahashwashan). "About 263 years after, in 1929 A.D. with the help of some historical records and instruction from his master the most Ven. Purnachar Mahathero of Patiya Upazila an archeologist Buddhist monk Ven. Jagatchandra Mahathero excavated and discovered the "Raungkut Cetiya" of 3rd century B.C. and the broken Green stone Buddha Image, that was established by the king Candrajyoti of 6th century A.D. After the excavation by the patronage of a local renowned landlord Mr. Matising Mahazan, the "Raungkut Cetiya" a historic era was opened to the public. Venerable Jagatchandra Mahathero started the reconstruction work with his own hand and stayed here for 18 years up to his death. During the work of excavation a large stone slab of historic scripture was found in early Burmise language of 7th century with the sayings:-"Here the Buddha image is embodied with the Chest-bone of the Buddha Sakyamuni, that has been found in this Cetiya of Emperor Asoka". But unfortunately some miscreants stole the stone-slab at dead of night at the end of 1930.

Time passed by, during the last part of the British rule in 1932, a Hindu Settlement officer recorded Rang-U as Ramu and Raungkut as Ramcot ignoring or without knowing the historical background and truth. By this record a Hindu prist stayed in one of the twin tumb (temple) and secretly damaged one of the Buddha Statue replacing "Shiba-Linga". For this reason a court case had been launched by the local Buddhist. At length a compromise deed was signed on 11th February 1933 under the supervision of Mr. G.K. Bose, Hindu district collector of India with two parties the Hindu and the Buddhist community, dividing the hill into two equal halves. One of the twin Temple was given to Hindu community to perform their religious rites and rituals. After the sad demise of Ven. Jagatchandra Mahathero in 1948 the excavator of "Raungkut Mahacetiya" Ven. Prasanna Bhikku, Cakariya and a tribal Marma monk, stayed there for a small period. Then a long period of 18 years the "Raungkut Cetiya" left abandoned.

In 1966 A.D. meditation teacher Ven. Praggajyoti Mahathero took over the charge of this historic religious Monument Raungkut. He stayed here for 22 years. With his utmost effort and dedication he was able to draw the kind attention of local administration enlighten public to restore this historical site. But Praggajoti Mahathero was personally assaulted by forceful land possessors and was fatally injured. He tried his level best to protect and preserve the "Raungkut Maha Cetiya" and its adjacent area but the forecelful possessors were so ferocious that they tried to kill him. His life became insecure at "Raungkut". On that odd situation his chief disciple Ven. Prajnabangsha Mahathero the then deputy chief of Chittagong Central Buddhist Monastery nandankanan, Chittagong took him with his own care to Chittagong and recovered him with proper treatment. In the mean time the forceful land grabbers captured almost all encircling area of "Raungkut Mahavihar" They set up houses and a locality which created destructive activities of this historical site. At

this the existence of the Raungkut Cetiya was in danger. To protect the existence of this historical religious monument Ven. Prajnabangsha Mahathero inspired Father Luigi Lufi of Italy to set up a voluntary institution like children welfare home. As a result with the financial assistance of Karitas Italiana, a voluntary organization of Italy build up a children welfare home of 100 seats for destitute children with an unique modern architecture named "Jagatjoti Children Welfare Home" with the help of Mr. Manas Barua a brilliant son of imminent land-lord of Ramu. Today it is true as that of a broad day light that as per plan and thought of Ven. Prajnabangsha Mahathero, we not only preserved and protected the remaining land space of "Raungkut Maha Cetiya" area but also has saved it from destruction. Now "Raungkut Cetiya" is one of the nationally and internationally recognized historical site. It's glory and importance is rapidly growing in the national and international horizon. Plantation of varities of trees by the financial assistance of Jagatjoti Children Welfare Home of Maha Cetiya becomes a place of charming natural beauty, a place of historical interest and place to serve the mankind for world peace harmony and coexistence. At present the " Raungkut Maha Cetiya" really is a TAPOBAN.

Now Ven Prajnabangsha Mahathero a highly educated, nationally and internationally reputed Buddhist monk, a translator and writer of many books on the sacred Tripitaka, has been taken over the charge of the principal of "Raungkut Maha Cetiya" on 3rd July in 2008 A.D. This fulfills the long waited demand of local public and the Buddhist community as a whole. It is hoped that by his brilliant novel and dynamic leadership and fruitful guidance the "Raungkut Maha Cetiya" will be able to regain its lost glory and dignity.

Present Daily Activities of Raungkut Maha Cetiya (Stupa) Complex:

- To get up early in the morning at 3 A.M. to make all resident (monks and novies) accustom to this habits. From 3 A.M. to 5 P.M. meditation, paying homage, recitation and chanting of sutra for the cultivation of dhamma
- Cleaning the whole campus for enhancing the environment from 5 A.M. to 6 A.M.
- Pindacharan (alms begging) for breakfast and lunch & religious service to the Children Welfare Home from 6 A.M. to 7 A.M.
- 7 A.M. to 9A.M. in the morning and 1 P.M. to 4 P.M. in the afternoon educational activities. i.e. study.
- 5 P.M. to 7 P.M. in the evening religious service to local public, prayer, meditation and Dhamma talk.
- 7 P.M. to 10 P.M. refreshment with cool drinks. Study and take rest for night with meditaion.

Extra Activities :

- Handful rice collection and per day one coin deposit Programme for small deposit for distribution of loan and grant for improving education, health and economy of local people.
- Moral teaching programme for local young stars and the children of Jagatjoti Children Welfare Home.
- Plantation and vegetable cultivation programme.
- Morning 8 A.M. – 10 A.M. and 1 P.M. to 5 P.M. free tourist guide service is given to the visitors.
- Providing coaching class to the destitute children in primary and secondary classes from 6 AM – 8 AM.
- Providing embroidery, tailoring and computer training to the destitute youngs.

Future Plan :

- Sending "Brotherhood Missions" for communal harmony and co-existence in cities and villages with the noble teachings of Buddha.
- Training programme of Buddhist Meditation Technique through out the years in Raungkut Maha Vihara complex under experienced teachers (open to all religious believers or non believers).
- Sending bilateral groups for Forest Retreat from the residential of Raungkut Maha Vihara.
- To co-operate Jagatjoti Children Welfare Home and local youngsters for computer training and other professional technical works.
- Raising fund to establish a modern printing press for free publication of monthly and annual activities report along with the noble teaching of great men like Buddha.

Some Urgent Needs :

- To build up a museum building to restore the archeological important items.
- Erection of 50 bed residential building for monks and novices of Raungkut. (estimated cost of one room is 100,000/- Taka.)
- To erect 25 bed room with attached bathroom, for meditation center. (per bed estimated cost 150,000/- Taka)
- To build up one 2000 seated auditorium for a large gathering like Buddha Purnima, New Years Day and other religious and national days.
- Reception-cum rest-house for visitor's tourists. (estimated cost–40 lakh Taka)
- To build up three storied building for public library and research, computer training center and printing press.

N.B. :

- Name plate is applicable for the donor above TK 100,000/- in memory of the dearest one.
- Donation above TK 10,000/- will be mentioned in the Donation Board
- Donation is acceptable in cash or cheque or Bank Draft to the bank account mentioned below:- Prime Bank Ltd. SB A/C No. 14521060014070, Chittagong, Bangladesh.

------o-----

'সংঘরাজ সারমেধ ও বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্ম'

আব্দুল মাবুদ খান

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশ নানা ধর্ম, বর্ণ ও জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি। হিন্দু-মুসলমান প্রধান জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী বাস কর, তাদের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষের উপর। হিন্দু-মুসলমানের মত বৌদ্ধরাও এদেশের সুখ ও দুঃখের অংশীদার। তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্রময়। সংগত কারণেই বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনার দাবী রাখে। বলা প্রয়োজন যে, আলোচ্য প্রবন্ধ বাংলাদেশের বড়ুয়া সমাজের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে।

এক.

সারমেধ মহাস্থবির একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। বাংলাদেশে বৌদ্ধিক নব-জাগরণের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। এই মহাপুরুষের অবদান ও কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে আজকাল কদাচিৎ আলোচনা হয়। তার প্রধান কারণ, প্রথমতঃ আমাদের ইতিহাস সচেতনতার অভাব, দ্বিতীয়তঃ আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারা।

ঊনবিংশ শতাব্দী হল নব-জাগৃতির যুগ। এ নব জাগৃতি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বুদ্ধির মুক্তি, চিন্তার স্বাধীনতা, অতীতকে নতুন আলোকে পর্যবেক্ষণ করা হল নব জাগৃতির প্রধান লক্ষণ। বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ সমাজে এ নব জাগৃতির প্রধান পুরোহিত ছিলেন সারমেধ মহাস্থবির নামে একজন প্রখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু।

১৮০১ খৃস্টাব্দে সারমেধ মহাস্থবির আরাকানে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৮৫-১৮২৫ খৃস্টাব্দে পর্যন্ত আরাকানের রাজনৈতিক জীবন ছিল অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। বলা বাহুল্য, ১৭৮৫ খৃস্টাব্দে আরাকানে বর্মী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আরাকানের এই রাজনৈতিক আবহাওয়ায় তিনি শ্রামণ্য ধর্মে অর্থাৎ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হল সারমেধ। সারমেধ শ্রামণের উপাধ্যায়ের নাম হল সারালংকার মহাস্থবির। ১৮২১ খৃস্টাব্দে সারালংকার মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ে আরাকানী ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে সারমেধের উপসম্পদা কর্ম সম্পাদিত হয়। আলোচ্য পর্বে আরাকানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে জবিন যাপনের অনুকূলে ছিল না। এই পরিস্থিতিতে আচার্য্য সারালংকার মহাস্থবির ভিক্ষু সারমেধকে নিয়ে চট্টগ্রাম জেলার চকরিয়া থানার হারবাং গ্রামে পদার্পণ করেন। হারবাং এ তখন বহু আরাকানী বসবাস করতো; এইসব বসতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে গড়ে উঠতে শুরু করে। ১৮২৬ খৃস্টাব্দের য়ান্দাবুর চুক্তির ফলে একদিকে প্রথম ঈঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের অবসান ঘটে অন্যদিকে আরাকান ও টেনাসিরিমে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একদেশ হতে অন্য দেশে যাওয়ার আর কোন অসুবিধা রইল না। এই অবস্থায় আচার্য্য সারালংকার মহাস্থবির তদীয় শিষ্য ভিক্ষু সারমিত্রকে নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে আরাকানে ফিরে যান। ব্রিটিশ কর্তৃক আরাকান দখলের পর ম্রোহং (বা পাথুরে কিল্লা) স্থানান্তর করা হয়। এই সময় কয়েকজন গৃহী 'ছেড়াগ্য' নামক স্থানের দক্ষিণ তীরে 'গদুভাঙ্গা' নামক খাড়ী উপকূলে আচার্য্য সারালংকার মহাস্থবির ও তদীয় শিষ্য সারমেধ ভিক্ষুর বসবাসের জন্য একখানি বিহার নির্মাণ করে তাদেরকে দান করেন। সারালংকার মহাস্থবির- এর প্রতি স্থানীয় জনসাধারণের ছিল প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা। এই বিহারে অবস্থানকালে তাঁদের বিনয়সম্মত চাল-চলন, আচার-আচরণ স্থানীয় দায়ক ও দায়িকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কালক্রমে এই বিহারটি আরাকানে "সারালংকার বিহার" নামে পরিচিত হয়ে উঠে। আচার্য্য সারালংকার মহস্থবিরের তিরোধানের পর তদীয় শিষ্য সারমেধ ভিক্ষু উক্ত বিহারের অধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হন।

সদ্ধর্মের উন্নতির জন্যে সারমেধ ভিক্ষু পুর্নোদ্যোমে কাজ শুরু করলেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি সারাদেশ ভ্রমণ আরম্ভ করেন। আকিয়াব তখন আরাকানের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। আকিয়াব বন্দর থেকে নানা দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগে আকিয়াবের প্রতিপত্তিশালী নাগরিক, সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের সহায়তায় ভিক্ষুসংঘের চতুর্প্রত্যয় ও প্রয়োজনীয় বিদ্যাশিক্ষার

সহায়ক গ্রন্থাদি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। দায়ক-দায়িকাদের প্রতি সদ্ব্যাবহার ও বিনয়ানুগ আচরণের ফলে সারমেধ ভিক্ষুর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আরাকানের একটি প্রচলিত নিয়ম ছিল যে, দেশের উন্নতি ও প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে তৎকালীন আরাকানী সম্রাটরা খ্যাতনামা বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে নানা ধরনের উপাধি দিয়ে সম্মানিত করতেন। প্রাচীনকালের আরাকানী রাজাদের মত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে ১০৫ জন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে সারমেধ মহাস্থবিরকে 'সারমেধালঙ্কারভিতি সাসনধর মহাধর্ম রাজাধিরাজগুরু" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে জেলা জর্জ উফা ঠোরে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪৫। এই উপাধি পাওয়ার পর থেকে তিনি 'সংঘরাজ' এবং তাঁর বিহারটি 'সংঘরাজ বিহার' একবার চট্টগ্রামে এসেছিলেন। এই সময় চাকমা সার্কেল- এর প্রধান কালিন্দী রাণী তাঁর বিনয়সম্মত আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে "সারমেধ লংকারাভিতি বিনয়ধর সাসনধ্বজ মহাধর্ম রাজাধিরাজ গুরু" এই মহাসম্মানজনক উপাধি দেন। তাঁর বয়স ৫৮ বছর। ইহা ছিল সারমেধ মহাস্থবিরের দ্বিতীয় উপাধি লাভ।

বর্মী সম্রাট সকলেই বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য বহু কাজ করে গেঠেন। সম্রাট মিন ডন মিন ১৮৭১ খৃস্টাব্দে ইতিহাস প্রসিদ্ধ পঞ্চম সঙ্গায়ন করে বিখ্যাত হয়ে রয়ে গেছেন। এই ধর্মোৎসবে বহু খ্যাতনামা ভিক্ষু যোগদান করেছিলেন। আরাকানের সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির উ অগ্গ চ্যেন ডেন কে নিয়ে মান্দালয়ে উপস্থিত হন। বর্মী সম্রাট মিন ডন মিন যথোচিত সম্মানের সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। উক্ত সঙ্গায়নে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ ও রাজকর্মচারীদের উপস্থিতিতে সম্রাট মিনডন মিন "সারমেধ ভিতি সাসনধ্বজ মহারাজাধিকার গুরু" উপাধি ও একটি শীলমোহর দিয়ে সারমেধ মহাস্থবিরকে সম্মানিত করেন। তিনি সৌজন্য সহকারে রাজপ্রদত্ত সম্মান অনুমোদন করলেন। মান্দালয়ে কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি আরাকানে প্রত্যাবর্তন করেন। দীর্ঘদিন সদ্ধর্মের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে একাশি বৎসর বয়সে ১৮৮১ খৃস্টাব্দে আরাকানে সংঘরাজ বিহারে তিনি দেহত্যাগ করেন। এভাবে নিভে গেল সদ্ধর্মের এক বহ্নিশিখা।

অতিসম্প্রতি উপরোক্ত মহাপুরুষের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য শুরু করেছেন, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। অভিযোগগুলি হল ঃ- ১. সংঘরাজ

সারমেধ মহাস্থবির বাংলাদেশে সংঘভেদ করেছেন, অতএব তিনি 'সংঘাদিসেস' অপরাধে অপরাধী, ২. তৎকালে আরাকানে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত তা কতটুকু সত্য? তা যে বিকৃত বৌদ্ধধর্ম ছিল না তারই বা প্রমাণ কি? ৩. ধর্ম-সংস্কারের জন্য আরাকান থেকে তিনি যে ভিক্ষু সংঘ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন এ সংঘ কতটুকু পরিশুদ্ধ ছিল? ৪. 'হাঞ্চার ঘোনা' নামক স্থানে তিনি যে সর্বপ্রথম উপসম্পদা দিয়েছিলেন উক্ত 'সীমা'টি কতটুকু পরিশুদ্ধ ছিল? উপরোক্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। এখন দেখা যাক উক্ত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে ইতিহাস কি বলে।

দুই.

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত আরাকান ও বার্মা (মায়ানমার) আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ। আরাকান বর্তমানে ব্রহ্মদেশে অন্তর্গত একটি প্রদেশ। আরাকানের পূর্বদিকে য়ুয়ামা পর্বতমালা আরাকান ও বার্মার সীমানা নির্দেশ করে সমান্তরাল ভাবে উত্তর-দক্ষিণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরাকানের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে চীন হীল ও ভারত, উত্তর-পশ্চিমে নাফ নদী যা আরাকান ও বাংলাদেশের সীমানা নির্দেশ করে প্রবাহিত। অবশিষ্ট জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ও জড় উপাসক। বর্তমান আরাকানের বৌদ্ধগণ থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করে। ত্রিপিটক হল তাদের ধর্মগ্রন্থ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের থেরবাদী বৌদ্ধদের মত আরাকানীরা 'ওয়াছো' 'উপোসথ', 'প্রবারণা' ও 'কঠিন চীবর দানোৎসব' জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্‌যাপন করে। অন্যান্য থেরবাদী বৌদ্ধদেশ হল বার্মা, থাইল্যাণ্ড, লাওস, কম্বোডিয়া ও শ্রীলংকা।

আকিয়াব, সেন্ডোয়ে, ম্রোগ ও কেয়াক্ত প্রভৃতি শহরে অতি প্রত্যুষে শত শথ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ভিক্ষাপাত্র হাতে রাস্তা প্রদক্ষিণ করতে দেখা যায়। এ অবস্থায় গৃহীরা ভিক্ষাপাত্রে আহার্যবস্তু দান করে অশেষ পূণ্যের অংশীদার হন। থেরবাদী বৌদ্ধ দেশগুলিতে শুধু এই নিয়ম প্রচলিত। শীলে, দানে ও ধর্মে-কর্মে ভিক্ষু ও গৃহীদের ধর্মীয় জীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আকিয়াবে, মন্ডুতে, রাথিডংয়ে, বুথিডংয়ে চৈত্য, প্যাগোডা, সুবৃহৎ বিহারগুলি বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রাচীনকালে আরাকানে বৌদ্ধধর্ম যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈশালী ও কেয়ক্ত শহরের

আশেপাশে নানা ধরণের ও আকারের প্যাগোডার অবস্থান গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য বিহার আরাকানে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তির সাক্ষ্য দেয়। আরাকানের কেয়ক্ত শহরের পূর্বদিকে শিলাগিরি পাহাড়ে মহামুণি বিহার একটি বৌদ্ধবিহার দৃষ্টিগোচর হয়। একটি জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, গৌতম বুদ্ধ ঋদ্ধিবলে একদা পাঁচশত শিষ্য নিয়ে ধর্ম প্রচার করার জন্য আরাকানে এসেছিলেন। আরাকানী সম্রাট চন্দ্রসুরিয়া বুদ্ধের অনুকরণে একটি মূর্তি তৈরী করে বিহারে স্থাপন করে নাম রাখেন মহামুণি; এই সময় থেকে উক্ত বিহার 'মহামুণি বিহার' নামে পরিচিতি হয়ে উঠে। ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে বর্মী রাজ বোধপায়া আরাকান দখল করে উক্ত বুদ্ধমূর্তি আরাকানে নিয়ে যান। বর্তামানে এটি মান্দালয় শহরে আছে। 'রাখাইন রাজওঁয়ে' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় খৃঃপূর্ব ২৬৬৬ থেকে ১৭৮৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বহু রাজবংশ আরাকান শাসন করেছে, এই রাজবংশগুলির মধ্যে 'ধন্যাবতী', চন্দ্রবংশ, ও 'থ্রাউক' বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই সকল রাজবংশের রাজারা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ। সাম্প্রতিক কালের গবেষণার ফলেও সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

কথিত আছে যে, খৃঃপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আরাকানে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে, এই সময় আরাকানের সিংহাসনের উপবিষ্ট ছিলেন ধন্যবর্তী রাজবংশের সম্রাট চন্দ্রসুরিয়। একথা সুবিদিত যে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত বা ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। তদীয় পুত্র সংঘমিত্রা ও মহেন্দ্রকে শ্রীলংকায় এবং সোন ও উত্তরা নামক ভিক্ষুদ্বয়কে সুবর্ণভূমিতে প্রেরণ করেছিলেন। অনেকেই সূবর্ণভূমি ও ব্রহ্মদেশ এক এবং অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত ভিক্ষুদ্বয় প্রাচীন থাটন জেলার বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। কালক্রমে থাটন বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে। একাদশ শতাব্দীতে প্যাগান সম্রাট অনাটরা (১০৪৪-৭৭) থাটন নিবাসী অরহান নামক প্রসিদ্ধ ভিক্ষুর নিকট থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন। সম্রাট অনারটার প্রচেষ্টায় ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আসীন হয়। প্যাগান সম্রাটদের প্রচেষ্টায় ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এই সময় পেগু শহরের সন্নিকটে 'কালিয়ালী চং' নামে একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠে। শিলালিপি সূত্রে জানা যায়, এই স্থানটি ছিল বর্মী সভ্যতার অতি প্রাচীন কেন্দ্র। আরাকানী ভিক্ষুসংঘ এ স্থান থেকে দীক্ষা (উপসম্পদা) গ্রহণ করেছিলেন বলে ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। পেগুর এই ভিক্ষুসংঘ ছিল সোন ও উত্তরা

ভিক্ষুদ্বয়ের উত্তর সাধক। উক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, অতি প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি আরাকান ও বার্মার অধিবাসীগণ সম্রাট অশোকের আমলের বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করে। উল্লেখ্য যে, বর্মী ভিক্ষুসংঘের সঙ্গে শ্রীলংকার ভিক্ষুসংঘের রয়েছে নিবিড় যোগাযোগ। শ্রীলংকা একটি প্রসিদ্ধ থেরবাদী বৌদ্ধদেশ। শ্রীলংকার ভিক্ষুসংঘও বুদ্ধ শাসনের অন্যতম উত্তরাধিকারী।

তিন.

একথা কারও অজানা নেই যে বৌদ্ধধর্ম একসময় ভারত উপমহাদেশে প্রচন্ড প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ তার সত্যতা প্রমাণ করে। সাঁচী স্তুপ, সারনাথ, কুশিনারা, সোমপুর ও শালবন প্রভৃতি এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অতীতের বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধগৃহী সমাজের অবস্থান এবং তাদের ধর্মীয় আচার আচরণের পরিচয় দেয়। সম্রাট অশোক, কনিষ্ক ও হর্ষবর্ধনের প্রচেষ্টায় ভারত-উপমহাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অভাবিত উন্নতি ঘটে। কিন্তু কালের বিবর্তনে নানা ঐতিহাসিক কারণে বৌদ্ধধর্ম ভারতেদক্ষিণ-পূর্ব কোনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ভারতের এই দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এখন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত।

অনুমান করা হয় সম্রাট অশোকের পূর্ববর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সংস্কৃত বিনয়পিটকে উপসম্পদা বিষয়ক অধ্যায়ে পুণ্ড্রবর্ধনের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুণ্ড্রবর্ধন উত্তরবঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ জনপদ; সাঁচীতে প্রাপ্ত দু'জন পুণ্ড্রবর্ধনবাসী কর্তৃক প্রদত্ত দু'খানি শিলালিপিতে উৎকীর্ণ লিপি দৃষ্টে খৃঃপূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা হয়। মহাস্থানগড় ও নাগরযোনীকোন্ডা শিলালিপিতে এ কথায় সমর্থন পাওয়া যায়।

খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দীর ভেতর বহু চীনা পরিব্রাজক বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য ভারত উপমহাদেশে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ ও ইৎসিঙের নাম উল্লেখযোগ্য। ফা-হিয়েন পঞ্চম শতাব্দীতে তাম্রলিপিতে (বর্তমান মেদিনীপুর) দুই বৎসর অবস্থান করে 'সুত্র গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রণয়ন ও বুদ্ধমূর্তির নকশা অঙ্কন করেছেন।" এই সময় তিনি উক্ত স্থানে বাইশটি বৌদ্ধবিহার দেখেছেন বলে তাঁর বিবরণে উল্লেখ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলেও বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিউয়েন-সাঙ নামে আর একজন চীনা পরিব্রাজক সপ্তম শতাব্দীতে তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ

করেছেন যে, তিনি বাংলাদেশে এসে স্বচক্ষে প্রধান প্রধান বৌদ্ধ কেন্দ্র গুলি পরিদর্শন করেছেন; পুণ্ড্রবর্ধনে বিশটি বৌদ্ধ বিহার ও তিন হাজার বৌদ্ধ রাজবংশ যথা, খড়্গ বংশ, পালবংশ, চন্দ্রবংশ ও পট্টিকের অস্তিত্ব ছিল। উক্ত রাজবংশগুলির মধ্যে পালবংশ হল সবচেয়ে প্রধান।

পাল রাজাগণ প্রায় চারিশত বৎসর বাংলাদেশ শাসন করেন। পালযুগকে 'বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণ যুগ' বলে অভিহিত করা হয়। পাল রাজারা মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেক সরকারী কার্যবিবরণীর প্রারম্ভে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রার্থনা সূচক বাণী দেখা যায়। পালরাজারা বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ ও সংস্কার করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় ও ভূমিদান করেছেন। পাল যুগ ছিল হীনযান (থেরবাদ) বৌদ্ধ ধর্মের পতনের যুগ এবং মহাযান বৌদ্ধধর্ম বিকাশের সময়। কালক্রমে মহাযান বৌদ্ধধর্ম মূল বৌদ্ধধর্মে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে। 'মহাযানী শূণ্যবাদ' বিজ্ঞানবাদ, প্রভৃতি জটিল বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব সাধারণ মানুষের মন আকৃষ্ট হল। অসংখ্য দেব-দেবীর কল্পনা, তাদের পূজা, মণ্ডল আঁকা, স্তোত্র, তন্ত্র-মন্ত্র, মুদ্রা-ধারনী এসব ক্রিয়াকলাপ প্রধান্য লাভ করে এবং এগুলো বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অঙ্গরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ক্রমে ক্রমে মহাযান শাখা থেকে একটি বিকৃত বৌদ্ধধর্ম যা "তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম" নামে পরিচিতি বিকশিত হয়ে উঠে। আবার তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম থেকে কারচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযান শাখার সৃষ্টি হয়, পুনরায় এই শাখা গুলি হতে মন্ত্রযান ও তন্ত্রযান শাখার সৃষ্টি হয়। সোমপুরী, বাসুবিহার, জগদ্দল, নালন্দা ও পণ্ডিত বিহারে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের চর্চা হত। অনেক তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য্য এই বিহারগুলিতে বসবাস করতেন। বগুড়া, ময়নামতি ও পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন বাঙ্গালী, তাঁদের মধ্যে জ্ঞানশ্রী, অভয়করগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, প্রজ্ঞাগুপ্ত, কুক্কুরীপাদ এর নাম উল্লেখযোগ্য।

খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামে পণ্ডিত বিহার নাম একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এই শিক্ষা নিকেতনের এতই খ্যাতি ছিল যে, দেশ-বিদেশের বহু শিক্ষার্থী এখানে সমবেত হয়েছিলেন। রাজা মহীপালের রাজত্বকালে (৯৮৮-১০৩৩) আচার্য্য প্রজ্ঞাভদ্র এই বিহারের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তিলোপা বা তিলপাদ নামে পরিচিত। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে তিনি বিকৃত সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রজ্ঞাভদ্রের শিষ্য ছিলেন নাড়পাদ নামক একজন সিদ্ধাচার্য্য। কথিত আছে যে বলিরত্ন নামক এক বৌদ্ধ আচার্য্য তান্ত্রিক ধর্মপ্রচারের

জন্য চট্টগ্রাম থেকে তিব্বতে গিয়েছিলেন। বস্তুতঃ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পূর্ববঙ্গে যে সমস্ত বিহারের অস্তিত্বে ছিল সবকটিতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের চর্চা হত। সোমপুরী, দেবকোট, বাসুবিহার ও আনন্দ বিহার ছিল তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য্যের পঠন-পাঠনের প্রধান কেন্দ্র।

পাল রাজত্বের অবসানের পর সেনবংশ বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে, সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ ধর্মের যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়া কলাপের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল বুদ্ধ হিন্দুদের দশ অবতারের মধ্যে নবম অবতার হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন। কালক্রমে বৌদ্ধপুরোহিত ও হিন্দু পুরোহিতের মধ্যে কোন পার্থক্য রইল না। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও ব্রাহ্মণদের মত সামাজিক কর্মকান্ডে, পূজা অর্চনাতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। এই অবস্থায় বৌদ্ধ পুরোহিতেরা অনেকেই বিহারে বা সংঘরামে বাস করা প্রয়োজন মনে করেননি। ফলে বহু বৌদ্ধ বিহার ভিক্ষুহীন অবস্থায় পড়ে রইল। শুধু অতীতের স্মৃতি ছাড়া এই বিহারগুলিতে আর কোন কিছু অবশিষ্ট রইল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বখতিয়ার খিলজীর আক্রমণে নালন্দা বিহার ধুলিসাৎ হওয়ার ফলে বহু পুঁথি ও পান্ডুলিপি আগুনে ভস্মিভূত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বিহারগুলি এই আক্রমণ থেকে রক্ষা গেল বটে, কিন্তু তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম উক্ত স্থানে টিকে রইল।

চার.

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বখতিয়ার খলজীর নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৭ খৃস্টাব্দে পর্যন্ত মুসরমানেরা বাংলা শাসন করে। পলাশী যুদ্ধের পরেই বাংলা ব্রিটিশ অধিকারে আসে। দেশের এই রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যে বৌদ্ধদের ইতিহাস অনুসন্ধান করা যেমন দুরূহ তেমনি কঠিন। বস্তুতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের কোন সঠিক ইতিহাস নেই। এই যুগকে, "বৌদ্ধধর্মের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ" বলে অভিহিত করা হয়। আলোচ্য পর্বে বৌদ্ধদের মধ্যে তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। ১. বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মুসলিম সমাজে বর্ণভেদ প্রথার অনুপস্থিতি ও সকলের অধিকার বৌদ্ধদের নিকট ছিল অকল্পনীয়। প্রাচীনকালে বৌদ্ধরা যে অঞ্চলে সংখ্যাগুরু ছিল সে সব অঞ্চল মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তার সত্যতা প্রমাণ করে। ২. বৌদ্ধদের একটি অংশ হিন্দুসমাজে বিলীন হয়ে যায়, ইতিহাসে বহু প্রমাণ রয়েছে। ৩. বাংলার মাটিতে

একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধধারা টিকে রইল; এরা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব থেকেই হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা দূরীভূত হতে দেখা যায়। বিনয় পিটকের নিয়মানুযায়ী ভিক্ষুদের জীবন-যাপন করা, আচার-অনুষ্ঠান পালন মোটেই সম্ভব ছিল না। কারণ 'প্রাতিমোক্ষ', 'উপসম্পদা' ও কর্মবাচা সম্বন্ধে বৌদ্ধপুরোহিতদের কোন ধারণা ছিল না। একদিকে ধর্মশাস্ত্রচর্চার কেন্দ্রগুলি যেমন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল অন্যদিকে দক্ষ ভিক্ষুসংঘের ছিল একান্ত অভাব। ফলে বৌদ্ধ গৃহী ও বৌদ্ধ পুরোহিতেরা শনি, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা প্রভৃতি হিন্দু পূজা পার্বন উদ্‌যাপন শুরু করে। হিন্দুদের মত বৌদ্ধরা আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ব্রতগুলি উদ্‌যাপন করতে দেখা যায়। বুদ্ধের অহিংসা বাণী লঙ্ঘন করে অনেকেই কিন্তু কালিবাড়ীতে পশু বলি দিতে শুরু করল। বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা গৃহীদের মত সামাজিক উৎসব অংশগ্রহণে দেখা যেত; হিন্দু ব্রাহ্মণের ন্যায় কোন কোন বৌদ্ধপুরোহিত বিবাহ করে সংসার জীবন যাপন শুরু করল। 'প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব ভুলিয়া গেল, শূণ্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও করুণাবাদ ভুলিয়া গেল, শীল, বিনয়, ভুলিয়া গেল। তখন রইল কতগুলি ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত তান্ত্রিক পুরোহিত। তাহারা আপনারে মত করিয়া বৌদ্ধধর্ম গড়িয়া তুলিল।" বিকালে ভোজন করা, চিড়া, দধি, গুড় খাওয়া অনেক বৌদ্ধপুরোহিতের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তিব্বতে, নেপালে এই শ্রেণীর পুরোহিতেরা 'লামা' নামে পরিচিত। চট্টগ্রাম জেলায় এ ধরণের বৌদ্ধপুরোহিতেরা 'রাউলী' হিসেবে পরিচিতি। কয়েকজন প্রসিদ্ধ রাউলীর নাম আজও চট্টগ্রামবাসীর মুখে মুখে শোনা যায়, যেমন খুদ্যা রাউলী বা থান রাউলী, চান রাউলী। বলাবাহুল্য, এসব রাউলীরা এতই প্রভাবশালী ছিলেন যে চট্টগ্রাম জেলার রাস্তাঘাট, পুল, হাট-বাজার, পুকুর, ভিটার নামের সঙ্গে 'রাউলী' শব্দটি আজও জড়িয়ে আছে। রাউলী পুরোহিতদের তিনটি শ্রেণী ছিল যথা 'মাথের', ও পাইংজং। 'নিমন্ত্রণে যাওয়ার সময় কামে পুরোহিতেরা মুকুট বা হুতুক পড়িতেন, পাইজাংগণ মস্তক আবৃত করিয়া যাইতেন এবং মাথেগণ বৃহৎ শ্বেত ছত্রধারণ করাইয়া গমন করতেন।"

রাউলীদেরকে কোন কোন অঞ্চলে 'পুংগ্রী' বলা হত। যেমন কয়েকজন পুংগ্রী নাম ঃ আরিপা পুংগ্রী, আনঞ্চ পুংগ্রী, মোরাঞ্চা পুংগ্রী ও হারিপা পুংগ্রী। আবার কোন কোন অঞ্চলে রাউলী পুরোহিতেরা'রাউর' বা 'ঠাকুর' নামেও পরিচিতি ছিল। 'ত্রিরত্নের পূজায় ও বন্দনায় শ্রাদ্ধ তিথি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বৌদ্ধগণ যে মন্ত্র উচ্চারণ করত তার ধরনও ছিল পালিভাষা থেকে ভিন্ন। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ-এর পরিবর্তে কেউ কেউ

'ফরা', 'তারা', 'চংকা' বলে উচ্চারণ করত। এতে বোঝা যায় বৌদ্ধগণ ছিল বিকৃত বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা নানা বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে রাউলী পুরোহিতেরা এই বিকৃত বৌদ্ধধর্মকে টিকে রেখেছিলেন দীর্ঘদিন। এক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ রাউলী পুরোহিতেরা ছিলেন তৎকালে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক।

পাঁচ.

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের যখন এই শোচনীয় অবস্থা তখন আরাকান বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। আরাকান নিবাসী সংঘরাজ সারমেধ ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার কযেকজন তান্ত্রিক বৌদ্ধ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে এক ভিক্ষুসংঘ নিয়ে চট্টগ্রামে আগমন করেন। সর্বপ্রথম তিনি ভিক্ষুসংঘ গঠন করার দিকে মনোযোগ দিলেন; কেননা ভিক্ষুসংঘ ব্যতীত বৌদ্ধধর্ম টিকে থাকতে পারে না। রাউলী পুরোহিতদেরকে নতুন ভাবে উপসম্পদা (দীক্ষা) গ্রহণ ব্যতীত কারো ভিক্ষু পদে অধিষ্ঠিত থাকার অধিকার নেই। সংস্কার আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সাতজন প্রখ্যাত রাউলী পুরোহিত 'হাঞ্চারঘোনা' নামক স্থানে সারমেধ মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ে নতুন ভাবে উপসম্পদা গ্রহণ করলেন। উল্লেখ্য যে, "হাঞ্চারঘোনা" রাউজান থানার পাহাড়তলী মহামুণি থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিনে অবস্থিত। উক্ত সাতজন বৌদ্ধপুরোহিত হলেন পাহাড়তলীর লালমোহন ঠাকুর, ও কমল ঠাকুর, ফিরিঙ্গীখিলের হরি ঠাকুর, মির্জাপুরের সুখচাঁন ঠাকুর, গুমানমর্দনের দুররাজ ঠাকুর, দমদমার অভয়শরণ ঠাকুর এবং বিনাজুরীর হরি ঠাকুর। উপরোক্ত সাতজন রাউলী কর্তৃক নতুনভাবে উপসম্পদা গ্রহণ বৌদ্ধ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ঘটনার পর প্রতিদিন দলে দলে বহু রাউলী পুরোহিত নতুন ভাবে উপসম্পদা গ্রহণ করতে লাগলেন। সারমেধ মহাস্থবির প্রথমতঃ বিনয়পিটকের বিধি অনুযায়ী মধ্যাহ্নের পর ভিক্ষু সমাজকে আহার গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদন জানালেন এবং গৃহীদের মত সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করলে 'দুক্কট' আপত্তি হবে বলে তিনি উল্লেখ করলেন। দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান হিন্দু-পূজা-পার্বন উদ্‌যাপনের বিরুদ্ধে তিনি তুমুল প্রচার চালাতে লাগলেন। এদিক দিয়ে তিনি অকৃতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে একটি নতুন নিকায় (Sect) জন্মলাভ করে, এই নিকায় 'সংঘরাজ নিকায়' নামে পরিচিত। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সারমেধ মহাস্থবির উক্ত নিকায়ের 'সংঘরাজ' (প্রধান) অধিষ্ঠিত ছিলেন।

নিম্নে সংঘরাজ নিকায়ের মহামান্য সংঘরাজদের নাম দেয়া হল ঃ সংঘরাজ নিকায়-

১। সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির (১৮৬৪-১৮৭৭)

২। পূর্ণাচার ধর্মধারী চন্দ্রমোহন (১৮৭৭-১৯০৮)

৩। জ্ঞানলংকার মহাস্থবির (১৯০৮-১৯২৭)

৪। বরজ্ঞান মহাস্থবির (১৯২৭-১৯৩৬)

৫। তেজবন্ত মহাস্থবির (১৯৩৬-১৯৪২)

৬। ধর্মানন্দ মহাস্থবির (১৯৪২-১৯৫৭)

৭। অভয়তিষ্য মহাস্থবির (১৯৫৭-১৯৭৫)

৮। শীলালংকার মহাস্থবির (১৯৭৫-২০০০)

বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির এক প্রতিবেদন বলা হয় বর্তমানে ৯৫০টি বৌদ্ধ বিহারের মধ্যে ৯০০ বিহার সংঘরাজ নিকায়ের অধীন, উপরোক্ত ৯০০ বিহারে প্রায় ৮০০ ভিক্ষু, ৪৫০ জন শ্রামণ বাস করেন বলে জানা গেছে। তখন সংঘরাজ নিকায়ের প্রয়াত সংঘরাজ শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির চট্টগ্রাম জেলার মির্জাপুর শান্তিধাম বিহারে অবস্থান করেন। বিনয়সম্মত চাল-চলন ও আচার আচরনের জন্য তিনি সমগ্র বৌদ্ধ সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি একজন সুসাহিত্যিকও বটে। ১৯৯৯ ইং মিয়ানমার সরকার কর্তৃক 'অগ্গমহাসদ্ধর্মজ্যোতিকাধবজ' এ দুর্লভ উপাধিতে ভূষিত হয়ে বাংলাদেশের বৌদ্ধদের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করেন। এ ব্যাপারে মিয়ানমার সরকারের সাথে সার্বিক যোগাযোগ করেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত বুদ্ধচর্চা বিষয়ক ম্যাগাজিন 'সৌগত'- এর সম্পাদক ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়। উল্লেখ্য যে, মহামান্য সংঘরাজ শীলালংকার মহাথেরোও অনুরূপভাবে তাঁর বৌদ্ধ ধর্মে অগাধ পান্ডিত্যের জন্য মিয়ানমার থেকে 'অগ্গমহাপণ্ডিত' দুর্লভ উপাধি লাভ করেছিলেন।

আমরা আগেই বলেছি, 'হাঞ্জারঘোনা' নামক স্থানে সারমেধ মহাস্থবিরের পৌরহিত্যে যে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল সেই পূত-পবিত্র অনুষ্ঠান থেকে কয়েকজন তান্ত্রিক রাউলী পুরোহিত নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। তাঁরা হলেন রামদাস মহাস্থবির, রাধাচরণ মহাস্থবির ও তিতনদাস মহাস্থবির। সারমেধ মহাস্থবিরের নিকট থেকে উপসম্পদা বা দীক্ষা না নেওয়ার ফলে তাঁরা রয়ে গেলেন তান্ত্রিক রাউলী পুরোহিত এবং তাদের অনুসারীরা হল তান্ত্রিক

অর্থাৎ বিকৃত বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাগুরুর গুরুত্ব অপরিসীম। কিছুদিন পূর্বেও বড়ুয়া সমাজে 'রাধু মাথের দল', 'দাস্যা মাথের দল' ও 'তিতন মাথের দল' এর অস্তিত্ব ছিল। অতি সম্প্রতি এই তিনটি উপদল মিলে গঠিত হয়েছে 'মহাস্থবির সংঘ' নামে একটি সংঘ। পরলোকগত শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো ছিলেন উক্ত সংঘের প্রধান। ঢাকার কমলাপুর ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারেও পূর্বগুজরার (নোয়াপাড়া) অগ্রসর বৌদ্ধ বিহারে তাঁদের কয়েকজন অনুসারী আছেন বলে জানা গেছে।

থেরবাদী বৌদ্ধ দেশের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে কেউ কেউ থেরবাদী বিনয় সম্মত আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেও তাদের দীক্ষা বিনয়সম্মত নয় এবং অনেকেই দাবী, তাদের পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ ব্যাতিত ভিক্ষু বলে পরিচয় দেয়া দোষনীয়। দুইটি নিকায়ের ভিক্ষুমণ্ডলী এক সঙ্গে বিনয়কর্ম সম্পাদন, পংতিভোজন এবং একই ছাদের নীচে বসবাস থেকে সম্পর্ণরূপে বিরত থাকেন। বৌদ্ধ গৃহীদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, দুই নিকায়ের গৃহীরা এক সঙ্গে ধর্মকর্ম ও সামাজিক বিবাহ বন্ধন করতে দেখা যায়।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে চারটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, ১. সারমেধ মহাস্থবির কর্তৃক 'সংঘরাজ নিকায়' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজে কোন থেরবাদী ভিক্ষু সংঘের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইতিহাসে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ২. একথা অনস্বীকার্য যে আরাকান একটি থেরবাদী বৌদ্ধ দেশ, অতএব সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের উপসম্পদা ও আরকানী ভিক্ষুসঙ্ঘের পরিশুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। ৩. হাঞ্চারঘোনায় যে ভিক্ষুসীমা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল তা আরাকানী ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক পরিশুদ্ধ করা হয়। ৪. সংঘরাজ ভিক্ষুসংঘ আরারকানী, বর্মী, শ্রীলংকা ও অন্যান্য থেরবাদী ভিক্ষু সংঘের মত বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকারী। বলাবাহুল্য, সারমেধ মহাস্থবির বাংলাদেশে বৌদ্ধ নব জাগরণের অগ্রদূত এতে কোন সন্দেহ নেই।

------০------

মায়ানমারে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ঃ ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা

ডঃ স্বপ্না ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)

(১)

মায়ানমারে বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গরূপে একটি অনুসন্ধানকৃত এলাকা। সাম্প্রতিক বছরসমূহে এ বিষয়টি সমগ্রবিশ্বের পণ্ডিতদের কাছ থেকে এক নবতর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সর্বাধুনিক ঝোঁক প্রদর্শন করে ইহার 'দ্বৈতভাব-রশ্মি ঐতিহ্য'- এর দিকে প্রত্যাবর্তন, যাতে ভারত তার বৌদ্ধ উত্তরাধিকার নিয়ে বৌদ্ধ বার্মার সাথে নিবিড়তমভাবে দাঁড়িয়েছিল। পণ্ডিত গবেষকগণ যাঁরা মায়ানমার-এর বৌদ্ধধর্ম নিয়ে কাজ করছেন তাঁরা গর্ডন লিউসকেও পুনরাবিষ্কার করছেন, যাঁর লেখা 'প্রাচীন বার্মা প্রাক্ প্যাগান' বইটি যা সকল উৎসাহী ব্যক্তি যাঁরা ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মায়ানমারের ধর্মীয় জীবন নিয়ে গবেষণা করেন তাঁদের কাছে ইহা অফুরন্ত প্রেরণার উৎসরূপে বিরাজ করে। মায়ানমারের ৫ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হচ্ছে বৌদ্ধ। তাদের অধিকাংশই হলেন বর্মন যারা প্রায় অষ্টম শতক ও পরবর্তী সময়ে তিব্বত ও দক্ষিণ চীনের ভূখণ্ড থেকে আপার বার্মার সমতল ভূমিতে আসতে শুরু করে। আপার বার্মার শানজাতি, লোয়ার বার্মার মোনজাতি (তালাইং) ও পশ্চিম মায়ানমার আরকানীরা (রাখাইন) ও কয়েক শতাব্দীর বেশী সময় ধরে বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করে আসছেন। বার্মীজ জনগণের কাছে ভারতবর্ষ ও বৌদ্ধধর্ম প্রায় সমার্থক শব্দ। মায়ানমারের সাধারণ জনগণের নিকট বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দু ধর্ম একটি ধর্মরূপে উপলব্ধ হয়। মায়ানমারের সাধারণ জনগণ অপরিহার্যভাবে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের পুরোহিত ও ভিক্ষুদের প্রকৃত অবস্থা নিয়ে বিরক্ত হন না, যা তাঁদের দেশে বর্তমানে আছে, ভারতে তা নাই। তাদের সবচেয়ে অন্তরস্পর্শ করে যে, তাদের ধর্মের উৎপত্তিস্থান হচ্ছে ভারত। যখন আমি মায়ানমার পরিদর্শন করি, আমি মায়ানমারের জনগণের ভারতের সাথে সাংস্কৃতিক বন্ধনের গভীর মনোভাব দেখে অভিভূত হয়ে যাই।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ সময়কাল হচ্ছে একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক। ইহা ছিল সেই সময় যখন জাভা, কম্বোডিয়ার আঙ্করে, বার্মার পাগানে ও থাইল্যাণ্ডের সুখোথাইয়ে আড়ম্বর ও উন্নতিতে শ্রী বিজয় সাধিত হয়েছিল। কেবল রাজকীয় পরিবারসমূহ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা আসেনি, কিন্তু দেশের বণিকদের ও পৌর সম্ভ্রান্তের উচ্চতর স্তর থেকেও পৃষ্ঠপোষকতা এসেছিল।

মনোযোগ নিয়ে দেখি, দ্বাদশ শতকেই ভারতের বৃহৎ অংশে বৌদ্ধধর্ম ইতিমধ্যেই অস্বীকৃত হয়েছে, যখন বৌদ্ধ-বার্মা ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্কে স্থির রয়ে গেল, এমনকি তারপরেও সম্পর্ক অটুট রয়ে গেল। ইহা আমাদের তথাকথিত ভারতে ক্ষীয়মান বৌদ্ধধর্মের শক্তি সম্বন্ধে পুনঃঅনুসন্ধান ক্রমশ অগ্রসরমান করে বিশেষত পূর্বাঞ্চলীয় ভারত। হয়ত কোন ব্যক্তিকে 'ক্ষীয়মানতা', 'পবিত্রতা' ইত্যাদি সামাজিক ধারণা নিয়ে কাজ করার প্রবণতাকে কাটিয়ে উঠতে হবে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের বিশাল পদ্ধতিকে বুঝতে গিয়ে। ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে ধর্মীয় আদান প্রদান কোন স্থায়ী অন্ত দেখা দেয়নি কিংবা কোন অস্থায়ী বিরামও দেখা দেয়নি। সকল দেশসমূহের মধ্যে মায়ানমার হচ্ছে অদ্বিতীয় যা বৌদ্ধধর্মকে জীবন-শৈলীরূপে গ্রহণ করেছিল এবং প্রাত্যাহিক পার্থিব জীবন থেকে পৃথক আচরিত 'ধর্ম' রূপে না গ্রহণ করে। এর মূল এত গভীর ও এত অকৃত্রিম যে- যদিও মনে হয়, ইহা আপাতবিরোধি সত্য। কিন্তু ইহা সত্য যে, এই অকৃত্রিমতার ফলে বার্মিজ বৌদ্ধধর্ম গোঁড়ামিহীনতা এবং প্রায়ই 'বিরোধ-বৌদ্ধ' আদর্শ যা বৌদ্ধধর্মের বৃহত্তর ভাঁজের মধ্যে অন্তঃস্থ করতে পেরেছিল। এইসব অধিকাংশ অনুশীলন ভারত থেকে এসেছিল এবং বার্মিজদের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। মায়ানমারে বৌদ্ধধর্ম কোনকিছু নাকচ করে না। ইহা প্রত্যেক রকমারী বিশ্বাসকে গ্রহণ করার ফলে বৌদ্ধধর্ম এক নতুন আকার লাভ করে। অতএব মায়ানমারে কোন ব্যক্তি পালি নৈষ্ঠিকতার সমান্তরাল অবস্থান ও নাট পূজা প্রত্যক্ষ করেন কিংবা দৃষ্টান্তস্বরূপ কঠোর সন্ন্যাসনীতি ও শিথিল অনুশীলন বা বিনয়ধর ভিক্ষুসংঘ অরণ্যবাসী ভিক্ষু সংঘ প্রত্যক্ষ করেন। সকল নিয়মনীতি বিনা সংঘাতে পাশাপাশি অবস্থিত। বহু সংখ্যক হিন্দুদের দেবীগণ শতাব্দীকালের অধিক সময় ধরে বার্মিজ জনগণের ধর্মীয় জীবনে জায়গা করে নিয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু একটি প্রসিদ্ধ ভূমিকা নিয়েছেন। বিষ্ণুর নিজস্ব মন্দির ছিল। পাগানের নাত-লাউং মন্দিরে বিষ্ণুর বহুবিধ অবতার মূর্তি রয়েছে। এইভাবে ইতিহাসের পথে ভারতে স্বাভাবিকভাবে মায়ানমারের জনগণের মনের রাজ্যে প্রবেশ করে থাকে যে, বৌদ্ধকে বার্মিজ বলা খুবই কঠিন, তার দৃষ্টান্ত এই "আমি এই বিশেষ অনুশীলন গ্রহণ করি কেননা ইহা বার্মিজ এবং আমি ইহা প্রত্যাখ্যান করি যেহেতু ইহা ভারতীয় উৎসমূলের বিষয়।" এমনকি আজকের বিশাল অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার দিনে, বৌদ্ধদের মূলমন্ত্র- নৈতিকতা ও সত্যের প্রতি অঙ্গীকার- মায়ানমারের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় বিশেষত নগর ও জনপদের বাইরে সাধারণ লোকের মধ্যে। মায়ানমার বৌদ্ধধর্মের

এই অনুপমশৈলী ইহার অত্যুজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সুপ্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চারুকলা ও স্থাপত্যশিল্পে। মায়ানমারের সর্বত্র শতশত মন্দির ও বুদ্ধবিহার সমূহ বেইকথানো, হলিন, শ্রীক্ষেত্র থাটন, পাগান, তাগাউং, পেগু, দাগন, ম্রোহং, আভা, সাগাইং, মিংগুন, অমরপুর ও মান্দালয় এর মত বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত হয়ে ভারতীয় প্রভাবের নীরব সাক্ষী হয়েছে। এইসব সূচনামূলক বক্তব্যের সহিত এবার আমি মূল আলোচনা "মায়ানমারের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ঃ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ শুরু করব।

(২)

যদিও পাগান রাজন্যবর্গকে (১০৪৪-১২৮৭) বিবেচনা করা হয় বৌদ্ধধর্মের নিয়মতান্ত্রিক উন্নতকারীরূপে, বৌদ্ধধর্ম বহুপূর্বেই সুবর্ণরাজ্যের মাটি স্পর্শ করেছিল। ইহা হয়েছিল ভারত উপমহাদেশের জনগণের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে; যাতে করে নিম্ন বার্মার লোকেরা বৌদ্ধধর্ম শিক্ষালাভ করেছিল। আরাকানের প্রাচীনতম রাজবংশের একটি খৃস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে ধন্যবতী শাসন করেছিলেন। প্রাচীন আরাকানী ঘটনাপঞ্জী অনুসারে, ৫৮০ খৃস্টপূর্ব থেকে ৩২৬ খৃস্টাব্দ সময়কালে বৌদ্ধধর্ম তৃতীয় ধন্যবতী রাজ্যে উন্নতিলাভ করেছিল। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার পাঁচশত শিষ্যসহ রাখাইন রাজ্য (আরাকান) পরিদর্শন করেছিলেন। পরবর্তীকালে বেসালী থেকে চন্দ্ররাজবংশ (ভারতে একইস্থানের নামানুসারে নির্মিত) ৩২৭ খৃস্টাব্দ থেকে ৭৭৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান শাসন করেছিল, তাঁরা থেরবাদ নিকায়ের বৌদ্ধ মতবাদ অবলম্বন করেন, অতিরিক্তভাবে তান্ত্রিক নিয়মের পূজাপদ্ধতি প্রচলন করেন। বেসালীর চন্দ্ররাজগণ বৃহৎ আকার মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ করেন; ফলে বৃহদাকার বুদ্ধমূর্তি ছাড়াও বিষ্ণু, শিব ও বোধিসত্ত্বমূর্তি বেসালীর ধ্বংসস্তুপে প্রাপ্ত হয়েছিল।

মোনরা কিংবা তালাইংরা (অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা উপকূল) ছিলেন বর্মনদের সাংস্কৃতিক পূর্বপুরুষ, কিন্তু এরা পাইউসদের জয় করেছিলেন, যদিও ইহা অনুমান করা সঠিক এইসব তিনটি-পাইউস, মোনস এবং বর্মনরা বৌদ্ধ ধর্মে তাদের বিশ্বাসের গুণে একে অন্যের সাথে মিশে গিয়েছিলেন, এবং দেশের নানাবিধ অংশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। আমি পূর্বে যেমন বর্ণনা করেছি, নিয়মিত ভাবে ইহা সঠিক যে, বর্মণদের আবির্ভাবের সাথে সাথে আধুনিক মায়ানমারের পাগান সভ্যতাই গৃহীত হয়েছে, ইহা দেশের ধর্মীয় জীবনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সেমিনারের প্রসঙ্গক্রমে যাতে এই পত্র উপস্থাপিত হয়েছিল, ইহা লক্ষ্য করা খুবই

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, এই পালি প্রাচীন মতবাদ ঐতিহ্যের সহিত অনুরূপভাবে মহাযান (এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে তান্ত্রিক ঐতিহ্য যা প্রাচীনকালের ঐতিহ্য যুগপৎ সমানভাবে অবস্থিত ছিল। কারণটা স্পষ্ট, পাগানে এক বৃহৎ ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ও অতীত পাগান দিনসমূহের অবস্থিতি। তাদের অধিকাংশই বাণিজ্য সম্পর্কে আগমন। তারা কেবল এইরূপ পেশায় আশ্রয় নেয়নি কিন্তু এতে বার্মিজ জনগণের মধ্যে অনুসারীও দেখা গিয়েছিল।

কদাচিৎ বলা প্রয়োজন, মাইসেল অংখোইনও তিনমান ফ্রা-এর ন্যায় বিখ্যাত পণ্ডিতদের নাম এবং অন্যান্য আপ্যায়কগণ স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করেছেন মোন জাতির মৌলিক উপাদান পাগানে সুস্পষ্টরূপে উপস্থিত। অন্যদিকে, পাইউস জাতি যারা মোন জাতির পূর্বপুরুষ তারা তাদের উত্তরাধিকারীদের সাথে মিশে গেল। বাস্তবে 'পাগান' শব্দটি 'পাইউ' এবং 'গ্রাম' শব্দের সহিত সংযুক্ত যার অর্থ হল 'পাইউসদের গ্রাম'। রাজা কায়ানজিথের পাগান সম্বন্ধে, এম, অংথোইন বলেন; বলা যায়, সেই সময়ে পাগান ছিল, এক নৃতাত্ত্বিক বর্মন সভ্যতা যা বলতে গেলে কেবল শাসক শ্রেণীর; 'মোন'রূপে ইহাকে বললে রাজনৈতিক ও সামরিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা হয়, 'পাইউ' রূপে বললে সেই ঐতিহ্যের দীর্ঘতার অতিমূল্যায়ন হয়। ইহাকে 'থেরবাদী' বললে ধর্মীয় সামাজিক অবস্থাকে অতি সরলীকরণ বা অতি সোজা করে বলা হয়। এইসব উপাদানসমূহ একাদশ ও দ্বাদশ শতকে পাগানকে নির্মাণ করে। আপার, মধ্য ও লোয়ার বার্মা বৌদ্ধ ধর্ম ও সভ্যতাকে প্রত্যক্ষ করেছিল, যেখানে প্রাচীন থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে, মহাযান মতবাদ ও ধর্মবিশ্বাসকে পাশাপাশি থাকার উপযোগী করেছিল। সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ভূমিকা ভারতীয় বোধিসত্ত্ব আদর্শ চিন্তা ও আনুষ্ঠানিকতা বোধিসত্ত্বাদি প্রভৃতি পূজার সাথে জড়িত যা আরাকান রাজ্য দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র দেশের অভ্যন্তরভাগে স্থানান্তরিত হল, (মধ্য ও আপার বার্মা) বোধিসত্ত্বের পূজার সাথে জড়িত হয়েছিল। আরাকান পূর্বভারত ও বার্মার কেন্দ্রভূমির মধ্যে এক আদর্শ সেতুবন্ধনরূপে কাজ করে।

পাগানের রাজন্যবর্গ সক্রিয়ভাবে বাংলা-বিহার অঞ্চলের বৌদ্ধরাজ্যের সাথে সম্পর্ক জোরদার করেন। বঙ্গে পৌঁছুতে কোন ব্যক্তিকে আরাকান ও পট্টিকেরা অতিক্রম করতে হত। এই সমগ্র বৌদ্ধ রাস্তাটি সক্রিয়ভাবে রাজকীয়ভবন কর্তৃক ব্যবহৃত হত অনুরূপভাবে সাধারণ জনগণও ব্যবহার করত। পাল-সেন যুগের চারুকলা ও স্থাপত্যশিল্পবিদ্যা যা পাগানে প্রচলিত তার প্রভাব জি, লিউস, এন, আর, রায় ও এস, কে, সরস্বতীর ন্যায় পণ্ডিতবর্গ

কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এই প্রভাব আরাকান ও পূর্ববঙ্গের মাধ্যমে প্রবেশ করেছিল। পাগান-এর আনন্দবিহার বর্তমানকালের বাংলাদেশের পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার- এর আদলে নির্মিত। পাগান ও বাংলার মধ্যে এক প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল, কারণ দুই জায়গার মধ্যবর্তী অঞ্চলটি মহাযান তান্ত্রিক মতবাদের প্রভাবিত বৌদ্ধধর্ম দ্বারা উন্নত হয়েছিল। জনস্টন-এর নাম প্রায় স্মরণ করা হত, যিনি 'সংস্কৃত সিথাউং প্যাগোডা শিলালিপি সম্পাদনা করেছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি প্রাচীন থেরবাদ ঐতিহ্যের ভূমিতে সংস্কৃত বৌদ্ধধর্মের অবস্থান দেখালেন। এই বাংলা-আরাকান-বার্মা বন্ধনের অভ্যন্তরে কিয়নজিথকে এক বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকারীরূপে মনে হত।

এই কিংবদন্তি প্রচলিত যে, পাগানের রাজা অনারথ (১০৪৪-১০৭৭ খৃস্টাব্দ) একজন মোন ভিক্ষু শিন অরহন দ্বারা থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়েছিলেন ও ইহা প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু, পবিত্র ধর্মগ্রন্থের কোনো সংখ্যায় বা কপিতে তাঁর ধর্মগ্রহণের দৃষ্টান্ত নাই। মোন রাজা মনুহা ধর্মগ্রন্থসমূহ প্রদান করতে অস্বীকার করেন। এই "বৌদ্ধধর্মীয় কারণে" একটি যুদ্ধ যাত্রা হল এবং রাজা অনারথ কর্তৃক ১০৫৭ খৃস্টাব্দে থাটন বিজিত হল। পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ পাগানে আনীত হল, তার সাথে প্রযুক্তিবিদ ও অন্যান্য পেশাদারীদের আনা হল। রাজা মনুহাকে বন্দী করা হল। মায়ানমারে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের এইরূপ নাটকীয় উদ্বোধন- এর পিছনে অবশ্যই রণচাতুর্যমূলক ভূমিকাও রয়েছে। রাজা অনারথ এই সংযোজনের মাধ্যমে নিম্ন বার্মার উপকূলীয় অঞ্চলে পৌঁছলেন। বার্মা শ্রীলংকার নিকটতর হল, পরবর্তী সময়ে যার ফলে বৌদ্ধ বিশ্ব যুক্তিযুক্তভাবে বার্মার অভ্যন্তরে উন্নয়নের গতিধারা প্রভাবিত করেছিল।

১২৮৭ সালের কুবলাই খানের সেনাবাহিনী কর্তৃক পাগান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পাগানের পরবর্তী দৃশ্যপট ছিল নিম্নরূপ; ঊর্ধ্ব বার্মার শান জাতি ও বর্তমান থাইল্যাণ্ড রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করেছিল এবং তাদের বৌদ্ধধর্মীয় ঐতিহ্যের কারণে তারা বিস্তৃতরূপে গৃহীত হয়েছিল। তারা হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করলেন, যখন মোনজাতি আঞ্চলিকভাবে পূর্বের ন্যায় ক্ষমতাশালী রইল। পেগু (হংসবতী) ছিল তাদের রাজধানী। তাদের রাজা ধম্মচেতি (১৪৭২-৯২) এক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের সূচনা করলেন। এই সংস্কার অতি প্রয়োজনীয় ছিল যেহেতু সংঘ 'নীতিহীন' হয়েছিল ও ভিক্ষুসংঘ পার্থিব বা জাগতিক আকাঙ্খার প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়েছিল। এই বিশেষ রাজার নাম 'ধম্মচেতি' যিনি বিখ্যাত কল্যাণী শিলালিপির জন্য অতি

সুপরিচিত। আমি বিস্তৃতভাবে গল্পটা করি; রাজা ধম্মচেতি সাগর অতিক্রম করে ২২জন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে শ্রীলংকা পাঠালেন। এই ২২জন ভিক্ষুর মধ্যে ১জন ছিলেন 'তামলিথি'র (তাম্রলিপ্তি) বঙ্গের তাম্রলিপ্তি। তাঁহার নাম সিবলী থের। ১৪৭৬ সালে তাঁহারা কেলানিগঙ্গা (কল্যাণীগঙ্গা) নদীতে যা শ্রীলংকার পশ্চিম উপকূলে, পুনঃ উপসম্পদা প্রাপ্ত হন। যখন তাঁরা পেগু ফিরলেন, তাঁদের পুনঃউপসম্পদা দীক্ষানুষ্ঠানের মাধ্যমে যেতে হয়েছিল। বিখ্যাত কল্যাণী শিলালিপি, যা এখনও পেগুতে দৃষ্ট হয়, তা মায়ানমার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। কল্যাণীসীমা নামে একটি সীমাঘর বা ভবন এই উপসম্পদানুষ্ঠানের জন্য রাজা নির্মাণ করেন। শ্রীলংকায় ভিক্ষুসংঘ পাঠানোর সম্পূর্ণ কাজে, তাঁদের ফিরিয়ে আনা ও তাঁদের ভিক্ষু সংঘে উপস্থাপিত করা প্রতীকিভাবে নৈতিক অনিন্দনীয়তার ধারণার গুরুত্বকে নির্দেশ করে থাকে। যদিও পেগু বর্মনদের দ্বারা ১৫১৩ সালে বিজিত ও পুনরায় ১৫৫১ সালে বিজিত হয়েছিল, কল্যাণী উপসম্পাদানুষ্ঠান ঐতিহ্যের নিহিতার্থ এতই তীক্ষ্ণ মর্মভেদী যে, অদ্যাবধি মায়ানমারের ভিক্ষু সংঘ কল্যাণীসীমা ঐতিহ্য অনুসরণ করে লক্ষ্য পথে পৌঁছে থাকেন। সুস্পষ্টভাবে রাজা ধম্মচেতি বিশ্বাস করতেন যে, সিংহলী থেরবাদ ধর্মমতে বিশ্বাস বার্মার পক্ষে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

অষ্টাদশ শতকে বার্মায় বৌদ্ধধর্মের এক শক্তিশালী পুনর্জাগরণ পরিলক্ষিত হয়, যখন রাজা আলাউংফয়া/আলংফয়া ক্ষমতায় আসেন। নিবন্ধের ঠিক শুরুতে সাবজনীন সম্রাটের ধারণাসমূহ আমি উল্লেখ করেছি এবং অনাগত বুদ্ধের ধারণা সমূহ উল্লেখ করেছি যা বার্মায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। বার্মায় এই ধারণাটা অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত লেগে আছে। বাস্তবিক, 'আলাং-ফয়া' শব্দের অর্থ 'ভ্রূণ-বুদ্ধ' বা 'বুদ্ধাঙ্কুর'। এই রাজবংশ 'কোনবাউং' রাজবংশ নামেও পরিচিত, যা বার্মাকে সংযুক্ত করার জন্য খ্যাতিলাভের যোগ্য, যা ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। ঐ বছরেই সর্বশেষ 'ইঙ্গ-বার্মা' যুদ্ধ হয়েছিল, এবং তার ফলে বৃটিশরা রাজ্যটিকে তাদের ভারতীয় সাম্রাজ্যভূক্ত করে। এক সুদীর্ঘকাল জনগণ বার্মার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাজদের একজন যিনি যে কোন মূল্যে বৌদ্ধধর্মের উন্নতিসাধন করেন, এবং তাঁর প্রধান কর্মসূচী রূপে হিন্দু-বৌদ্ধ ভারতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কাজ করেন যাহা প্রত্যক্ষ করল। এই রাজা ছিলেন বোদাফয়া (১৭৮১-১৮১৯) তাঁর সময়কালের সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় ঘটনা ছিল ১৭৮৪ সালে আরাকান রাজ্যের সংযুক্তি। আরাকান থেরবাদ ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন অবস্থান হওয়ায় ইহা রাজনৈতিক ও

ধর্মীয় আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। আরাকানসংলগ্ন নিম্ন বঙ্গ থেকে যে ইসলামের বিস্তৃতি শুরু হয়েছিল তা বাংলায় বৃটিশ অবস্থানের ন্যায় অবশ্যই পরিণামের শুভকারণ হয়ে থাকে। নূতন রাজনৈতিক শক্তি ও ধর্মীয় শক্তিদ্বয় হচ্ছে- প্রথমে ইসলাম এবং পরে বাংলায় বৃটিশের আগমন- অবশ্যই রাজা বোদাফয়ার অন্তরকে যথাযথভাবে নাড়া দিল। অতএব, আরাকানের বিখ্যাত মহামুণি মূর্তি রাজা বোদাফয়া কর্তৃক তাঁহার রাজধানী মান্দালয়ে আনীত হল। এক ব্যক্তির সাক্ষ্যে জানা যায়, আরাকানে গোঁড়া বৌদ্ধ মতবাদের প্রতীকি আয়তন যা আরাকানে দীর্ঘদিন ধরে চলছে- যেমন মহামুণি বুদ্ধমূর্তির অধিকারে থাকায় ইহা দেশ শাসনের বৈধতা বৃদ্ধি করবে আর কি! ভারতীয় উপমহাদেশের পক্ষে এই মহামুণি বুদ্ধমূর্তি বার্মার হৃদয়রাজ্যে স্থানান্তরের কাজ চট্টগ্রামবাসী বৌদ্ধদের বিশেষতঃ বড়ুয়া ও চাক্‌মাদের নিকট আশ্চর্য শক্তি প্রদান করে বা প্রচুর উন্নতি সাধন করে। বিখ্যাত পালি ভাষার প্রফেসর সুকোমল চৌধুরী যথার্থভাবে বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার এইসব বৌদ্ধগণ বার্মায় তাঁদের ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করেন। উদাহরণস্বরূপ, চাকমা রাণী কালিন্দীর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন আরাকান ও বার্মাদেশ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

রাজা বোদাফয়া 'মৈত্রেয় বুদ্ধ' রূপে নিজেকে প্রদর্শন করতেন। বোদায়ার বৌদ্ধধর্মকে পুনরুজ্জীবন দানের চেষ্টা সত্ত্বেও আরাকানের বৌদ্ধরাজ্য বর্মণরাজার অধীনে দীর্ঘদিন টিকতে পারে নি। ১৮২৪-২৬ সালে ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধের মাধ্যমে আরাকান যুক্ত হয়েছিল। উপর (আপার) বার্মা বর্মণ রাজ্যের অধীনে ছিল। পরবর্তীতে, এমনকি, আরেক রাজা অনারথ বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি করেন। যেইভাবে রাজা বোদাফয়া কিংবা তাঁর পূর্ববর্তী রাজা উন্নতি করেছিলেন। সেই রাজার নাম মিন্‌ডন্ মিন্ (১৮৫৩-১৮৭৮) যিনি বার্মাকে শক্ত হাতে শাসন করেছিলেন কিন্তু দেশকে পাশ্চাত্য ক্ষমতার কাছে খুলে দিয়েছেন যেন তাঁর রাজ্যে বৃটিশরাজের প্রবেশের বৃদ্ধির বাধাদান ও সমতা বিধান করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজা মিন্‌ডনের রাজত্বকাল বৌদ্ধধর্মের পক্ষে সুবুদ্ধিযুক্ত অনুসন্ধানের মিলন হল যা পাশ্চাত্যবাসীর মন থেকে একটি আদর্শ বৌদ্ধদেশ রূপে নির্গত হয়ে ভারতের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হল। ইহা বৃটিশদের বার্মার সাথে তাঁদের ভারত সাম্রাজ্যের (১৮৮৬) সহিত সংযুক্তির কারণে নয়, কিন্তু ইহার কারণ ভারত নিজেই বিবেচিত হত বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি ও উন্নতির দেশ হিসেবে।

১৮৭১ সালে বার্মায় পঞ্চম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি আহ্বান করার জন্য রাজা মিন্‌ডনমিনকে স্মরণ করা হয়। যেখানে এশিয়া থেকে হাজার হাজার বৌদ্ধগণ সম্মিলিত হয়েছিলেন। তাঁরই মনে বৌদ্ধ কল্যাণকামী রাষ্ট্র গড়ার আদর্শ জুড়ে বসেছিল। রাজ বোদাফয়ার ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ রাজত্ব (১৭৫৩-১৭৭৮) বার্মার রাজ্যের বৌদ্ধিক পরিচিতির স্তম্ভকে কেবল শক্তিশালী করেনি, উপরন্তু বৃটিশ ভারতের সাথে বার্মা রাজ্যে সম্পর্ক বিষয়ে এক নতুন মাত্রা যোগ করে যেখানে বৌদ্ধধর্মকে বন্ধন শক্তি রূপে দেখা গিয়েছিল। ভারতীয় দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে, মিন্‌ডন্‌মিনের রাজত্ব তাঁহার দুই জন পূর্ব পুরুষদের ন্যায় (পাগানে কিয়ানজিত্থা ও আলায়াংফয়া রাজবংশের বোদাফয়া)। ভারতের সহিত বার্মার সম্পর্ক প্রযুক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। রাজা মিনডনমিন এশিয়ার বিভিন্ন অংশ থেকে আসা বৌদ্ধ তীর্থ যাত্রীদের জন্য ও তাঁর নিজ দেশ থেকে আসা তীর্থবাসীদের জন্য বুদ্ধগয়ায় একটি অতিথিনিবাস নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন। মিনডনমিনের উত্তরাধিকারী থিবাউ, যিনি ১৯৭৮ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত শাসন করেন, সাম্রাজ্যবাসী প্রচন্ড আক্রমণ থেকে তাঁর সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে পারেন নি; সর্বশেষ যোদ্ধা হল ও বার্মা তৃতীয় বারও শেষবারের মতো বৃটিশের অন্তর্ভূক্ত হল। রাজতন্ত্র লোপ করা হল এবং থিবাউকে ভারতে নির্বাসিত করার হল, বোম্বাই-এর নিকটে রত্নগিরির দূরবর্তী এককোনে, ঠিক যেভাবে ভারতের সর্বশেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে রেংগুন (ইয়াংগুন)- এর দূরবর্তী অঞ্চলে নির্বাসন দেওয়া হল। বার্মায় বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘের জন্য এই পরাজয় হল এক বড় মুষ্ঠাঘাত, যেহেতু ঐতিহ্যগত রাজতন্ত্র হচ্ছে ভিক্ষুসংঘের উন্নতিকারক, ইহার ত্রাণকর্তা ও রক্ষক।

অতএব, রাজনৈতিক পরাজয় আবির্ভূত হল এক ধর্মীয় শূণ্যতারূপে, যে শূণ্যতা রয়ে গেল দেশটি ১৯৪৮ সালে ইহার স্বাধীনতা পুনরার্জন করা পর্যন্ত। মায়ানমারের জাতীয় আন্দোলন হচ্ছে এশিয়ার ইতিহাসে এক দীর্ঘ অধ্যায়, যা বর্তমান প্রবন্ধের সীমার বাইরে থাকে। এমনকি তখন, কোন ব্যক্তির উপেক্ষা করা উচিত নয় এই সত্য ঘটনা যে, 'ইয়ং মেন্স বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশন (YMBA) ভারতের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিল। ঘটনা দ্বারা বাস্তবায়িত হতে পারে যে, রেঙ্গুনে ১৯০৬ সালে ইহার প্রতিষ্ঠার পূর্বে আরাকানে ইহার একটি শাখা হয়েছিল ১৯০৪ সালে। (YMBA)- এর উত্তরাধিকারী, বার্মা সমিতির সাধারণ পরিষদ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এক গণআন্দোলন গঠন করার জন্য রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। সংঘ- এর প্রতিরূপ 'জেনারেল

কাউন্সিল অব সংঘ সম্মোগ্নি' (GCSS) অনুরূপ GCBA ভারতের বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশন- এর সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখে ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর সহিত সম্পর্ক রাখে। আরাকান YMBA- এর পূর্বে আবির্ভাবের জায়গারূপে ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, ১৮৯২ সালে অনাগরিক ধর্মপাল কর্তৃক মহাবোধি আন্দোলন শুরু করার পর আরাকানে (আকিয়াব) ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন। এছাড়া কলিকাতা, বোধগয়া, রেঙ্গুন ও আকিয়াবে এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের জন্য মহাবোধি সোসাইটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসকল স্থানসমূহ ব্যক্তিগতভাবে অনাগরিক ধর্মপাল কর্তৃক পরিদর্শিত হয়। উ. উত্তম (১৮৯৪-১৯৩৯) ছিলেন সবচেয়ে কর্মঠ ভিক্ষু, যিনি পূর্বভারত, বিশেষতঃ বাংলার সাথে সর্বাগ্রে সংযোগ সাধন করেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর সাথেও যুক্ত ছিলেন ও ইহার নেতৃবৃন্দের সাথেও যুক্ত ছিলেন। ১৯২০-এর দশকে ও ১৯৩০-এর দশকে ভারতের বিভিন্ন অংশে বুদ্ধ ধর্মীয় ধ্বংসাবশেষ উৎখনন করা হয়। এতে বার্মিজ জনগণ এবং ভারতের জনগণের অন্তরে ভ্রাতৃত্ববোধ পরিব্যপ্ত হয়েছিল। বাংলা সেই সময়ে (১৯২০ ও ১৯৩০ সাল) তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে উভয় দেশের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনকে সম্মুখে আনতে এবং বৃটিশ বার্মা ও বৃটিশ ভারতের জনসাধারণকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে হিন্দু-বৌদ্ধ রেখা বরাবর মিলিত সংহতির মাধ্যমে। উনু. বার্মার প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাঁর দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাকে আগ্রহ না করে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি সাধন করেছিলেন। তিনি আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর একজন মহান বন্ধু ছিলেন এবং ভারতের জনগণেরও সর্বজনীন বন্ধু ছিলেন। তাঁর সময়কালীন যুগান্তর যুগসন্ধিক্ষণমূলক ঘটনা হচ্ছে ১৯৪৯ সালের বিনিময় আইন, ১৯৫০ পালি ইউনিভার্সিটি ধম্মাচারিয়া আইন এবং ১৯৫০ সালে 'দি বুদ্ধ শাসন কাউন্সিল আইন'। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বার্মার শাসন জেনারেল নে উইন ধর্মীয়ভাবে নিরপেক্ষভাবে আবির্ভূত হন। হয়ত মায়ানমার কখনও তার বৌদ্ধিক পরিচয় থেকে পরিবর্তিত হয়নি, কিংবা ভারতের জনগণের প্রতি বৌদ্ধধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ পরিবর্ধনের অবস্থান পরিবর্তন করেনি। এবং যখনই দেশের আপন পরিচিতির বিষয় জড়িত হয়, ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারের ন্যূনতম অংশগ্রহণ সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম বার্মার জনগণের শক্তির প্রধান উৎস হয়ে থাকে। এমনকি জেনারেল নে উইন শাসনকালেও।

(৩)

ঠিক শুরুতেই বলা হয়েছে তথা পর্যাপ্ত পরিমাণে জোড় দেওয়া হয়েছে যে মায়ানমার প্রত্নতত্ত্বই সবচেয়ে ভারতীয় প্রভাবের জীবন্ত স্বাক্ষী যা থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম, মহাযান বৌদ্ধধর্ম, ও ব্রাহ্মণ্যবাদের আকারে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান বছর সমূহ মায়ানমারের বিভিন্ন অংশে পাইউ অঞ্চল উৎখননের মাধ্যমে ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে প্রাক-পাগান আমলে সাংস্কৃতির আদান-প্রদানের নতুন তথ্য উৎপাদন করে। 'পাইউরা' ছিলেন সুপ্রাচীন তিব্বতী বর্মণ জনসাধারণ যা নিশ্চয় দাবী করতে পারে থেরবাদ ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের সমান্তরাল অবস্থানের তাঁদের অংশগ্রহণ। 'মৈত্রীয় বোধিসত্ত্ব' নবম শতাব্দীতে শ্রীক্ষেত্র শাসন আমলে শেষভাগে জনপ্রিয় হয়েছেন। 'পামেলা গৌতম' নামে এক বিখ্যাত চিত্রকলা ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষক, যিনি মায়ানমার বিশেষত আরাকানী চিত্রকলা ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত তিনি যুক্তি দেখান যে, নানাচার ও আক্রমণের মুখে পাইয়াসরা মেসিয়ানীক ধরনে ধর্মবিশ্বাসের ধারণার দিকে ঘুরে যান যা একটি অনাগত বুদ্ধের আবির্ভাব নির্দেশ করে। এরূপ পূজার জন্য উৎসাহ মোইরূপ গৌতম যুক্তি দেন তা বিহারে অবস্থিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশনারী কার্যাবলীর সহিত সংযুক্ত। বাইকথানো (বিষ্ণুনগর) পাইয়াসদের ধর্মস্থান বিষ্ণুর জনপ্রিয়তার সাক্ষীরূপে উচ্চবংশীয় সভ্য পাইউ জনগণের মধ্যে পঞ্চশতাব্দী ও পরবর্তীকালে পরিলক্ষিত হয়। নিঃসন্দেহে বাইকথানোর কাঠামোগত কার্য নাগার্জুনকোণ্ডার বৌদ্ধ নির্মাতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ঊর্ধ্বতন বার্মার সোয়েবার ১১ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত হালিন (কিংবা হালিংগি-মহান হালিন) যা পাইউ কর্মক্ষেত্রের আরেক বৈশিষ্টপূর্ণ কর্মক্ষেত্র অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, ইহা কযেক হাজার বছর পূর্বে এক আশ্রীত যুবরাজ যিনি ভারতের মহাসামন্তরাজের বংশধর, মজ্ঝিমদেশ (ভারত) এর উপকথা- শাসক ছিলেন তৎকর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। শ্রীক্ষেত্রের রাজবংশের একটি ছিল বর্মণগণ। এই সকল বর্মণরাজাগণ একাদশ ও দ্বাদশ শতকে পূর্ববঙ্গীয় বর্মণদের সাথে সম্পর্কিত কিনা এই বিষয়ে আমরা পূর্বাভাস করতে পারি। সর্বশেষে ইহা প্রমাণিত হয়েছে যে, আরাকানের চন্দ্ররাজগণ পূর্ববঙ্গের চন্দ্রদের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কিত।

শ্রীক্ষেত্র (থায়েখিওয়) বার্মার প্রাচীন পাইউ রাজধানী সমূহের একটি। ইহা প্রোমএর পাঁচ মাইল দক্ষিণে ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত এবং রেঙ্গুন এর প্রায় ১৮০ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। কিংবদন্তি আছে, এই নগরী শত্রু দ্বারা রাজা দত্তবং এর জন্য নির্মিত

হয়েছিল। দেবতাদের রাজা শক্র গবম্পতি, ঋষি, নাগ, গরুড়, চণ্ডী ও পরমেশ্বর এর সাহায্যে এই নগরী নির্মাণ করেন। কতকগুলি ভাস্কর্য আবিস্কৃত হয়েছে যা স্পষ্টভাবে মহাযানীদের। ১৯২৬ সালে একটি বৃহৎ পাথরের পুরো চেপ্টা খণ্ড অনেক টুকরায় ভাঙ্গা পাওয়া গিয়াছে যাতে একটি টুকরা কুলঙ্গিতে বোধিসত্ত্বের ত্রাণ মুদ্রায় উপবেশন অবস্থায় আছে। সেই ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধধর্মের সহিত একত্রে উন্নতি করেছিল তা বৃহৎ সংখ্যক ভাস্কর দ্বারা সত্যায়িত হয়েছে যা প্রধানত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধিকারভূক্ত। সর্বাপেক্ষা আগে বার্মায় শিলালেখসমূহ যা দেখা গিয়েছে তা শ্রীক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে। ১৯২৬ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মূল পালিশাস্ত্র ধারণকারী দুইটি স্বর্ণপত্র দেখতে পান, বর্ণমালা পল্লব লিপি বরে নির্ণীত হয়, যা কাঞ্জিভরমে ব্যবহার করা হত। মূল শাস্ত্রে বৌদ্ধ সূত্রসমূহ আছে ও ভগবান বুদ্ধের প্রতি অশান্তি আরোপিত যা পালি আগমশাস্ত্র 'অঙ্গুত্তরনিকায়ে' দেখা গিয়েছে। পালি বৌদ্ধ ধর্মের অপর সাক্ষী হচ্ছে একটা পাণ্ডুলিপি যাতে ২২টি স্বর্ণপত্রের উপর পালি শাস্ত্র খোদিত আছে, যা পঞ্চম শতকের বলে নির্ণীত হয়। এই শিলালিপিতে অভিধম্ম ও বিনয় পিটকের উদ্ধৃত বাক্য সমূহ খোদিত হয়েছে।

খৃস্টীয় বর্ষের পূর্ব শতাব্দী সমূহে মোনজাতিরা সিত্তাং ও সলউইন নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন অঞ্চলটি রামঞ্ঞদেশের মোনরাজ্য নামে পরিচিত। থাটন (সুদ্ধম্ম) এই রাজ্যের আসনটি সুবর্ণভূমি বা সোনালীদেশ নামেও পরিচিত ছিল। নামের তালিকাটি বঙ্গোপসাগরের চারিদিকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া দক্ষিণ এশিয়ার সমগ্র অঞ্চলকে নির্দেশ করে। এমনকি আমরা নিজেরা পূর্বাভাস দিতে পারি যে সোনালী বাংলা (সোনার বাংলা) এর ধারণাটি সুবর্ণভূমি-এর সাথে সংযুক্ত। থাটন বন্দর হিসেবে সম্পূর্ণ সক্রিয় ছিল এবং দক্ষিণ ভারত ও পেগু বা থাটনের চতুর্দিক অঞ্চলের সাথে অপরিবর্তনীয় সংশ্রব ছিল। যদিও ঐতিহাসিকভাবে বুদ্ধঘোষ নামে এক বৌদ্ধ পণ্ডিত সমুদ্রভ্রমণ করেন এবং সিংহল থেকে পালি ব্যাকরণ নিয়ে আসেন এবং তাঁর নিজ ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহা রহস্যাবৃত, মায়ামারের বৌদ্ধ ইতিহাসে থাটন এক বিশেষ স্থান নিয়েছে, যতদূর পর্যন্ত ভারতের সহিত ইহার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। শিন অরহন নামে থাটনের এক বৌদ্ধভিক্ষু পাগানের রাজা অনারথকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন, আমি ইহা পূর্বে উল্লেখ করেছি। নবম ও দশম শতকের ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাস্কর্য্যসমূহ ও থাটন থেকে আবিস্কৃত হয়েছিল।

পাগানকে অরিমর্দনপুরা বলা হত। একটি রণচাতুর্য বিন্দুতে অবস্থানের ফলে ইহা উত্তর পূর্বে কেয়াউকসির ধান্যক্ষেত্র আধিপত্য করে ও দক্ষিণ পশ্চিম পাগানে মিন্‌বুর উপর আধিপত্য করে এবং ১৬ বর্গমাইল এলাকা আবৃত করে। ইহা পাইউস-এর বংশধরদের একটি সভ্যতা ছিল, পাইউসরা মোনদের আত্মীয় ও নতুন আগন্তুক বর্মণদের আত্মীয় ছিলেন। নবম ও দশম শতকে পাগানের উত্থান পূর্ব ভারতের সহিত এক নিবীড় সম্পর্ক নির্দেশ করে। বিশেষত বাংলা ও বিহারের সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি ছিলেন কিয়ানজিত্থ, তাঁহার স্ত্রী বাঙ্গালী উৎসটা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইহার আলোক আমাদেরকে গর্ডন লিউস রচিত তাঁহার গ্রন্থ Old Burma Early Pagan- এর নিম্নলিখিত সুচিন্তিত লাইনসমূহ পাঠ করতে হবে 'কিয়ানজিত্থর প্রধান রাণী আবেয়াদানা যদি পূর্ব বাংলার নির্যাস না হয়, গভীর ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যেমন তার মন্দির প্রমাণ করে তান্ত্রিক মহাযান মতবাদ রূপে, কিংবা ইহা একটি সহজ পছন্দ নহে, যেমন বার্মার ঘটনাপঞ্জী ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায়, মিথ্যা মতবাদ ও সত্যের মধ্যে, দূর্নীতি ও কেলেংকারী ঘটনা ও নৈতিকতার মধ্যে। তাদের চিত্রকলার বিবরণ অনিরুদ্ধের সময়ে চর্চা করা হয় সমর্থন করার শাস্ত্রীয় রেশন ভিত্তি নেই। অনেক ধার্মিক ও শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘ এলেন, এবং এখনও আসছেন, অরণ্য বুদ্ধ বিহার সমূহ থেকে।

বিবিধ প্রকারের বৌদ্ধ মতবাদের বাধাকে ভেঙ্গে ফেলে লিউস বৌদ্ধ ধর্মের মূল তত্ত্ব সমূহ সকলের দৃষ্টিগোচর করেন এইভাবে যে, আবেয়াদানার দরদালানে যে বৌদ্ধ জীবন বিধি অংকিত হয়েছে তা থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম নহে, কিন্তু ইহা গভীর ও মহৎ। বৌদ্ধ চর্যা তথায় এক আদর্শ প্রকাশ করে জাভার বোরবুদুর এর ন্যায় কিম্বা শ্রীবিজয় এর তালাং তৌ-এর শিলালেখ সমূহের ন্যায়। লিউস পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের ন্যায় কথা উল্লেখ করেন, যিনি তান্ত্রিক মহাযানী ছিলেন। তিনি অতীশকে শিন অরহন-এর সহিত একই মঞ্চে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কারক রূপে উল্লেখ করেন। আমরা বৌদ্ধ ধর্মের একই বাণী অনুসরণ করতে পারি অধ্যাপক বিশ্বনাথ ব্যানার্জীর সাম্প্রতিক লেখায় যে গর্ডন লিউস-এর পর্যবেক্ষনে প্রকাশিত হয়েছে, যদিও ভিন্ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে আমরা বৌদ্ধ ধর্মের একই উদার বাণী শুনতে পাই। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের পাতায় প্রকাশিত 'বৌদ্ধ সমকালীনত্ব' নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক বিশ্বনাথ ব্যানার্জী বৌদ্ধধর্মের অনুপম প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন- বৌদ্ধধর্মের মোড়কে সামাজিক বাধ্যবাধকতায় সমকালীন আন্দোলনের উন্নয়নকে তিনি সমর্থন করেন। তিনি

ভারতে প্রচলিত অবস্থায় (ইসলামের উত্থান ও সামাজিক পরিবর্তন) সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় ব্যাখ্যা করে দেখান কিভাবে বৌদ্ধধর্ম ইহার অন্তর্নিহিত নীতি ও সত্যের বাণীকে শিথিল না করে ইহার মনের ভাবকে হিন্দুধর্মের দিকে আপসে নিষ্পত্তি করে। এই পদ্ধতিতে বৌদ্ধধর্ম তৃণমূলের সহিত তৎদ্বারা আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের মধ্যে কঠোর বাধা চলে গেল, একই সময়ে যখন বৌদ্ধধর্মে 'ঈশ্বর'- এর ধারণা অন্যথায় অন্তর্ভূক্ত হল, নীরবে বুকে হেঁটে ইহার ভাঁজে ঢুকে গেল যেথায় আদি ঈশ্বর রূপে আদি বুদ্ধকে চিন্তা করা হল।

ভারতের সকল অঞ্চলের মধ্যে, বাংলায় সর্বাপেক্ষা বেশী মহাযান তান্ত্রিক মতবাদের চিন্তাভাবধারা গ্রহণ করার উপযোগীতা প্রদর্শন করে, এই মতবাদের অনুশীলন বহু পূর্বযুগেই বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হয় নালন্দা, বিক্রমশীলা, ও দন্তপুরী ইত্যাদি বিশ্ববিশ্রুত বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে। এক বিপুল সংখ্যক গবেষক পণ্ডিতগণ পাগান এবং বাংলার মধ্যে বিদ্যমান একটি সংযোগ প্রতিষ্ঠা করলেন, পূর্বভারতের বৃহত্তর অংমে এবং নেপালে সম্পর্ক স্থাপন করেন যেথায় চিন্তাধারা ও অনুশীলনাদি এক দিক থেকে অপরদিকে প্রচারিত হতে থাকে।

কয়েক বছর পরে আমি চেষ্টা করেছিলাম কিরূপে ও কেন পূর্বভারত থেকে ধারণাসমূহ পুরানো বার্মার ভূমিতে অবতরণ করেছিল তার কারণ খুঁজে বের করতে। আমি বাংলা ও পাগানের মধ্যেকার সংযোগ বা মিলন স্থানসমূহের অবস্থান নির্ধারণ করতে অধিক মনোযোগী ছিলাম এবং দুই অঞ্চলের মধ্যেকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে গবেষণায় মনোযোগী হয়েছিলাম। ইহা বাংলার বৌদ্ধধর্মকে গূঢ়রহস্যমূলক করেছিল এবং বার্মার বৌদ্ধধর্মকে ঠিক রহস্যমূলক নয়, কিন্তু জটিল, বিশাল, প্রকাশ্য ও উপযোগী করেছিল। এই প্রবন্ধটি আমাকে কিছু মন্তব্য পুনর্বার করার সুযোগ এনে দেয় যা আমি পূর্বে বলেছি। বিতর্কটি যথাযথভাবে আরি ধর্মবিশ্বাসকে ঘিরে ও কেন্দ্র করে এবং পাগান বার্মায় ইহার উপস্থিতিকে নিয়ে হয়েছে। আরিদের উৎস নিয়ে দুইটি খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা আছে। উত্থান তুন বিখ্যাত মায়ানমার পণ্ডিতের মতানুসারে বলা হয় 'আরি'কে 'আর্য্য' রূপে।

পাগানের শহরতলীতে অবস্থিত মিনানথু গ্রামে পায়াথণ্ডু ও নন্দমান্না নামে দুইটি মন্দির আছে। ১৯৯৫ সালে আমার প্রথম মায়ানমার ভ্রমণকালীন মন্দিরদ্বয় দর্শনের সুযোগ লাভ হয়। পায়াথণ্ডুতে বোধিসত্ত্বদের নারী দেবতা সহ দেখা যায়। পায়াথণ্ডু অর্থে তিনটি মন্দির নামকরণ হয় তিনটি স্বতন্ত্র ছোট বর্গাকার

মন্দির তৎসহ খিলানযুক্ত বারান্দা হবার কারণে। পাগানে তিনটি বারান্দা বিরল। বার্মিজগণ ইহাদের তিনটি রত্নের সাথে সংযুক্ত করেন; বুদ্ধ, ধম্ম ও সংঘ। আমি সন্দেহ করি যে তিনটি মন্দির ত্রিনাথ ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত; মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ। মৎস্যেন্দ্রনাথ-এর তিব্বতি বিবরণ হচ্ছে লুইপা বলুইপাদ। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সন্দীপ (দ্বীপ) নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন বলে সকলের বিশ্বাস। সন্দ্বীপ অঞ্চলটি তান্ত্রিক মতবাদে অতিশয় প্রভাবিত। নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর রূপে পূজিত হয়ে আসছে। নেপালের বৌদ্ধেরা অদ্যাবধি তাঁর সম্মানে বার্ষিক শোভাযাত্রা করে থাকেন। মিনানথু স্থানটি থামতি থেকে অদূরে "যেখানে আরি ধর্মের উত্থান হয়েছিল এবং বহু শতাব্দী যাবৎ স্থায়ী হয়েছিল।" নন্দমান্না মন্দিরের একটি চিত্রকলায় আছে দাঁড়ানো বুদ্ধ বরদা মুদ্রায় যার সাথে আছেন তিনি নারী সঙ্গী তারা। বুদ্ধের আছে ভারতীয় অবয়ব যেখানে তারার আছে বার্মিজ চেহারা যা বজ্রযান সাধনার উৎসাহ ও অনুশীলনের পূর্ব স্মৃতিরূপে। বজ্রযান নেপাল ও পূর্বভারতে অতি জনপ্রিয়।

নন্দমান্না মন্দির একটি শিলালিপি সাক্ষ্য দেয় মহা সেনাপতি অনন্তসূর ও তাঁর স্ত্রী উভয়ের এক বিশাল বুদ্ধবিহার কর্মপ্রকল্পের প্রতি আত্মোৎসর্গের কথা। পাগানের মানচিত্রের প্রতি এক নিবিড় দৃষ্টি ভঙ্গিকে প্রচুর বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় যে অরণ্য বুদ্ধবিহার সমূহ এই স্থানের অভ্যন্তরে এবং চতুর্দিকে নির্মিত হয়েছিল। শিলালিপির তথ্য এই যে, বুদ্ধবিহার এর আবাসিকগণ ভাত, মাংস ও গাঁজানো সুরা দিনে দুইবার ব্যবহার করতেন যা প্রাচীন বা গোঁড়া বৌদ্ধধর্মের নৈতিক অনুশীলনের বিরোধী যদিও এই কথাটি এখানে উল্লিখিত হয়নি নন্দমান্না, পায়থণ্ডু আবেয়দানা মন্দিরসমূহ পাগান বার্মায় মহাযান ধারণাকে নিরেট করতে অবদান রাখে ও মহাযান ধারণা ও অনুশীলনাদি সহিষ্ণুতার সাথে মান্য করা হয়। আরি ধর্মবিশ্বাসের সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হচ্ছে নাগা ধর্মবিশ্বাস। নাগায়ন মন্দির কিয়ানজিথ কর্তৃক (১০৮৪-১১১৩ খৃস্টাব্দ) কর্তৃক নির্মিত অথরাজা এক নাগ কর্তৃক রাজা সাউলু এর প্রচণ্ড ক্রোধ থেকে রক্ষা পান সেই জায়গায় অবস্থিত। রাজা অনারথ আরিদের ক্ষমতা থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের উন্নতি সাধন করে খর্ব করতে পারেন নি। আরিগণ ধীরে ধীরে রাজ্যের পরিধির দিকে অগ্রসর হন। আরি ধর্মবিশ্বাস প্রভাব পাগান রাজাদের প্রচেষ্টার সাথে পাল্লা দিয়ে বুদ্ধগয়ার সম্পর্ক রক্ষা করতে চলতে থাকে। একটি শিলালিপিতে উল্লেখ আছে রাজা কিয়নজিথ কর্তৃক বুদ্ধগয়ার মূল মন্দির সংস্কারের জন্য এক বিশাল

পরিমাণ মণিরত্ন দান করা হয়। ফলে বুদ্ধগয়ায় বিশাল কার্যসাধন শক্তি লাভ করে যা স্থাপত্যরীতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল। অউং থাউ যেরূপ বর্ণনা করেন, পাগানের বহু সংখ্যক বুদ্ধমন্দির বিহারে অবস্থিত মৌলিক বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমন্দিরের স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে থাকে। কিয়ানজিত্থের মোনসংস্কৃতির জন্য ও এক মহান ভালবাসা ছিল বলে পাগানে তিনি বহুসংখ্যক মন্দির নির্মাণ করেন।

উপরোল্লিখিত নানাত্ববাদী ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ যে পাগানের ধর্মীয়জীবন তা মায়ানমারের বিখ্যাত গবেষক পণ্ডিত উ হাই পে-এর নিম্নলিখিত বিবরণ আমাদের পাঠ করতে হবে; "আপার বার্মার রাজধানী নগরী পাগানে প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রমাণের সাধারণ ঝোঁক প্রতিভাত করে ধর্মবিশ্বাসসমূহের এক মিশ্র সংস্কৃতি, যাদের মধ্যে মহাযান মতবাদ ও থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম ও বৈষ্ণবমতবাদ ও আরিযান ধর্মীবিশ্বাস যা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণ তৎসহ স্বদেশীয় সর্প ও ভূতপ্রেত পূজা বিপুলভাবে সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে।" বাংলা ও পাগানের মধ্যেকার সম্পর্ক আরাকানও পট্টিকেরার মাধ্যমে বিশাল তৎপরতা লাভ করেছিল। পট্টিকেরা হল এক বৌদ্ধ মহানগরী রাজ্য যার যুবরাজের সহিত কিয়ানজিত্থের কন্যার বিবাহ হয়েছিল। তাছাড়া, আলুংসিথু (১১১৩-১১৬৭ খৃস্টাব্দ) যিনি কিয়ানজিত্থ (১০৮৪-১১১২ খৃস্টাব্দ) এর পুত্র তাঁরও পট্টিকেরার এক রাণী ছিল। পট্টিকেরা ছিল তান্ত্রিক পূজাঅর্চনার কেন্দ্র রূপে জোর দিয়ে গুরুত্ব নির্দেশ করেন। জমিটি দেবী দুর্গোত্তরার পক্ষে দানকৃত হয়। দেবী দুর্গোত্তরাকে এক বৌদ্ধ বিহারে স্থাপন করা হয়। জি সি ভট্টাচার্য একটি বার্মিজ জায়গা দেখার জন্য ধাদি ইবা নামক এক ব্যক্তির কাছে যিনি ছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে মঞ্জুরীর একজন নির্বাহী আধিকারিক তাঁর কাছে চললেন। ষোল বাহুযুক্ত তান্ত্রিক দেবী চণ্ডি (চুণ্ডা) পট্টিকেরায় অবস্থিত প্রধান মূর্তি বিদ্যার বিশারদ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। বাংলার উপরে আমার নিজের গবেষণায় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমি কিছু সংখ্যক শিলালিপি দেখতে পাই যেথায় পট্টিকেরার উল্লেখ আছে। যদিও পশ্চিম মায়ানমার ও পূর্ববাংলার মধ্যে পট্টিকেরার প্রকৃত অবস্থান সঠিকভাবে হতে পারে না। তথাপি যে কোন প্রকারে পট্টিকেরার বৌদ্ধ নগরী রাজ্য হয়েছিল পূর্বভারতের কেন্দ্রস্থল এবং পাগানের মধ্যেকার আদর্শ মিলনবিন্দু। লামা তারানাথ তাঁর বৌদ্ধধর্মের পূর্বাঞ্চলের বিবরণে উল্লেখ করেন যে মহাযান, চিন্তাধারা কোকি দেশে জনপ্রিয় ছিল, কোকি দেশে পাগান, আরাকানও পেগু অন্তর্ভূক্ত।

নাটপূজা বৌদ্ধধর্মের অংশরূপে গণ্য করা যায় কিনা বিষয়ে মহাবিতর্ক আছে। বার্মিজ ধর্মবিশ্বাসে ৩৬জন নট আছে। নটের গ্রাম, অঞ্চল ও জাতি আছে। নট ধর্মবিশ্বাসের পবিত্র পর্বত হচ্ছে মৃত আগ্নেয়গিরি মাউন্ট পোপা। পর্বতের সামনে একটি শিলা অবস্থিত যা নটপূজার গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। দেবগণের রাজা (ইন্দ্র) থাগিয়ামিন ৩৭তম নাটরূপে উপরে স্থাপিত হয়েছেন। প্রায়ই মহিলাগণ নট ধর্মবিশ্বাস ও বৌদ্ধধর্মের সাথে কখনও সংঘর্ষ বাধেনি, যেহেতু নট পূজার বিষয়বস্তু ছিল পার্থিব লক্ষ্যও যেহেতু মূল বা নৈতিক বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য ছিল প্রকৃত নির্বাণ।

উপরোক্ত পঙক্তিসমূহে একটি খুবই বিস্তৃত ও সাধারণ বর্ণনা মায়ানমারের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে খাঁটি ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া হয়েছে। ইহা সাধারণভাবে গৃহীত হয় যে, যেহেতু ভারত ইহার বৌদ্ধ ধর্মীয় উত্তরাধিকার 'হারিয়েছে', প্রাচীন বার্মা সিংহলের দিকে তাকাল ভারতের দিকে না তাকিয়ে, তার ধর্মীয় অনুপ্রেরণা লাভ করার জন্য। উল্লিখিত অবদান আশাপ্রদভাবে স্পষ্টরূপে নির্দেশ করে যে, ভারত সম্পূর্ণরূপে তার বৌদ্ধধর্মীয় ঐতিহ্য হারায়নি কিংবা ভারত ও মায়ানমার পরস্পর দূরে থাকেনি যতদূর পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে সম্পর্ক উভয় দেশে বজায় ছিল। বিভিন্ন প্রকার আন্দোলন যা বার্মার মধ্যে হয়েছিল তাও নির্দেশ করে যে, সিংহলের "ধর্মীয় অভিভাবকগিরি" সর্বদা গৃহীত হয়নি। মায়ানমার প্রত্যেক প্রকারের ঐতিহ্য গ্রহণে তৎপর ছিল, তা সে যে কোন দিক থেকে তার প্রভাব আসুক না কেন! যাহা হউক, ইহা সে নিজের ভাবেই করেছিল। এমনকি, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে আরাকান দেখিয়েছিল কিভাবে বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ ইসলামী প্রতিভাকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল যাতে করে চট্টগ্রামের কবিগণ বৌদ্ধ আরাকানের রাজসভা সুশোভিত করেছিল। এই বাধ্যবাধকতা কেবল রাজনৈতিক উর্দ্ধতন ছিল না, কিন্তু ইহা নৈতিকতা ও পরমতসহিষ্ণুতার ভাবও বটে, যার অনুপ্রেরণা সুস্পষ্টভাবে বৌদ্ধধর্ম হতে উৎসারিত হয়েছিল। যদিও মায়ানমার থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের দেশ তথাপি ইহা মহাযান দর্শনের সহিত সংযুক্তবিবিধ মতবাদের চিন্তাধারা কখনো বাতিল করেনি নানাবিধ স্থানীয় ধর্মবিশ্বাস (মত) (উদাহরণস্বরূপ লোকনাথ মত) যা হিন্দু-বৌদ্ধ উৎসমূল বার্মার রাজন্যগণ কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। চিত্রকলা ও স্থাপত্য তাদের বাক্যভঙ্গী দেখা গিয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, মায়ানমারকে তার বহু সংখ্যক প্রত্নতত্ত্ব কর্মস্থল যুক্ত ভারতীয় চারুকলা ঐতিহাসিকদের জন্য 'নন্দনকানন' রূপে বিবেচিত হওয়া উচিত। ভারতে রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি রূপে বৌদ্ধ ধর্মের

প্রত্যাখ্যান মায়ানমারের ধর্মীয় জীবনে উন্নতির দিকে অবদান রাখল যেহেতু এক বিশাল সংখ্যক বোধিজ্ঞানপ্রাপ্ত বৌদ্ধগণ ভারত থেকে আরাকানে বাসস্থান লাভ করেন ও বার্মার বিভিন্ন অংশে আবাসন লাভ করেন। পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অংশে থেকে বহুসংখ্যক বৈষ্ণবেরাও বার্মায় চলে গিয়েছেন। আজ তারা সম্পূর্ণরূপে মায়ানমারের দেশীয় জনগণের সাথে মিশে গিয়েছেন। অপরপক্ষে, বার্মা ভারতের পাণ্ডিত্য গ্রহণ করেছিল ব্যাকরণ, দর্শন, অভিধান-রচনা ইত্যাদি আকারে, যার ঐতিহ্য ধারণ করা হয়েছিল (এখনও পর্যন্ত ধারণকৃত) বুদ্ধবিহার সমূহে সোয়েডাগণ কর্তৃক (বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ)। বিশেষভাবে 'অভিধম্ম' বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা তাঁদের দ্বারা এক মহান পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। বহু পালি গ্রন্থ বার্মিজ ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ঐ সকল পালি মূল শাস্ত্রগ্রন্থের উপর বার্মিজ ভাষায় অট্ঠকথা (অর্থকথা) বা ভাষ্য-টীকা রচিত হয়েছিল। হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি তালপত্রের উপর অনুলিপি করা হয়েছিল বিদ্বান বৌদ্ধভিক্ষুগণ ভারতীয় প্রবাদবাক্যের একটি বাছাই সংকলন 'লোকনীতি' নামক মূলপাঠ ব্যবহার করতেন। ইহা ছিল এই অব্যাহত ঐতিহ্য- বৌদ্ধধর্মের আলোকে চিরপ্রজ্জলন রাখা যা ভারতের জনগণ মায়ানমারের দিকে তাকিয়েছিল- এই সেই দেশ যে সঞ্চিত ধন কুড়িয়ে রেখেছিল যা ভারত রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এই জন্যই জাতীয়বাদী আন্দোলনের সময়ে উভয় দেশই পরস্পরের কাছে এসেছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিনয় নিয়মসমূহের প্রতি সম্মানের আকারে ত্রিপিটকের অন্তর্গত বিনয়পিটকের জ্ঞান সংঘের ধর্মসভা ইত্যাদি থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে পুনরায় ফিরে আসল। ভারতীয় উপমহাদেশের দুইটি অঞ্চল বিলম্বে বৌদ্ধ অধিবাসিদের ফিরে পেল; বর্তমান বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং উত্তরপূর্ব ভারতের অরুণাচল প্রদেশ। চাকমাজাতি, মারমাজাতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অন্যান্য জনগোষ্ঠি কর্তৃক অনুশীলিত বৌদ্ধধর্ম এবং অরুণাচল প্রদেশের খামতিজাতির জনগোষ্ঠি এই মহামূল্যবান বার্মিজ (শানজাতি ও মোনজাতিসহ) বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার লাভ করে আসছে। এশিয়া মহাদেশের অন্য কোন বৌদ্ধজাতির সহিত ভারতের এইরূপ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নাই, যেরূপ হৃদ্যতা বা সংযোগ ভারতের সহিত মায়ানমারের আছে।

সহায়ক গ্রন্থসূচী ঃ

১ । সি. দুরুইসেল, 'দি আর্ট অফ বার্মা এণ্ড তান্ত্রিক বুড্ডিজম' ইন অ্যানুএল রিপোর্ট অফ আর্কিউলজিকেল স্যার্ভে অফ ইন্ডিয়া ১৯১৫-১৬, দিল্লী, স্বাতি পাবলিকেশন, ১৯৯০ । আরও দেখুন, নীহার রঞ্জন রায়, চেপ্টা-৪ 'দি আরি সেক্ট এণ্ড সমনকুটকস্ । 'তান্ত্রিক বুড্ডিজম ইন বার্মা' ইন সংস্কৃত বুড্ডিজম ইন বার্মা, আমাস্টারডস, ১৯৩৬ । রিপ্রিন্টেড বাই অর্কিড প্রেস, ব্যাঙ্কক, ২০০২ ।

২ । গোদন লুচি, ওল্ড বার্মা আর্লি পাগান, জে জে অগাস্টটিন পাবলিশার, লোকাস্ট ভ্যালি, এন, ইয়র্ক, ১৯৬৯ ।

৩ । হেইনজ্ বের্কাট এইচ. বের্কাট এণ্ড রিচার গোমব্রিচ (সম্পা.) দি ওয়ার্ল্ড অফ্ বুড্ডিজিম, লন্ডন, থমেস এণ্ড হুডসন, ১৯৯৬ ।

৪ । (সম্পা. মহাবির, সিং, হোম্ এওয়ে ফ্রম হোম, ইন্ল্যান্ড মুভম্যান্ট অফ্ পিপ্ল ইন ইন্ডিয়া, দিল্লি, অনামিকা পাবরিশার্স, পাবলিশ্ড বাই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ্ এশিয়ান স্টাডিজ, ২০০৫ ।

৫ । উ-তিন-টওয়ে, এ প্রিলিমিনারি নোট অন্ দ্যা বিনয়ধর'স অফ্ পাগান পিরিয়ড্ ইন্ বার্মা, ১৯৪৭ ।

৬ । পল, স্ট্রাচান, আর্ট এণ্ড আর্কিটেকচার অফ্ ওল্ড বার্মা, কিস্কাডালে, ১৯৮৯ ।

৭ । অঙ, থও, হিস্ট্রিক্যাল সাইটস ইন্ বার্মা, দ্যা মিনিষ্ট্রি অফ্ ইউনিয়ন কালচার গভ. অফ্ ইউনিয়ন অফ্ বার্মা, ১৯৭৮ ।

৮ । তুন, সোয়ে, এ গাইড টু মরযুক-উ এন এনসিয়েন্ট সিটি অফ্ রাখাইন, মায়ানমার, ইয়াঙ্গুন, ১৯৯২, আরো দেখুন, পি, গৌতম, বার্মা'স লস্ট কিডেম্স; স্পেনডার্স অফ্ আরাকান, ব্যাংকক, অর্কিড প্রেস, ২০০১ ।

৯ । মিখেল, অঙ্ থুইন, পাগান; দ্যা অরিজিন অফ্ মর্ডান বার্মা, হোনোলুলু ইউনিভার্সিটি অফ্ হাওয়াই প্রেস, ১৯৮৫ ।

১০ । এস.কে. সরস্বতী, টেম্পলস্ এ্যাট পাগান, গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি, খণ্ড-৯ ।

১১ । জনসন্ন সাম্ সংস্কৃত ইন্সক্রিপশন অফ্ আরাকান বুলেটিন অফ্ স্কুল অফ্ ওরিয়েন্টাল এণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, ১৯৪৪ ।

১২ । মেলফোর্ড স্পাইরো, বুড্ডিজম এণ্ড সোসাইটি, এ গ্রেট ট্রেজিশান এণ্ড ইটস্ বার্মিজ বিচিস্সিটুভেস্ বারকেলি ইউনিভার্সিটি অফ্ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস ।

১৩ । সুকোমল চৌধুরী, কন্টেমপোরারি বুড্ডিজম ইন বাংলাদেশ, ক্যালকাটা অতিশ মেমোরিয়াল পাবলিশিং কোং, ১৯৪২ ।

১৪ । অমিতাভ ঘোষ, গ্লাস পেলেস, দিল্লি, হরপার কোলিনিস, ২০০০ ।
১৫ । স্বপ্না ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী), ইন্ডিয়া-মায়ানমার রিলেশনস্, ১৮৮৬-১৯৪৮)
১৬ । মৌঙ্ মৌঙ্, ফ্রম সঙ্ঘ টু লেইটি, ন্যাশানালিস্ট মোঙম্যান্টস অফ্ বার্মা, ১৯২০-১৯৪০, দিল্লি, মনোহর ।
১৭ । ডি,সি, আহির, বুড্ডিজিম্ ইন্ মর্ডান ইন্ডিয়া, সৎগুরু পাবলিকেশন্স, দিল্লি, ১৯৯১ ।
১৮ । ট্রেবর, লিঙ, বুড্ডিজিম্ ইম্পেরিলিজম্ এণ্ড ওয়ার, বার্মা এণ্ড থাইল্যাণ্ড ইন মর্ডান হিস্ট্রি লণ্ডন, জর্জ এলিন এণ্ড আনউন, ১৯৭৯ ।
১৯ । সুকুমার দত্ত, বুড্ডিস্ট মঙ্কস এণ্ড মোনাসটেরিস অফ্ ইন্ডিয়া, দিল্লি, মতিলাল বাণারসিদাস, ১৯৮৮, পুষ্প নিয়োগী, বুড্ডিজম ইন এনসিয়েন্ট বেঙ্গল, ক্যালকাটা, জিজ্ঞাসা, ১৯৮০ ।
২০ । বিনয়তোষ, ভট্টাচার্য, দি ইন্ডিয়ান বুড্ডিস্টট আইকোনোগ্রাফি, ক্যালকাটা, ফার্মা কে. এল, এম, ১৯৬৮ ।

ভাষান্তর ঃ পুলক রঞ্জন বড়ুয়া

--------o------

ঐতিহাসিক বৌদ্ধ তীর্থ রাং-উ রাংকূট রক্ষায় ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরোর অবদান (১৯৬৬-১৯৯০ খৃঃ)

he Ariya Dhamma Parishad of Bangladesh

(A PROGRESSIVE COUNCIL FOR BUDDHISM)

AT RAMKOT, COX'S BAZAR, BANGLADESH.

BSTD—1968,

r & President :
S. Bidyashak Bhikkhu Prajnajyoti
ral : Ramkot Banashram and
Meditation Centre.

Head Office :
Ramkot Banashram
P.O. & P.S. Ramu.
Dist Chittagong.
Bangladesh.

MS AND OBJECTS.

- eserve and renovate the Buddhist Monasteries, st Structures, Temples and (Which was established the reign of emperor 2000 years ago at Ramkot)
- teach the Tripitakas, g time to time publications)
- promote and practice Medi- on Buddhist philosophy.
- promote peace and friendly with the Buddhist world.
- To establish an international Station Centre for Buddhism

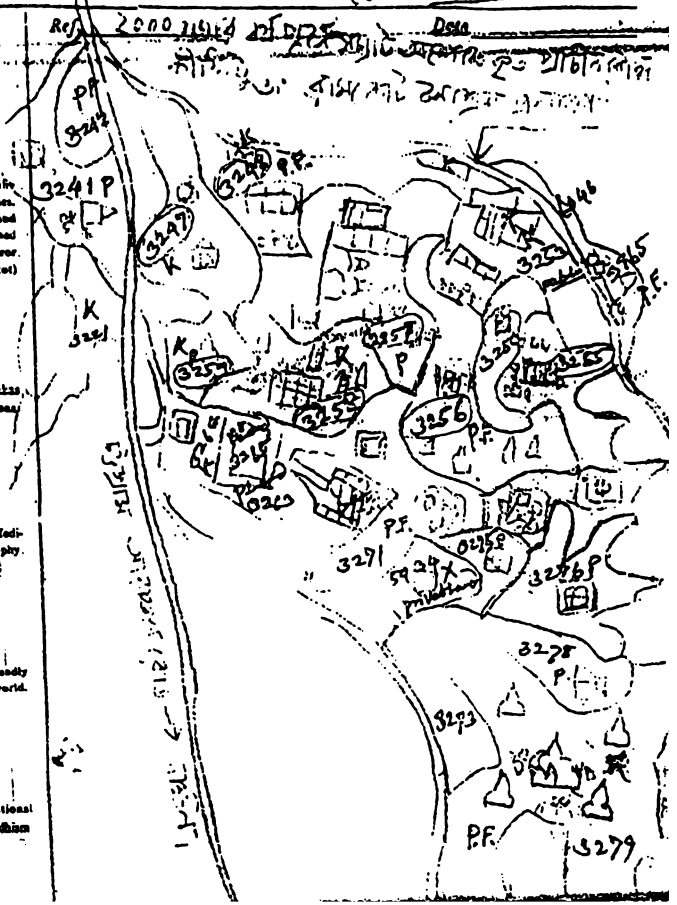

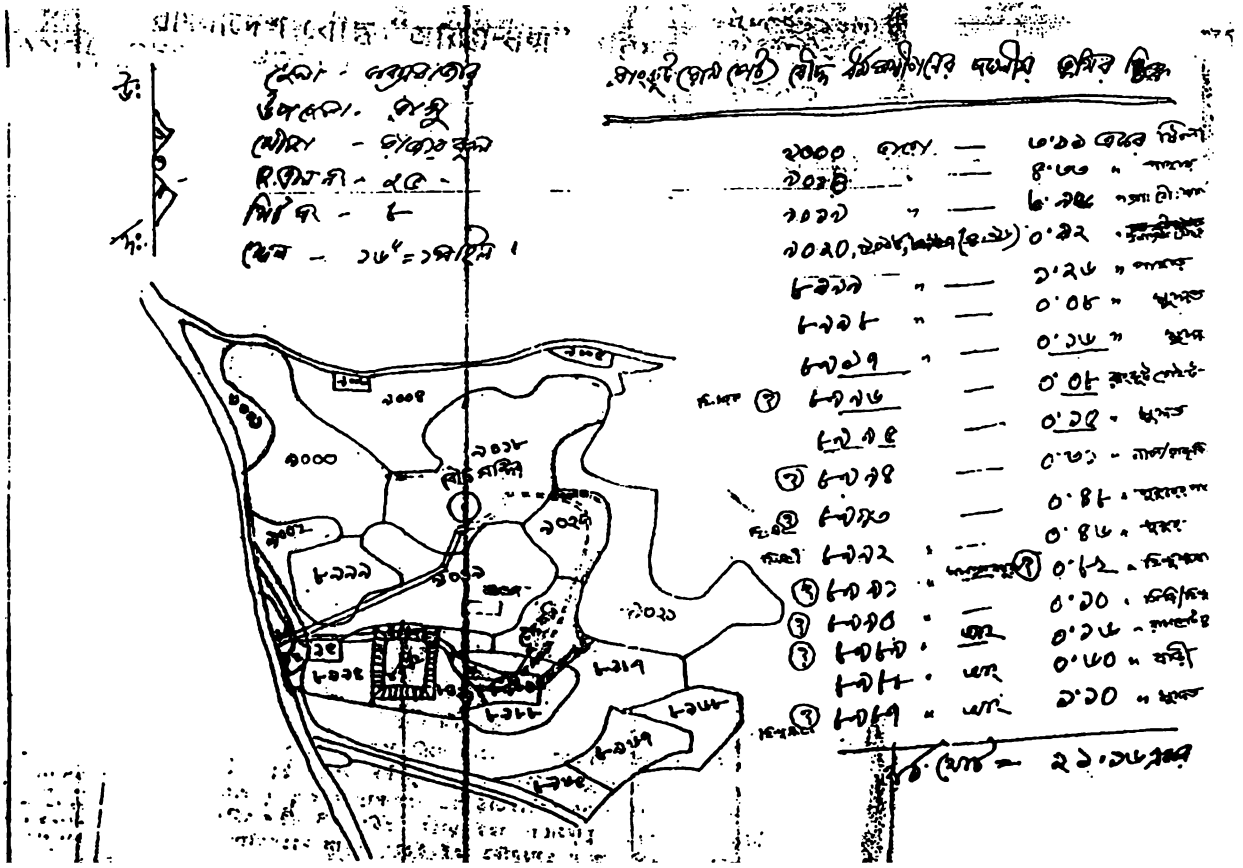

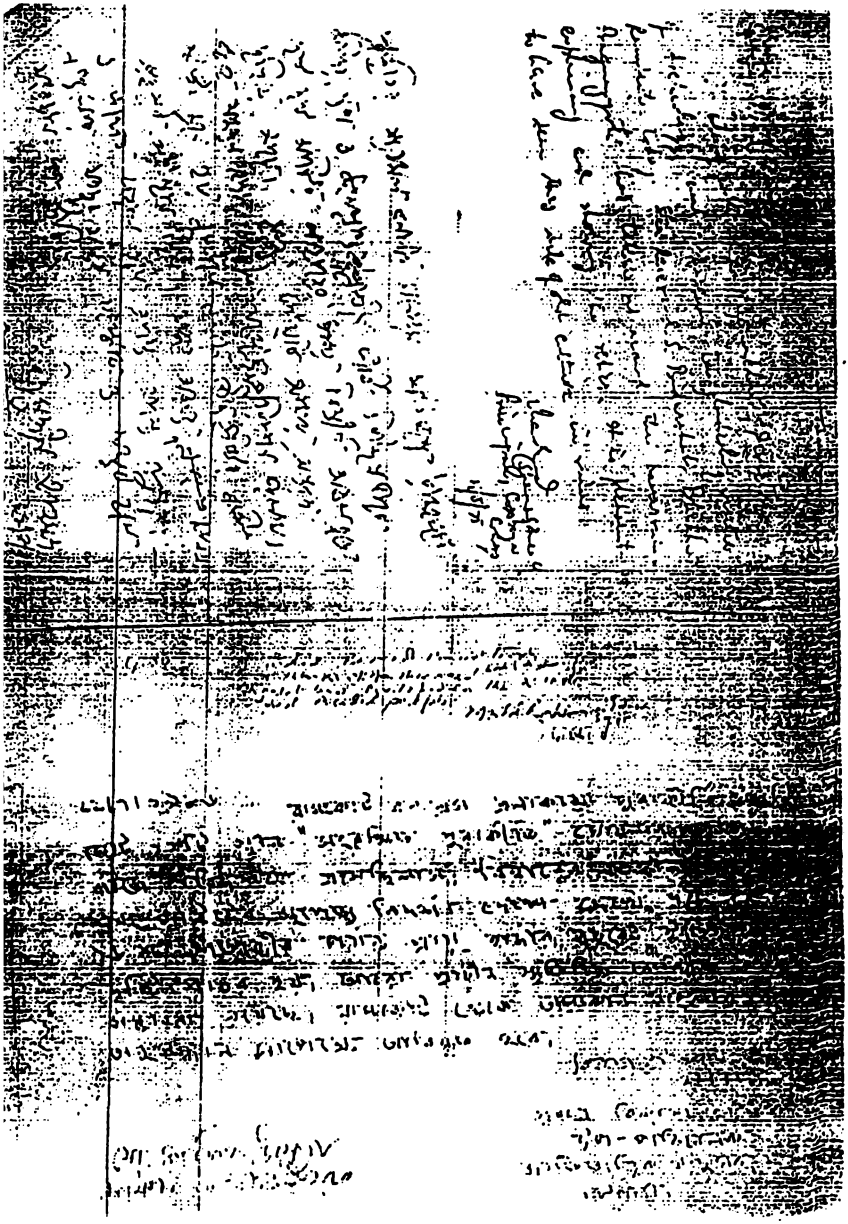

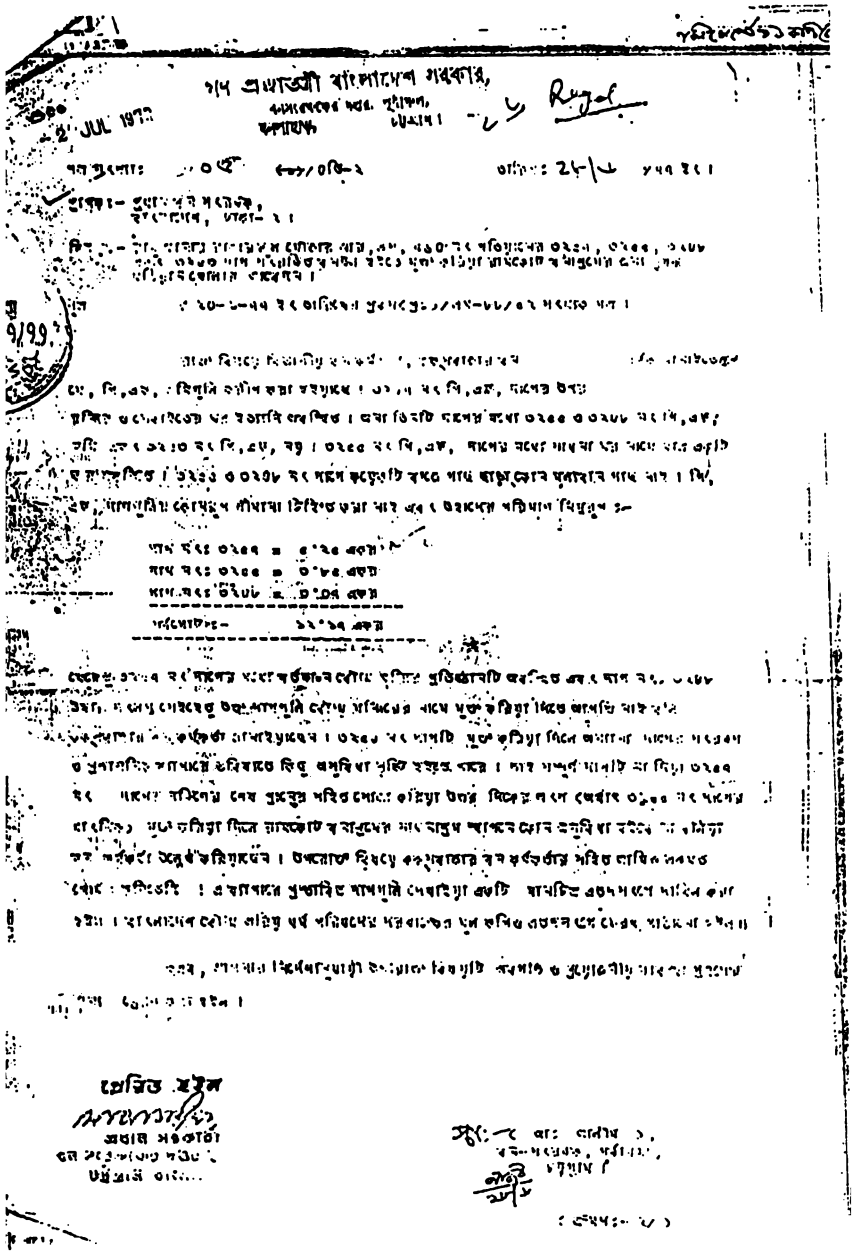

বাংলাদেশ বৌদ্ধ "আরিয়-ধম্ম" পরিষদ

BANGLADESH BUDDHA "ARIYA-DHAMMA" PARISHAD

(একটি প্রগতীশীল আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সাহস, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা।)

FOUNDER & PRESIDENT
ex. S. Rinchhe Shishhe Project, an International Rambot Bhassaram and Meditation Centre.

ESTD. 1958

HEAD OFFICE :
RAMKOT BANASHRAM
P. O. & P. S. RAMU,
SUB-DIV. COX'S BAZAR,
CHITTAGONG, BANGLADESH.

Ref. No. _____ Date _____ 19

মহাধান্য,

উপ-প্রাদেশিক
পর্যটন কর্তৃপক্ষ (পূর্ব)
বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা।

বিষয় : কক্সবাজার জেলায় রাং উপজেলাধীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধ পুরাকীর্তি এলাকা ভ্রমণ, অভ্যর্থনা, পুরাকীর্তি অবস্থিতি ও অংশের ছবি তোলা সংক্রান্ত বিষয়ে।

মহাশয়,

[redacted] বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত সম্প্রতি সংরক্ষিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধকীর্তি-সমূহ [redacted] পাহাড়ের উপর অবস্থিত। [redacted] বুদ্ধ মূর্তি ও [redacted] প্রত্নবস্তুসমূহ প্রাচীন কৃষ্টি বিপুল অক্ষয় ভূতে ছড়ানো আছে। [redacted] বিদেশের সাথের [redacted] ও: নতুন, ও: বাহির উদ্ধির ও ও: রাজুর [redacted] বর্ষাত [redacted] বর্ষাত [redacted] ঐতিহাসিক [redacted] নবাবদলী বন্দিবন্দরে [redacted] সংরক্ষণ [redacted] ব্রহ্ম সরোবরের [redacted] আকর্ষণ করে [redacted] বিশাল [redacted] ঐতিহাসিক [redacted] ফুলোজে [redacted] পূর্ব [redacted] বর্ষ [redacted] [redacted] (রাজবোর্ড [redacted])

লিখিত আছে। প্রচীন [redacted] ঐতিহাসিক [redacted] আছে। [redacted] বুদ্ধের [redacted] [redacted] [redacted]

বাংলাদেশ বৌদ্ধ "আরিয়-ধম্ম" পরিষদ

BANGLADESH BUDDHA "ARIYA-DHAMMA" PARISHAD

A PUBLIC-CUM-INTERNATIONAL NON-GOVERNMENT ORGANISATION (NGO) CULTURAL & SOCIAL WELFARE ORGANISATION

(এক প্রশাসনীল আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সাধনা, সাংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা।)

FOUNDER & PRESIDENT
Ven. S. Siddhirtha Bhikkhu Pramoggoni
Incharge: Rambot Bandarban Vihar and Meditation Centre.

ESTD: 1968

HEAD OFFICE:
RAMBOT BANASHRAM
P O & P.S. ROWAU
SUB-DIV. COX'S BAZAR,
CHITTAGONG, BANGLADESH

AIMS AND OBJECTS

Ref. No. Date ...ly

২

মানবীয় মর্যাদা মহোদয়, ধর্মান্ধিক দুঃখের বিষয় আবেদন করছি যে স্থানীয় এই বিভাগের বিট অফিসারাদি বিশু বদমু কতিপয় বন কর্মচারী"দ্বয়া আমাদের ধরেই নাস্ত " এই ধারণা পোষন করে, উক্ত ঐতিহাস প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পুরাকীর্তি পুনি ধংস সাধনে রত হয় । বিগত ২৮-২-৮৭. ইং তারিখে রাংমোমেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সদস্যগণ ঐতিহাসিক রাজকোট পুরাকীর্তি এলাকা তদন্তে গিয়ে দেখতে পারে, - ঐতিহাসিক এক বিরাট বৌদ্ধ স্তূপের সংরক্ষ ধরেক্ট বিট অফিস তৈরী করা হয় । স্তূপের পাথরে যেই প্রাচীন বুদ্ধ মূর্তি ছিল, যা অত্যন্তীয় বৌদ্ধরা পূজা করতেন, তা ধ্বংসাত্মক করা হইয়াছে । এবং বৌদ্ধ স্তূপটি ধংস করে বিট পুলি বাহির করতঃ সেখানে বিট অফিস এর লোকেরা বসবাস করে । তদনুরূপ সদস্যগণ দেখতে পান বন বিভাগের কর্মচারীদের যোগসাজসে স্থানীয় কিছু সংখ্যক সার্থন্বেষী লোক রাজকোট পুরা কীর্তি এলাকা ভরত স্বপ্ন করে কয়েক ঘানা বাড়ী তৈরী করেছেন যার পুরাকীর্তি এলাকা আমাদের জন্য বন কর্মচারীদের সংগে যুক্ত হয়ে চলছে আসছে এইরূপ দুষ্কৃতিকারীর জন্য পুরাকীর্তি এলাকা ভরত বসত, বাড়ী তৈরী, এভাবার এবং পুরাকীর্তি পুনি প্রদক্ষরণ ও ধংস সাধনে রত হয় । ইহাতে নানা বৌদ্ধ সন্তবাদ ইতুক প্রেক্ষে রাজকোট পুরা কীর্তি এলাকা সংরক্ষনের দাবী জানিয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিবৃতি প্রকাশিত হয় ।

Aims and objects

No.

To Preserve ancient Bu... and Sacred Sites

To renovate and renovate the ... Buddhist Monasteries ... Temples and Tri-Ratnalaya and Which were establis... about 2000 years ... the reign of the ... Emperor ASOKA.

Buddhist Tripitaka ... religious books and ... to lead and education to

To do perfectly Buddhist Meditation for Supreme Knowledge. (It is a system which endows perfect Vision and enlightens the mystery of life and creation.)

To establish friendly relations with the world Buddhist religious and Cultural organisations

To establish an international information Centre at Rambot Vihar.

যথাক্রমে উক্ত বৌদ্ধ কীর্তি এলাকা এই ভাবে প্রত্যাচার, ধংস ও বিনষ্টির কবল হতে রক্ষার্থে তিতিক সংরক্ষন ব্যবস্থার গ্রহণের তাই প্রতিনিয়ে উক্ত এলাকা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাজকোট পুরাকীর্তি এলাকা দুই টি ভাগ , যা ঘাবচিত্রে ও চক্ষীনে উল্লেখিত হয়েছে তৎসহ বন ঝুড়ি আওতাভুক্ত করে দিয়ে রাজকোট ঘবস্থাপক বিহারের মাধ্যে দুঃখ প্রকাশ করছি. রাংমোমেশের দুনাবাম ঐতিহাসিক এলাকা বিশ্বাপদ সংরক্ষনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের প্রবা পরিনামে আমুল ধন্যবাদ জানাচ্ছি

ধন্যবাদ

বাংলাদেশ বৌদ্ধ "আরিয়-ধম্ম" পরিষদ

BANGLADESH BUDDHA "ARIYA-DHAMMA" PARISHAD

PROGRESSIVE INTERNATIONAL BUDDHIST MEDITATION CULTURAL & SOCIAL WELFARE ORGANISATION

(একটি প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সাধনা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা।)

FOUNDER & PRESIDENT, :
S. Bodhisattwa Akhilbandhu Prajnajyoti Mahathera

Aims & objects of Rangkut Bauddha Vihar, Bandarban and Meditation Centre.

LTD. 1968

HEAD OFFICE :
RANGKUT BANAMBAM
P. O. & P. S. ROWAL
SUB DIV. CHIEF BAZAR,
CHITTAGONG, BANGLADESH

AIMS AND OBJECTS

*

...EVATION: ...TION :

1. Preserve and renovate the ancient Buddhist Monasteries of Viharas, Sculptures and relics, which were established at Rome at about 2000 years ago during the reign of the great Emperor ASOKA.

*

2. Buddhist Tripitakas, text books and and education to

*

3. To do perfectly Buddhist Meditation for Supreme Knowledge. (It is a system which endows perfect Vision and enlightment the mystery of life and creation.)

*

4. To establish friendly relations with all the world Buddhist religious and Cultural organisations.

*

5. ...establish an International ...editation Centre at Rangkut Bandarban.

Ref. No ... Date ... 19

প্রতি,

সুধীবৃন্দ

বিশ্ব উপনয়নের প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্তিসমূহ যথাসম্ভব সংরক্ষণ করতে পুনঃ পুনঃ "রাংকোট বনাম্বম বৌদ্ধ বিহারের মাধ্যমে" মূলক পরিকল্পনার প্রস্তাবনা করা হয়েছে।

১ম বাংলার ছেলে রাজা ত্যাগার - রাজারাজন বৌদ্ধের - রাজ, বল, ৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের

খাগ বং ০২৫৭ = ঐতিহাসিক প্রধান বিহার ও প্রাচীন মন্দিরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

খাগ বং ০২৫৮ = প্রধান মন্দিরের সংরক্ষণ পুরাকীর্তি ঘোষণা

খাগ বং ০২৫৫ = সাধনাচক্র, বৌদ্ধ শূন্য মূল মূর্তির সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

খাগ বং ০২৫৬ = প্রধান মন্দির ও সাধনাচক্র স্থানের সংরক্ষণ পুরাকীর্তি ঘোষণা।

উক্ত খাগ চতুষ্টয়ের প্রথা পূর্বেও আবেদন করা হইয়াছে, এতদসত্বেও সর্বশেষ ঐতিহাসিক বৌদ্ধ পুরাকীর্তি মূল্য খাগমূলিক সংরক্ষণের কোন আবেদন করেননি।

খাগ বং ০২৫৪ = সাধনাচক্রের সংরক্ষণ পুরাকীর্তি ঘোষণা।

খাগ বং ০২৫৯ = ঐতিহাসিক বিরাট বৌদ্ধ শূন্যমূর্তি ঘোষণা।

খাগ বং ০২৫৯ = বৌদ্ধ শূন্য মূর্তি ঘোষণা।

খাগ বং ০২৫৮ = প্রাচীন ও বর্তমানে বৌদ্ধ স্থাপন মূর্তির মূর্তি ঘোষণা।

খাগ বং ০২৫২ = স্থানীয় দরেক বিহি নদিম সংরক্ষণ বিরাট বৌদ্ধ স্তূপ ঘোষণা।

খাগ বং ০২৬৩ = প্রধান বৌদ্ধ মন্দির ও উত্তর বৌদ্ধ স্তূপের ঘণ্টাধ্বনী পুরাকীর্তি ঘোষণা।

উপরে রাংকোট পুরাকীর্তি ঘোষণার উপরোক্ত ৮ খাগমূলিক সংরক্ষিত বনভূমি, রাংকোট বনাম্বম বৌদ্ধ মন্দিরের মাধ্যে বৃহৎ ঐতিহ্যের ফলে ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি ঘোষণায় বিশেষ সংরক্ষণ প্রথা আবার ঐকান্তিক আগ্রহ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বহু হতে গবেষণা আবেদন জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক,

[illegible]

সংযুক্ত :

১। ঐতিহাসিক রাংকোট পুরাকীর্তি সংরক্ষণ খাগ বহুরের একখানি মানচিত্র এতদসঙ্গে সংযোজন করা গেল।

সদয় অবগতি ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলাম।

ধন্যবাদান্তে :-

১। মুখ্য-ট্রাস্টিবৃন্দ, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্মীয় কৃষ্টি ও শিক্ষা বিভাগ, চট্টগ্রাম।

২। প্রধান রক্ষণাবেক্ষক, বন ভবন, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

৩। বিশ্বজ্যোতি বৌদ্ধ মহাবিহার বিশ্বাশ্রম-মহাবন, দক্ষিণ হালিশহর বৌদ্ধ বিহার, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম-৬।

সাধু বৌদ্ধ সঙ্ঘরাজের পক্ষে

প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির,
প্রধান পরিচালক
ঐতিহাসিক রাংকোট বোদ্ধ
রাজ ঐতিহ্যের, রাঙ্গামাটি

বিনীত, প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির,
প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি,
বাংলাদেশ বৌদ্ধ "আরিয়ধম্ম" পরিষদ।

CABLE : ATISA, DHAKA PHONE

BANGLADESH BOUDDHA KRISTI PRACHAR SANGHA
Regd. No. 974, G.P.O. Box No. 4142, Dhaka
Buddhist Religious, Cultural Cum-Social Organization
NATIONAL CENTRE OF THE WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS IN BANGLADESH
Headquarters : Dhammarajika Buddhist Monastery, Atisa Dipankar Sarak, Kamalapur Dhaka-14.
BANGLADESH

Ref. Date

ZONAL OFFICES :

SAVA PANDIT VIHARA
5, Katalgonj
Chittagong.
Phone : 21031

JAGGAMEDHA BUDDHIST MONASTERY
Kazir Bazar, Chittagong.

BUDDHIST ASSOCIATION
Thakur Para, Rangamatia.

KARNAFULLY NALANDA VIHARA
Chandraghona,
Chittagong Hill Tracts

CHOWDHURY VILLA
Jail Road, Comilla.

মহামান্য উপ-রাষ্ট্রপতি,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা।

বিষয় : কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত রামু উপজেলাধীন রাজারকুল মৌজার ঐতিহাসিক রামকোট বনাশ্রম এলাকার বৌদ্ধ পুরাকীর্তি সমূহের যথাযথ মর্যাদাপূর্ণ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন।

মহাশয়,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করছি যে, কক্সবাজার জেলার "ঐতিহাসিক রামকোট বনাশ্রম" এই স্মারকলিপি দ্বারা আপনার মহাসমীপে উত্থাপন করিতেছি।

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন রামু উপজেলায় রামকোট বনাশ্রম এলাকা ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধ পীঠস্থান। বিভিন্ন বৌদ্ধ পালিগ্রন্থে উহার ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ আছে। 'ঐরাবতোনাগকুলস্য বিভাগের প্রাক্তন মহাপরিচালক ডঃ নীহার উদিয়ে' লাহ মূলের-উদ্ধৃতি —"ঘন মন্দিরের চতুর্দিকে অবস্থিত পাহাড়ের উপর বিহার, চৈত্য এবং স্তূপ ও বুদ্ধ মূর্তির ভগ্নাবশেষ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে"। বিভিন্ন দেশের বহু পর্যটক উক্ত এলাকায় পরিদর্শন করতঃ ঐতিহাসিক পুরা কীর্তি সমূহ যথাযথ সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন। এই শুধু সম্প্রতি বাংলাদেশের গৌরব ও ঐতিহাসিক সম্পদ। তাছাড়া ও রাজাতো উহার ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে। অতএব আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন দেশের সামগ্রিক স্বার্থে এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পীঠস্থানে যথাযথ মর্যাদাপূর্ণ সংরক্ষণ করা প্রয়োজনীয়তা এতদু অপরিহার্য।

পরিতাপের বিষয় এই যে সম্প্রতি এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পুরাকীর্তি যুক্ত এলাকা বিভিন্ন প্রকারের প্রভাবশালী মহল - পুরাকীর্তি অপসারণ, অবৈধভাবে করিয়া অট্টালিকা তৈরী, বৌদ্ধ স্মৃতিসৌধ ভগ্ন করতঃ নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলার চেষ্টায় রহিয়াছে। বিগত ১৮-২-৮৭ তারিখে আমার সংগঠনের কতিপয় প্রতিনিধি উক্ত রামকোট পুরাকীর্তি এলাকা পরিদর্শন করিয়া আমার কাছে উপরোক্ত দুঃখজনক তথ্যাদি প্রদান করিয়াছেন। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও এই তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও এই ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

এবার দ্রষ্টব্য

ATIS A, DHAKA.

PHONE

BANGLADESH BOUDDHA KRISTI PRACHAR SANGHA
Regd. No. 974, G.P.O. Box No. 4142, Dhaka
Buddhist Religious, Cultural Cum-Social Organisation
REGIONAL CENTRE OF THE WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS IN BANGLADESH
Headquarters Dhammapalika Buddhist Monastery, Atish Dipankar Sarak, Ramnapur, Dhaka -14.
BANGLADESH

Ref ..... Date .....

ZONAL OFFICES :-

NAVA PANDIT VIHARA
15, Katalganj
Chittagong.
Phone : 215371

AGGAMEDHA BUDDHIST MONASTERY
Cox's Bazar, Chittagong.

BUDDHIST ASSOCIATION
Chapanai, Patuakhali

KARNAFULLY NALANDA VIHARA
Chandraghona,
Chittagong Hill Tracts.

CHOWDHURY VILLA
Jail Road, Comilla.

- ২ -

মহাত্মন, এমতাবস্থায় সমাপ্য সরকারের প্রতি আকুল আবেদন, ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই বৌদ্ধ পুরাকীর্তিসমূহকে এইভাবে ধ্বংস ও বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করার জন্য সমগ্র রামকোট বৌদ্ধ পুরাকীর্তি এলাকা [illegible] ১০ টি দাগ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংরক্ষিত বনভূমির আওতাভুক্ত করিয়া "ঐতিহাসিক রামকোট বনাশ্রম বৌদ্ধ মন্দিরের ক্ষেত্র বহুৎ পূর্বক বর্তমান বনতঃ বিরাশপদ সংরক্ষণের কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হউক এই নিবেদন।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত

২৮/৩/৮৭

শুভানুধ্যায়ী বিনম্রচিত্তে
সম্পাদক,
বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ
ও বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ
বাংলাদেশ আঞ্চলিক শাখা
ঢাকা।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধানে রাং-উ রাংকুট

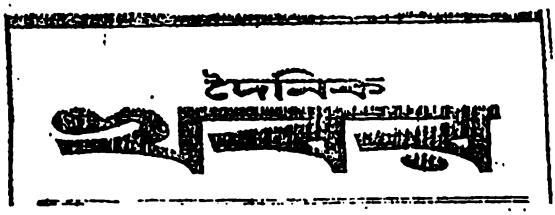

ঢাকা : ৬ই মার্চ, ১৯৮৭

সাপ্তাহিক
১০ ফাল্গুন বিচিত্রা
১৪ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ২০ ফেব্রুয়ারী '৮৭

রামকোট প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্তি সংরক্ষণ প্রসঙ্গে

কক্সবাজার জেলার রামু থানার "রামকোট বনাশ্রম" আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধ পীঠস্থান। এখানে দু'হাজার বৎসরের প্রাচীন সম্রাট অশোক প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও বুদ্ধমূর্তি রয়েছে এবং চতুর্দিকে আরো বহু প্রাচীন মন্দির, বুদ্ধমূর্তি ও বিভিন্ন কীর্তি-চিহ্নের ভগ্নাবশেষ ছড়ানো রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহাপরিচালক ডঃ গফুর, ডঃ নাজিমুদ্দিন, ডঃ হাকন বনীন ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণ উক্ত প্রাচীন সম্ভারের বৌদ্ধ ঐতিহ্যগুলো পরিদর্শন করে উক্ত পুরাকীর্তিযুক্ত এলাকা সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে গেছেন।

উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯-৭-৮৪ তারিখে 'প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও উপজেলা বন কর্মকর্তা রামকোট বৌদ্ধ পুরাকীর্তি এলাকা সফেদমিনে ভূখণ্ডপূর্বক ১১টি বাগ, প্রাচীন বৌদ্ধ পুরাকীর্তিযুক্ত এলাকাসহ প্রমাণিত ২৬৩৯৩ রামকোট ব্লকে সরকারী বাগানের কাজ বন্ধ করে দেন।

এতদসত্ত্বেও রামকোট বনাশ্রমের সভাপতি অধ্যক্ষ ও "বাংলাদেশ বৌদ্ধ আন্তর্ধর্ম পরিষদের" সভাপতি শ্রদ্ধেয়জ্যোতি মহাথেরো, রামকোট বৌদ্ধ পুরাকীর্তি এলাকার ১১টি বাগের মধ্যে প্রথমদিকে চারটি বাগ (৩২৫৭, ৩২৯৮, ৩২৫৫, ৩২৫৬ এই বাগগুলো) বন ভূমির আওতামুক্ত করে রামকোট বনাশ্রম বৌদ্ধ মন্দিরের নামে খতিয়ান খোলার জন্য বন মন্ত্রণালয়ের নিকট বিগত ১২-১-৮৭ তারিখে আবেদন জানান। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বন কর্মকর্তাগণের সফেদমিনে উপরে উক্ত বাগ চারটি বন ভূমির আওতামুক্ত করে রামকোট বনাশ্রমের জন্য খতিয়ান খোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে স্থানীয় স্বার্থান্বেষী কতিপয় লোক রামকোট পুরাকীর্তি এলাকা জবরদখল করে বাড়ী তৈরী করেছে এবং তাদের সাথে আরো কিছুসংখ্যক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তাদের পুত্র নিয়োগের ভূমিহীন কৃষক পরিচয় দিয়ে সমগ্র রামকোট বৌদ্ধ পুরাকীর্তি এলাকা বন্দোবস্তির জন্য আবেদন জানায়। এমনকি জবরদখলকারীরা রামকোট পুরাকীর্তিযুক্ত ঐক্য দাম ৮নং মৌজার অন্তর্ভুক্ত না দিয়ে রামকোট বৌদ্ধ মন্দিরের নামে খতিয়ান দেয়া হলে দ্বারা অসাধুতার ঘটনা ঘটাবে, এরূপ আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে।

আরো জানা যায়, ইতিমধ্যে বন বিভাগের কতিপয় অসাধু কর্মচারীর যোগসাজশে স্থানীয় জবরদখলকারীরা বাকী বৈধী করে এবং বন্দোবস্তির আবেদন জানায়।

আমরা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংস্থার (বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ) আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির পক্ষে জরুরীভিত্তিতে আবেদন জানাচ্ছি যে, সর্বোচ্চ উপরতলা সরকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের জন্য সরেজমিনে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে উক্ত বাগগুলো ঐতিহাসিক বৌদ্ধ পুরাকীর্তিযুক্ত এলাকা কি-না তা প্রমাণ করে, সেই পুরাকীর্তিযুক্ত বাগসমূহ বন ভূমির আওতামুক্ত করে রামকোট বনাশ্রম বৌদ্ধ মন্দিরের নামে পূর্বের খতিয়ান দিয়ে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ রামকোট বৌদ্ধ পুরাকীর্তি এলাকা নিরাপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। —হিমাংশু বিমল বড়ুয়া

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পার্বত্য এলাকা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্ভাবনাময় বলে সাধারণ দেশ সম্বন্ধে, সাধারণ মৈত্রেয় সংঘ এর সাধারণ সম্পাদক প্রজ্ঞানন্দ স্থবির এক বিবৃতিতে রাঙ্গামাটি জেলার রাং-উ উপজেলায় রামকোট বনাশ্রমের পুরাকীর্তিযুক্ত এলাকা প্রবল ধ্বংসকারীদের কবল থেকে রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, প্রাচীন এই বৌদ্ধ বিহারের চারদিকে টেক্তা, বুদ্ধ মূর্তি, ও স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও বনকর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এ পুরাকীর্তিযুক্ত বনাঞ্চলটি পরিরক্ষা করে দেশের আকর্ষণ করা হচ্ছে কিন্তু কতিপয় দুষ্কৃতকারী সম্প্রতি এই এলাকা বেদখল করে বহু বাড়ি তৈরী করেছে।

৩ বাংলাদেশে প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য

পাঁচদিন আন্তর্জাতিক সেমিনার

ডিসেম্বর থেকে ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত

ঢাকা, কলম্বো পুরে এবং ঐতিহ্যিক বৌদ্ধ বিহারে "পাহাড়পুর ও বাংলাদেশে বৌদ্ধ ঐতিহ্য" শীর্ষক চার দিনের আন্তর্জাতিক সেমিনারের

ভাইস প্রেসিডেন্ট : দুইশত্ব তৃতীয় শতক থেকে অশোকের আমল হইতে শুরু করিয়া পাল, দেব, সমকল, চন্দ্রশাসীর বৌদ্ধ রাজত্ব-বর্গের রাজত্বকালে বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সেই যুগের শত শত প্রশিক্ষ-বিহার ও সংঘারাম কালের করাল গ্রাসে ধ্বংস হইয়া গেলেও উহার অবদান ও প্রভাব বিশ্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এখনও দেদীপ্যমান।

ওমরাজান জেলার বাদু বাবার "আমকোট বিহারে" আন্তর্জাতিক তক্ষশিলার ঐতিহ্যের প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধ পীঠস্থান। এখানে পৃষ্ঠায় বৎসরের প্রাচীন সম্রাট অশোক প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও পুরুষ্ঠি রয়েছে উক্ত প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন-সমূহ বিশ্বের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আকর্ষণ করিয়া আসার এক ভাইস প্রেসিডেন্ট সাধক বিহারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম নওকাল (পুরুষায়) আরও বলেন।

দুই প্রচার সাংঘের সেক্রেটারি বিমলেন্দু বড়ুয়া বৌদ্ধ সৃষ্টিবারের দুই সংরক্ষণ ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে প্রেসিডেন্ট এলদারের সহায়তার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি আমাদের মহান পৃষ্ঠপোষক।

ভাইস প্রেসিডেন্ট অতীশ স্মৃতি কমপ্লেক্সের চারটি স্বর্ণপদক বিজয়ীদের হাতে তুলিয়া দেন

দুই প্রচার সাংঘ আয়োজিত সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো। নেপাল, বার্মা, শ্রীলঙ্কা, জাপান, ভুটান, ভারত, আমেরিকা, ইউরোপ হইতে বহু প্রতিনিধি সেমিনারে যোগ দিতেছেন।

শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনার এস-উইন ডিসকরম, বাংলাদেশের ধর্মসচিব আলহাজ এম এ ওয়াদ, দুই প্রচার সংঘের সাধারণ সম্পাদক পি. কে. বড়ুয়া, সেমিনার কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুজা সন্ত মহাথেরো প্রমুখ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বার্মার রাষ্ট্রদূত উসোয়ে মিন্ট, চিকিৎসা বিজ্ঞানী প্রফেসর নূরুল ইসলাম বিশ্বের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত

মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের
সভাপতি
বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ
ও বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক কেন্দ্র

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার, ৭ই চৈত্র, ১৩৯৩

'অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য স্মরিয়া রাখিতে হইবে'

শিক্ষামন্ত্রী মাহমুদুর রহমান বলিয়াছেন, নাগরিক সমুজ্জল ভবিষ্যৎ সৃষ্টির অনুপ্রেরণায় জন আমাদের জানা আছের ও গৌরবময় বিস্তারের গৌরব আমাদের অতীত দিনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবনপদ্ধতিসহ সবকিছুই আমিকার করিতে হইবে।

গতকাল (শনিবার) আতীয় সাদুনরে আয়োজিত বাদ্যধ্বনি বিদ্যা কর্মশালা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে মন্ত্রী বলেন, আমাদের অতীত গৌরবময় ইতিহাস ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ঐতিহ্য ও ইতিহাস মরিয়া রাখিতে হইবে।

সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধন করেন। তথা বিভাগীয়।

প্রাচীন কীর্তি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ঃ সংরক্ষণ জরুরী

সংরক্ষণ ও খনন কার্যের অভাবে বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসের বহু নিদর্শন নষ্ট হচ্ছে। বাঁটন আমল থেকে এযাবৎ যেসব ঐতিহাসিক স্থান কিংবা বাড়ি কিংবা ধর্মীয় ভবন প্রত্নতত্ত্ব দফতর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন সেগুলোর সংখ্যা তেমন বেশী নয়। এর অধিকাংশেরই আবার সুষ্ঠু সংরক্ষণ হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

এর মাঝেও বহু স্থান বর্তমানে অবাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অভিমত—এসব প্রাচীন বাংলাদেশের ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহের সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা দরকার। তা নাহলে এগুলো নিজেরই ধ্বংস হয়ে যাবে। এছাড়া, অযত্নে-অবহেলায় ক্রমে ক্রমে ঘনঘা আরও দুর্লভ

নং-৯/৭/৭৬-পুরাঃ/ ঢাকা
বঙ্গানুসন্ধানী রাংকেন্দ্র পরিষদ
৩৪নং ৫ রাজুখর রাংকূট

তারিখ, ঢাকা:- ---

প্রেরক:- সভাপতি,
বঙ্গানুসন্ধানী রাংকেন্দ্র পরিষদ,
২২/এ, ইস্ট-ডি, খাদে রোড,
মোহাম্মদপুর,
ঢাকা-৭ ।

প্রাপক:- ডেপুটি কমিশনার,
কক্স বাজার ।

বিষয়:- কক্স বাজার জেলার চাদু ঐতিহাসিক কূপ মেরামত ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে ।

মহোদয়,

ঐতিহাসিক বিষয়ে অনুসন্ধানমূলে জানা গেছে যে, আপনার জেলার চাদু ঐতিহাসিক কক্স কূপটি ভারতের ভাষাকোট নগর একটি প্রাচীন বাণিজ্য কুঠরোটির এলাকা। উক্ত এলাকায় প্রাপ্তিক ওয়েস্ট প্রাচ,এস, খাদ নং- ৩২১৭, ৩২১৯, ৩২৩০ ও ৩২৩৬ নম্বর ৪টি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত করেন। এসকল স্থানে যে, পাদ নং- ৩২৩৫, ৩২৩৪, ৩২৩৯, ৩২৩৮, ৩২৩৯ ও ৩২৪০ নম্বর এ পুরোপুরি খনন করা হয়েছে। তবে উক্ত এলাকা ১৯৬৮ ইং সনের ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতিসম্প্রতি বিশেষজ্ঞদের পরিদর্শনের ফলে বিশেষজ্ঞগণ মতামত দিয়েছেন যে, কক্স কূপটি ঐতিহাসিক বাংলার বাণিজ্য কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও ভূমিকম্পের ঐতিহাসিক তথ্য বহন করিতেছে।

এমতাবস্থায়, উক্ত এলাকায় ঐতিহাসিক এবং সমৃদ্ধের উপর ব্যাপকে কোনরূপ ক্ষতি করার কার্যক্রমসমূহ বন্ধ- দৃষ্টি করা, প্রয়োজনে নির্দেশ প্রদান করা এবং উক্ত স্থান পরিদর্শন করতে কোন প্রকার বাধা-বিঘ্নসমূহ সমূলে করা যায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ভবদীয়,
স্বাঃ/-
(ডঃ এ.এম. ফ. মাহমুদ খান)
সভাপতি ।

নং- ৯/৭/৭৬-পুরাঃ/৪৮০০ ঢাকা, তারিখ:- ১৫ ই ---/১৩৮৪ বাংলা ।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইল :-

১। পুলিশ সুপার, কক্স বাজার ।
২। আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম । মোহেশ খাল ... থানা, মুক্তি বাড়ী, চট্টগ্রা ।
৩। বন সংরক্ষক, দুর্গাপাহাড়, ২৫ কি মিটি, চট্টগ্রাম ।
৪। ঐতিহাসিক ভূ-তত্ত্ব-ভূগর্ভ, আন্তর্জাতিক ভূমিকম্প, ভূতত্ত্বাগার,
৫। ঐতিহ্যের সংরক্ষণ কর্মকর্তা, চাদু ঐতিহ্য, চাদু ।
৬। তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা, চাদু থানা, চাদু ।
৭। চিফ টুরিস্ট ইনফরমেশন অফিসার, বাংলাদেশ পর্যটন ... মোহাম্মদ, কক্সবাজার, চাদু, কক্স বাজার ।

সেক্রেটারি

ঐতিহাসিক বৌদ্ধ তীর্থ রাং-উ রাংকূট রক্ষায় ভদন্ত চন্দ্রজ্যোতি মহাথেরোর অবদান (১৯৯০-২০০৮ খৃঃ)

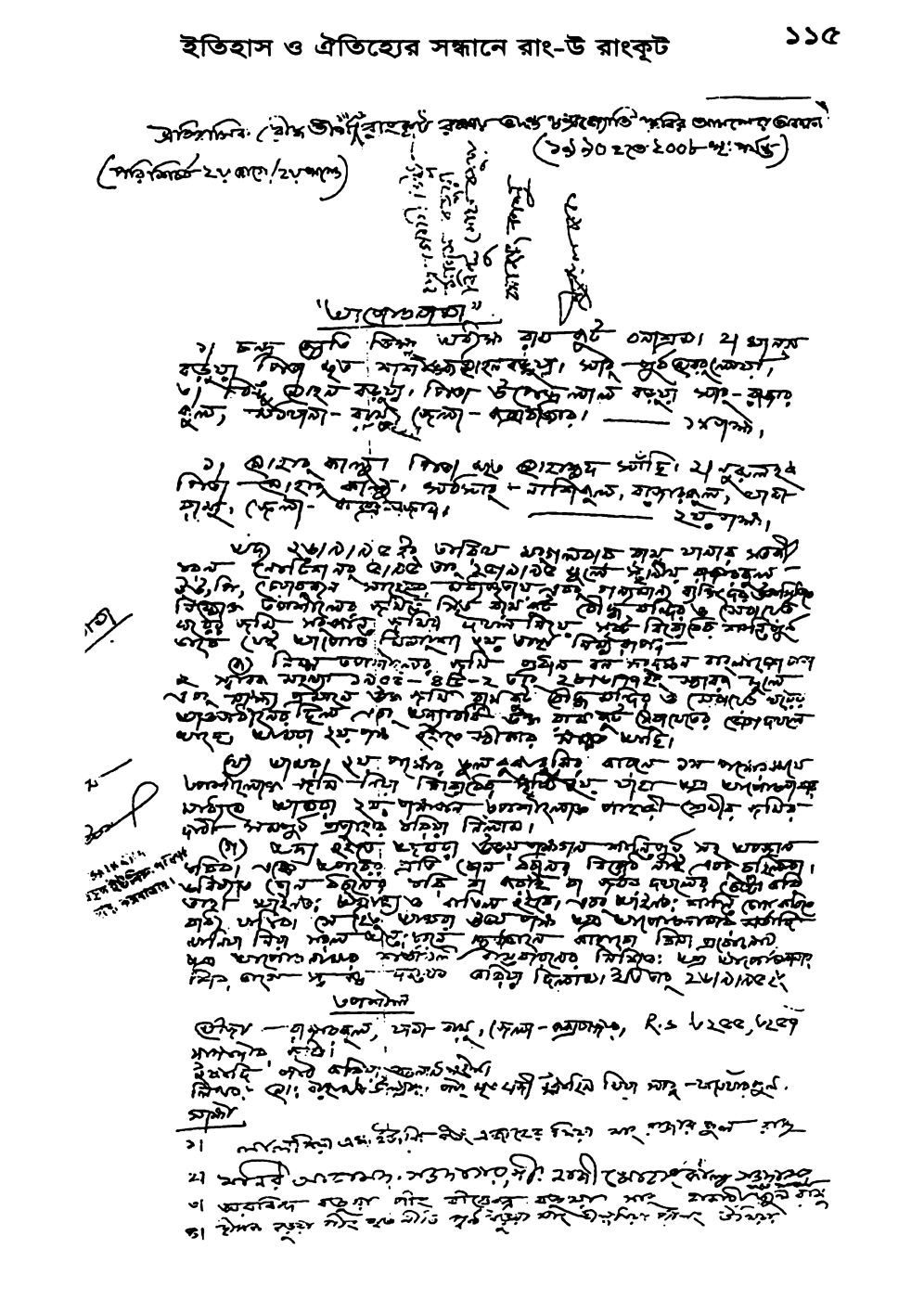

আসল নং : ৫৫: ১৭/২৮—

স্মারকে,

চেয়ারম্যান মহোদয়,
৭ নং রাজারকুল ইউনিয়ন পরিষদ,
ও
গ্রাম বাথানতল,ডাঃ, কক্সবাজার ।

বিষয় :- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরের সীমানা নির্ধারণ প্রসঙ্গে ।

বৌদ্ধ মন্দিরের পক্ষে :- বাদী: মৃত কালুয়া (লেবাদাক) সাং-রাজারকুল,বাবা-রামু, মেম্বা-কক্সবাজার ।

" বনাম "

রামলেট হিন্দু মন্দির পক্ষে বিবাদী :-(১) শ্রীবাস দত্ত (২) পরিতোষ চক্রবর্তী
সর্ব সাং-মহেশকুল,বাবা-রামু, মেম্বা-কক্সবাজার ।

জনাব,

আমি বিনীত সম্মান পূর্বক বিনীত আরজ এই যে বিবাদীগণ হিন্দু এলাকায় বসিয়া মোহু মিথ্যা এলাকার শান্তি বিনষ্টের প্রতি উদ্যোগী । সুতরাং তাহাদের সম্পর্কে বাদিনী কর্তৃক উল্লেখিত দুইটি মামলার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তারা দুটি বিলম্ব করিতেছে । তারা ধর্ম প্রাণ মানুষের প্রথা প্রতিষ্ঠা প্রকাশ । বাদী এই মর্মে প্রার্থনা করিতেছি যে, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলি প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতি বহন করে এবং প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট সীমানা বিদ্যমান (ভিন্ন ভিন্ন) আছে । বর্তমানে বিবাদীগণ হিন্দু এলাকার লোক মোহু ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য না রেখে এলাকার শান্তিনাশের সহায়তায় বৌদ্ধ মন্দিরের সীমানা প্রাচীর ভবন পূর্বক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূজা অর্চনার ব্যাঘাত করে । এমতাবস্থায় বাদী পক্ষের নালিশ হয় । বর্তমানে বৌদ্ধ সম্প্রদায় সংকীর্ণ মন নিয়ে পূজা অর্চনা করতে লেগেও তাহাদের পক্ষ থেকে ,শান্তিপ্রিয় ও ধৈর্যশীল মনোভাব পরিলক্ষিত হয় । বিধায় আইনগত ভাবে বিতর্কিত ও সীমানা সহ বিভাজন করা একান্ত প্রয়োজন । যারা মঙ্গল ভবিষ্যতে শান্তি বয়ে আনিবে । অন্যথায় হানাহানির আশংকা রয়েছে ।

অতএব, মহোদয় একান্ত কৃপা পূর্বক উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান গুলি সম্প্রদায় ভিত্তিক সীমানা সহ বিভাজন করিয়া দিলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলির উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন এবং ওপক্ষের পূজা অর্চনা করা সহজতর ও শান্তিময় হবার পথে আশাকরি বিধায় ঘটিবে ।

তারিখ,রামু :-
০৭-০১-৯৮ ইং ।

বিনীতক-
আবদারুই বিশ্বাস-

কমল কুমার
৭-১-৯৮

শ্রী শ্রী রামকূট তীর্থধাম
ইউনিয়ন - রাজারকুল, উপজেলা- রামু,
জেলা- কক্সবাজার।

SREE SREE RAMKUT TIRTHADHAM
Union : Rajarkul, Upazilla- Ramu
District - Cox's Bazar

তারিখঃ ২৭/০৪/০৬

বরাবরে,
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
রামু থানা
রামু, কক্সবাজার।

বিষয়ঃ সুবিচার পাওয়ার আবেদন।

মহাত্মন,

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার সনাতন ধর্মাবলম্বীর ঐতিহাসিক মহা তীর্থস্থান শ্রী শ্রী রামকূট তীর্থধাম পরিচালন পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হই। সুদূর প্রাচীনযুগ হইতে বাংলাদেশ, ভারত ও বার্মা হইতে লক্ষ লক্ষ সনাতন ধর্মাবলম্বীর এই তির্থধামে আগমন ঘটে। পার্শ্বেও রামকোট বনাশ্রম বৌদ্ধবিহার পরিচালনা পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দ দুর্ভেদ্যের বশবর্তী হইয়া শ্রী শ্রী রামকূট তীর্থধামের প্রধান প্রবেশদ্বারে অবৈধভাবে গেইট নির্মানের চেষ্টা করিতেছে। যাহার ফলশ্রুতিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট ও সদাসয় সরকারের ভাবমূর্তিও ক্ষুন্ন হইতেছে। এমতাবস্থায় রামকোট বনাশ্রম বৌদ্ধবিহার পরিচালনা পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনার নিকট বিনীত প্রার্থনা করিতেছি।

পার্শ্বোক্ত

১। সভাপতি,
২। সাধারণ সম্পাদক ও সদস্য বৃন্দ, রামকোট বনাশ্রম বৌদ্ধবিহার পরিচালনা পরিষদ, রাজারকুল, রামু, কক্সবাজার।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা এই যে, উপরোক্ত বিষয় সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করতঃ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আপনার বিনীত মর্জি হয়।

নিবেদক

(এডভোকেট দীলিপ কুমার ধর)
সভাপতি

(সুজন মল্লিক)
সাধারণ সম্পাদক

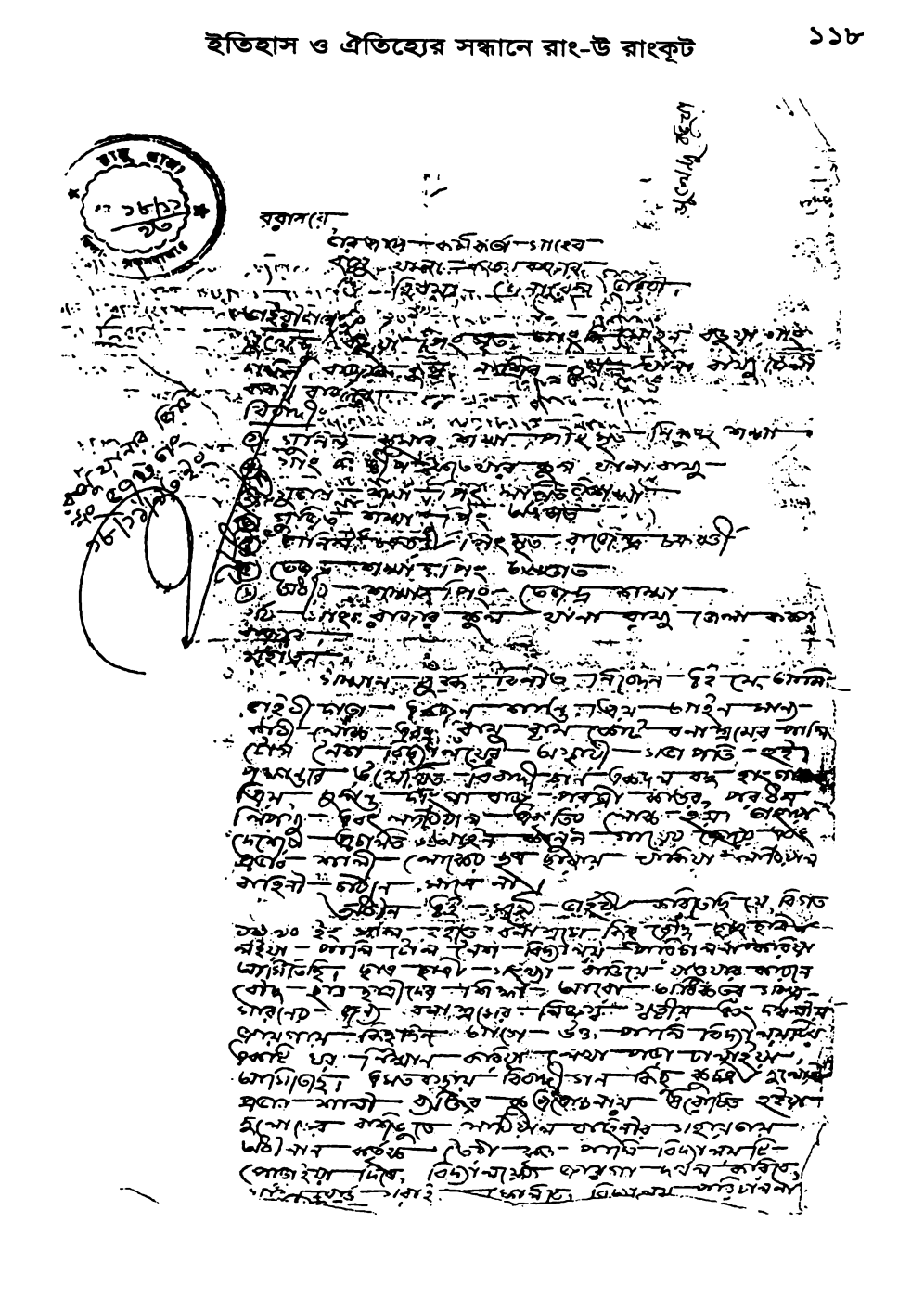

বরাবর,

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
রাঙ্গু থানা,
রাঙ্গুনিয়া।

বিষয় :- ডাইরী।

জনাব,

আমি [illegible] জ্যোতি ত্রিপুরা অধ্যক্ষ, রাঙ্গু গ্রাম সেনা রবারগুম, রাঙ্গুনিয়া, থানা-রাঙ্গু, জেলা-রাঙ্গুনিয়া। এই মর্মে ডাইরী করিতেছি যে, গত ০৫/০২/২০০৭ ইং তারিখ আমাদের বিহারের দাব বাস্তা ঠি খুলিয়া দেখিতে পাই যে, একটি চিঠিতে লেখা আছে যে যা সাহায্য আমার নিকট হইতে ৯০,০০০/= টাকা দাবী করিয়া না দিলে মেরে ফেলিয়া বিহার উড়িয়ে দেওয়ার কথা বলিয়া পত্র মোতে হুমকি প্রদর্শন করে। তাই অত্র ডাইরী মোতে বিষয়টি ডাইরী ভুক্ত করার আবেদন করিলাম।

অতএব, প্রার্থনা যে, উক্ত বরাবরে উল্লেখিত বিষয়টি ডাইরী ভুক্ত করিয়া রাঙ্গু থানা বিহীত ব্যবস্থা নিতে মর্জি হয়।

তারিখ, রাঙ্গু :-

/০২/২০০৭ইং।

বিনীত নিবেদক-
[signature]

নমোঃ বুদ্ধায়

প্রধান :
চন্দ্র জ্যোতি ভিক্ষু
রামু কোট বনাশ্রম
পো+ থানা : রামু
বক্স নং- ৪৭৩০
জিলা:- কক্সবাজার
বাংলাদেশ।

RAMU RAM KUT BANASARAM
Cox's Bazar, Bangladesh.
রামু রাম কোট বনাশ্রম
কক্সবাজার, বাংলাদেশ।

PRESIDENT:
Chandra Jati Bhikkhu
Ram Kut Banasaram
P.O + P.S: Ramu.
Box No: 4730
Dist: Cox's Bazar.
Bangladesh.

তারিখ: ৪/১২/৫৮-ইং

বরাবরে,
জনাব সভাপতি সাহেব,
রামু থানা,
কক্সবাজার।

বিষয় :- শান্তি ভংগ হোক এমন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন।

আবেদনকারী :-
সর্বশ্রী বড়ুয়া পিতা: স্বর্গীয় রাম সেট বনশ্রম মোজাম্মেল, রামু পিতা মৃত-মনিক্য বড়ুয়া, সাং- দিঘল ছড়ি, থানা- রামু, জেলা- কক্সবাজার।

বিবাদী :-
পরাৎপর বড়ুয়া পিতা-মৃত- অংগি মোহন বড়ুয়া, সাং- রাম সেট পাল, মোজাম্মেল, থানা- রামু, জেলা- কক্সবাজার। অন্যান্য আছে।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি রামু রাম সেট বনশ্রম দৌদ্ধ বিহার পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হই। বিবাদী নং-১ইং উক্ত বিহারের সুবৃহৎ নিম্ন তপশীলোক্ত জায়গায় জোর পূর্বক অন্যায়ভাবে বন্যার তরা জায়গায় স্থাপিত গাদরে কাটিয়া ৫টি সাধব পূর্বক জায়গা দখলের বদঃচেষ্টায় রত আছে। বিবাদী নং-১ইং এবং জায়গা দখল করিতে গেলে প্রথমা নেত্র প্রসব বাধা প্রদান করিলে, ধারালও শান্তি ভংগ সহ মারামারী সংঘর্ষের আশংকা খুব বাস্তবী হওয়ায় সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অতএব, প্রার্থনা যে, উপরোক্ত কারণে বিবাদীগণের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থায় মাধ্যমে শান্তি ভংগ হোক এমন পক্ষে বিহীত করিতে হয়।

বিনীত নিবেদক-
৪/১২/৫৮ ইং

তপশীল :-
মৌজা- মোজাম্মেল, থানা-রামু।
খাস, এস ৭৬৪ নং খতিয়ানের ০২৫৭, ০২৫৫ খালের জায়গা।

নোটিশ

ফৌ. কা. বি. আইনের ৯৬০ ধারা মতে —

বাদী পক্ষ

১। পুলিন বড়ুয়া
পিং ঘৃত বলোদ চন্দ্র বড়ুয়া
সাং কাপ্তাই পৌরসভা রাঙ্গামাটি
পেশা কন্ট্রাক্টরী ব্যবসা।

বিবাদী পক্ষ

১। কৃষ্ণ মোহন বড়ুয়া পিং মৃত
এবং অন্যান্য

২। সুরেন্দ্র বড়ুয়া পিং ঘৃত
সকলের বড়ুয়া সাং কাপ্তাই
পৌরসভা থানা কাপ্তাই জেলা
রাঙ্গামাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম।

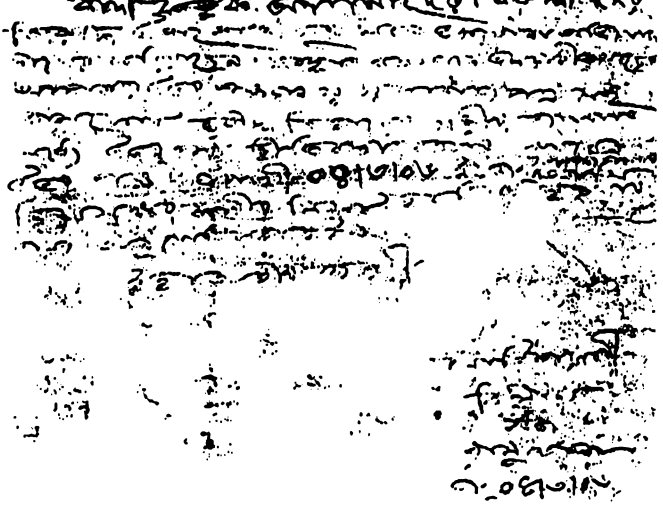

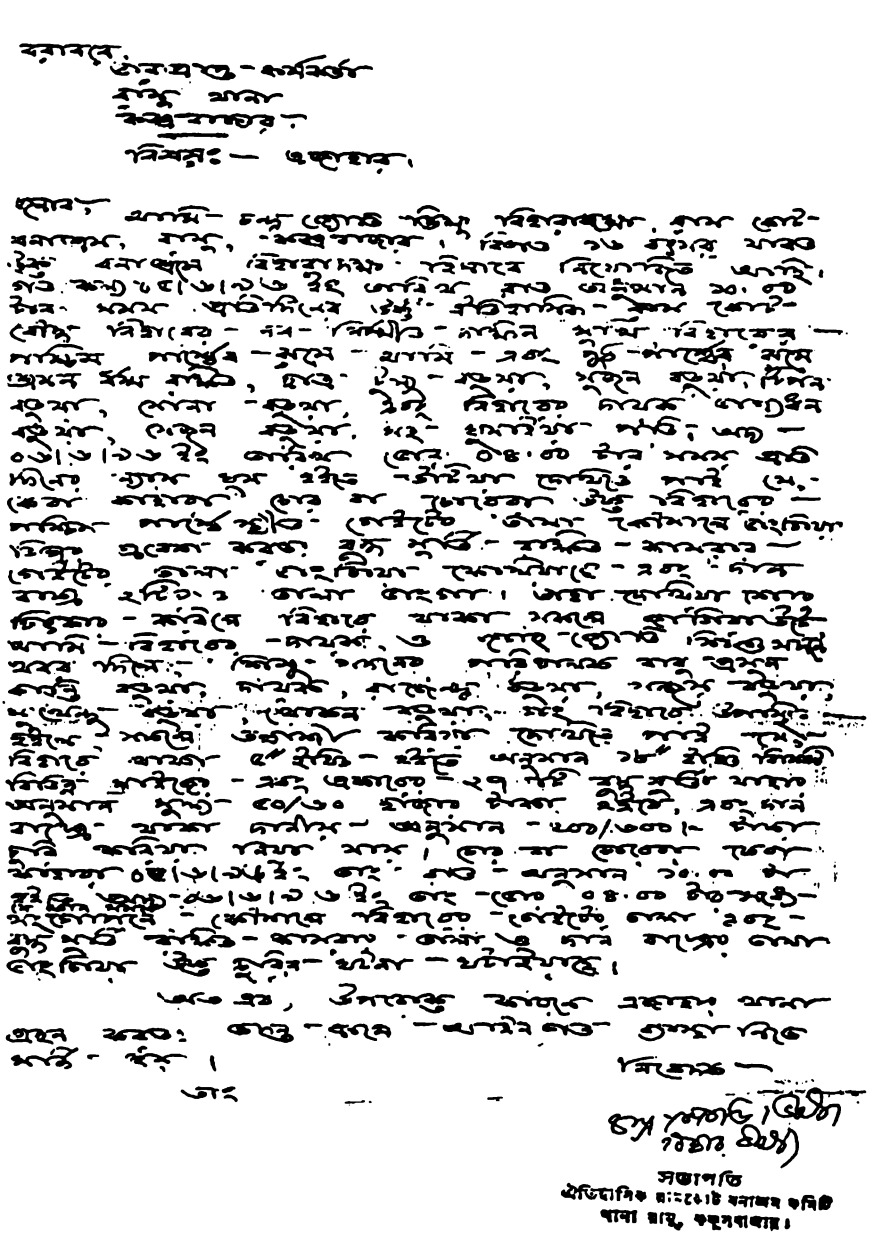

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ক) নিচের কোন্ বাক্যটি সঠিক তা নির্বাচন করো।

১)	ভূমিকম্প হয়েছে।
২)	সমাধিসৌধটি।
৩)	অনুমান করছি।
৪)	নিশ্চয়ই তা ঘটেছে।

খ) সমাধিসৌধের পূর্বদিকে কোন্ ধরনের ফুলের গাছ লাগানো হয়েছিল?

গ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ঘ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ঙ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

চ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ছ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

জ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ঝ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ঞ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ট) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ঠ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ড) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ঢ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ণ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ত) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

থ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

দ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ধ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ন) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

প) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ফ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ব) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ভ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ম) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

য) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

র) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ল) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

শ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ষ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

স) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

হ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ড়) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ঢ়) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

য়) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ৎ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ং) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ঃ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ঁ) সমাধিসৌধের ভেতরে কোন্ ধরনের ফুল ছড়ানো ছিল?

ঐতিহাসিক বৌদ্ধ তীর্থ রাং-উ রাংকূট রক্ষায় ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর অবদান (১৯৭০-২০১০ খৃঃ)

(পরিকল্পনা- ২য় খণ্ড- ৮ম খণ্ড)
১৯/৫৩-২০৮০ খ্রি: তারিখ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার
(সাধারণ শাখা)

স্মারক নং: জেঃপ্রঃ/কক্সঃ/সাঃ/৪-১১/১০ তারিখ- /০৪/২০১০ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ রাংকূট (রামকোট) বনাশ্রম বৌদ্ধতীর্থ কমপ্লেক্স উন্নয়ন কর্মসূচীর আবেদনপত্র প্রেরণ ।

সূত্র ঃ ১। মহোদয় কার্যালয়ের স্মারক নং প-৮(৯)/৯১-অংশ-৪/২২৩/১০০৬,তারিখ-৭ এপ্রিল ২০১০

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, রামু'র স্মারক নং- উনিঃ/রামু / ১০-৩১১ /সাঃ, তাং- ১৪/০৩/২০১০খ্রিঃ ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে,উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রামু, ঐতিহাসিক রাংকূট (রামকোট) বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার কমিটির সভাপতি কর্তৃক দাখিলকৃত "রাংকূট (রামকোট) বনাশ্রম বৌদ্ধতীর্থ কমপ্লেক্স উন্নয়ন কর্মসূচীর" একখানা আবেদনপত্র প্রেরণ করেছেন।

এমতাবস্থায় বর্ণিত আবেদনপত্র (সংযুক্ত কাগজপত্রসহ) সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো ।

সংযুক্ত ঃ বর্ণনামতে ১৩ (তের) ফর্দ ।

(মোঃ নুরুল আলম নিজামী)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক)
কক্সবাজার
ফোন: ০৩৪১-৬৩২৯৫

যুগ্ম সচিব
ও
পরিচালক (পরিকল্পনা)
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন
৮৩-৮৮ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ ।

স্মারক নং: জেঃপ্রঃ/কক্সঃ/সাঃ/৪-১১/১০- ৪৭৯ তারিখ- ০৫/০৪/২০১০ খ্রিঃ।

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:
০১। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ।
০২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রামু,কক্সবাজার ।
০৩। জেলা প্রশাসকের গোপনীয় সহকারী, জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য ।
০৪। সভাপতি,ঐতিহাসিক রাংকূট (রামকোট) বৌদ্ধ মন্দির সংরক্ষণ কমিটি,রাজারকূল,রামু,কক্সবাজার ।
০৫। অফিস কপি ।

৫/৪/২০১০
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক)
কক্সবাজার

অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচির প্রস্তাব (পি.পি.এল.বি)

১। প্রস্তাবিত কর্মসূচির নাম ঃ ২০০০ বছরের ঐতিহাসিক রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থ কমপ্লেক্স উন্নয়ন কর্মসূচি।

২। বাস্তাবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা ঃ জগত-জ্যোতি প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু পরিষদ ও রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থ কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ কমিটি, রাংকূট বনশ্রম্ দ্ধে বিহার, রামু, কক্সবাজার।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ পর্যটন ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ

৪। প্রস্তাবিত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন কাল ঃ ০৫(পাঁচ) বছর।

৫। প্রস্তাবিত কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা ঃ (সংযোজনী- ক)

খৃষ্ট পূর্ব ৩০৮ শতকের ভারত উপমহাদেশের বিশ্বখ্যাত সম্রাট অশোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থ। ৮ম শতাব্দীতে বাঙ্গালী জাতির প্রতিষ্ঠাতা রাজা ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত কালো পাথরের মনোরম বুদ্ধমূর্তি সম্বলিত এই বৌদ্ধ তীর্থ বাংলাদেশে এযাবত কালের সবচেয়ে প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহের অন্যতম বলে পুরাতত্ত্ব গবেষকগণের দ্বারা স্বীকৃত। এশিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার জেলার আওতাভূক্ত পর্যটকদের দৃষ্টি নন্দন অনুচ্চ পাহাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অবস্থিত সবুজ বনানীর শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে অবস্থিত এই তপোবনের অনেক ভূয়সী প্রশংসা পরিদর্শন বইতে লিখে গেছেন দেশী-বিদেশী গুরুত্বপূর্ণ পর্যটক বৃন্দ। প্রায় সকলেরই মন্তব্য: এই গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তি গুরুত্বের সাথে উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ প্রয়োজন। অনেকেই ইচ্ছে করেন প্রকৃতির এই মনোরম পরিবেশে কিছুক্ষণ, কিছুকাল অবস্থান করে কর্মক্লান্ত দেহ-মনের অবসাদ দূর করতে। কিন্তু এই তীর্থধামের নেই কোন অভ্যর্থনা কক্ষ, রেষ্ট হাউজ, উপযুক্ত গণপয়ঃ নিষ্কাশন ও জল সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, এমনকি একটি সম্মেলন কেন্দ্র ও যাদুঘর। প্রতিদিন পর্যটকগণ এবং বছরের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে সমবেত হাজার হাজার তীর্থযাত্রীগণ এগুলোর চরম অভাব অনুভব করে থাকেন। পুরাকীর্তি সমূহ প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের অভাবে ইতিমধ্যে অনেক নষ্ট হয়ে গেছে এবং চুরির শিকার হয়েছে।

বাংলাদেশে পর্যটন সমৃদ্ধ অঞ্চল কক্সবাজার এলাকার এই গুরুত্বপূর্ণ পুরাতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান রামু উপজেলার ঐতিহাসিক রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থের উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের মাননীয় বাংলাদেশ সরকারের হস্ত প্রসারিত হওয়া একান্ত জরুরী।

৬। NSAPR বা মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে প্রস্তাবিত কর্মসূচির সংশ্লিষ্টতা ঃ পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণ এবং পুরাকীর্তির সংরক্ষণ।

৭। প্রস্তাবিত কর্মসূচির আওতায় গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহ (AETIVTIES) এবং কার্যক্রম সমূহের সম্ভাব্য ফলাফল (OUTPUT প্রভাব OUTCOME) :- [সংযোজনী- খ]

কার্যক্রম (Activity)	ফলাফল (Output)/প্রভাব (Output)
১। পর্যটক ও তীর্থ যাত্রীদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান এবং ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরতে দক্ষ গাইড নিয়োগ ও প্রচারপত্র বিলি করা।	১। এতে করে দেশী-বিদেশী পর্যটকগণ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সমৃদ্ধতা জ্ঞাত হবেন। পর্যটন শিল্প সমৃদ্ধি পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রতিবেশী ভারতের মতো এক স্থায়ী উৎসদ্বার খুলে যাবে।
২। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বুদ্ধ প্রবর্তিত মেডিটেশন পদ্ধতি ইদানিং কালে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হচ্ছে। ইহা মানুষকে হতাশা, নৈরাশ্যতা থেকে মুক্তিদানে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। রাংকূট তীর্থে আগত পর্যটকগণের অনেকেই ধ্যান অনুশীলনে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। কমপক্ষে দশদিন অবস্থান করে ধ্যান প্রশিক্ষন গ্রহণের আবাসিক সুব্যবস্থা করার লক্ষ্যে একটি অডিটরিয়াম কাম মেডিটেশনের সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের ধ্যান প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা দরকার।	২। অডিটরিয়াম কাম মেডিটেশন সেন্টারের মাধ্যমে ধ্যান প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থায় সুদূর প্রসারি সুফল বিদ্যমান। ইহা একদিকে মানুষের হারানো মনোবল ও কর্মশক্তি পুণরুজ্জীবিত করে; অপরদিকে পারিবারিক ভুল বুঝাবুঝি ও সন্দেহের অবসান ঘটায়: উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিকস ইত্যাদি মনোজাত রোগ সমূহের নিরাময়তা লাভ হয়। অধিকন্তু মেডিটেশনে আগ্রহী উন্নত বিশ্বের পর্যটকদের আগমন। এতে করে লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পাবে।
৩। বর্তমান বিশ্বে-বৌদ্ধগণ যদিও একটি সম্প্রদায়রূপে চিহ্নিত; বুদ্ধের শিক্ষা কিন্তু অসম্প্রদায়িক। আমরা চাই রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থে অবস্থানরত বৌদ্ধ সর্বস্তরু ভিক্ষুরা তেমন অসম্প্রদায়িক চেতনায় গড়ে উঠুক। সেই লক্ষ্যে রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহারে একটি ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার।	৩। রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ভিক্ষুরা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মদর্শনে দক্ষতা অর্জন করে স্ব দেশে ও বিদেশে বুদ্ধের অহিংস মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করবে। এতে বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের অসম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

৪। রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থ এলাকা রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে মাত্র ৫ কিঃ মিঃ দূরত্বে হলেও অনুন্নত যোগাযোগ এবং বনাঞ্চল বিধায় রাতের বেলায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপ তুল্য চিকিৎসা সংকটের শিকার হয়ে থাকে স্থানীয় জনগণ। তাই রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থ ভূমিতে একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন একান্ত দরকার।	৪। একজন এম.বি.বি.এস. ডাক্তার এবং ধাত্রী বিদ্যায় পারদর্শী একজন নার্স এর সমন্বয়ে এই প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হলে প্রসূতি মা ও শিশু মৃত্যুর হার এই এলাকায় অনেক কমে যেত।
৫। স্থানীয় গরীব বেকার কিশোর এবং যুবকেরা হতাশার কারণে ইদানিং ব্যাপক ভাবে মাদক জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়ে অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরায়ে আনতে স্থানীয় পাবলিক কারিগরী সেন্টার সমূহে ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ গ্রহণ ভাতার জন্যে একটি ফান্ডের ব্যবস্থা করা।	৫। ভোকেশনাল প্রশিক্ষন গ্রহণ এবং উদ্যোগে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে। মাদক সেবন দ্রব্য প্রবণতার হার কমবে। সামাজিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা ফিরে আসবে।
৬। রাংকূট এলাকার স্থানীয় জনগণ নদী ও সাগরের ভাঙ্গন জনিত উদ্বস্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্তি। সরকারী বন ভূমিতেই তাদের বসতি। আর্থিক দৈন্যতা জর্জরিত দিন মজুর শ্রেণীর এই লোকদের সন্তানেরা স্কুল-কলেজ শিক্ষায় এখন চরম অনগ্রসরতার শিকার। তাই রাংকূট এলাকায় একটি অবৈতনিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা দরকার।	৬। এই অনগ্রসরতা দূরীকরণে রাংকূট তীর্থ কমপ্লেক্স এলাকায় একটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্যে অবৈতনিক বিদ্যালয় এবং কোচিং সেন্টার চালু করলে এই দরিদ্র এলাকার বাইরে নিয়ে জীবন জীবিকার সন্ধান করতে পারবে। দরকার।

অফিস সরঞ্জাম/ যন্ত্রপাতি ঃ

(ক) পর্যটক গাইডের জন্য অভ্যর্থনা কক্ষ ও মিউজিয়াম ভবনে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ঃ

ক্রঃ নং	সরঞ্জামের বিবরণ	প্রস্তাবিত সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের রাজস্ব খাতে সংগৃহীত অনুরূপ সরঞ্জাম সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উন্নয়ন খাতে সংগৃহীত অনুরূপ সরঞ্জাম সংখ্যা	মন্তব্য
১।	সোফা	২ সেট			
২।	সেক্রেটারী টেবিল	১টি			
৩।	সেক্রেটারী চেয়ার	১টি			
৪।	আলমিরা	১টি			
৫।	সোপ কেইচ (যাদুঘরের জন্য)	১টি			
৬।	কলমদানি	১টি			
৭।	প্রাচীন ভারতীয় মানচিত্র (রাজনৈতিক)	১টি			
৮।	ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ	১০০টি			
৯।	বিবিধ দ্রব্য				

(খ) অডিটরিয়াম তত্ত্বাবধায়ক অফিস

ক্রঃ নং	সরঞ্জামের বিবরণ	প্রস্তাবিত সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট রাজস্ব খাতে	সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন খাতে	মন্তব্য
১।	সোফা	১ সেট			
২।	সেক্রেটারী টেবিল	১টি			
৩।	সেক্রেটারী চেয়ার	৩টি			
৪।	আলমিরা	১টি			
৫।	সেলফ/ কাপবোর্ড	২টি			
৬।	হলের মঞ্চের জন্য ডায়েস টেবিল	১টি			
৭।	ডায়েস চেয়ার	১২টি			
৮।	হলের সাধারণ চেয়ার	১৫০০টি			
৯।	বিবিধ				

(গ) মেডিটেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আবাসিক সরঞ্জাম

ক্রঃ নং	সরঞ্জামের বিবরণ	প্রস্তাবিত সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের রাজস্ব খাতে	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উন্নয়ন খাতে	মন্তব্য
১।	প্রশিক্ষণের আবাস ঘরে শয়নাসন	২টি			
২।	টেবিল	২টি			
৩।	চেয়ার	২টি			
৪।	কাপ বোর্ড	২টি			
৫।	শিক্ষার্থীদের শয্যা	১০০টি			
৬।	টেবিল	১০০টি			
৭।	চেয়ার	১০০টি			
৮।	কাপ বোর্ড	১০০টি			
৯।	রন্ধন শালার	১ সেট			
১০।	রন্ধন সরঞ্জাম	১ সেট			
১১।	পাচকের আবাস কক্ষের সরঞ্জাম	২ সেট			
১২।	পাঁচক সহকারী ২জন আবাস কক্ষের সরঞ্জাম	২ সেট			
১৩।	সিকিউরিটি আবাস কক্ষের আসবাবপত্র				

(ঘ) রাংকূট প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থ কমপ্লেক্স স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সরঞ্জামাদি ঃ

ক্রঃ নং	সরঞ্জামের বিবরণ	প্রস্তাবিত সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের রাজস্ব খাতে	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উন্নয়ন খাতে	মন্তব্য
১।	ডাক্তারের চেম্বার সজ্জামাদি	১ সেট			
২।	চিকিৎসক সহকারী নার্স কক্ষের সরঞ্জাম	১ সেট			
৩।	রোগীর কক্ষে সরঞ্জাম	১ সেট			
৪।	ডাক্তারের আবাস কক্ষের সরঞ্জাম	১ সেট			
৫।	নার্সের আবাস কক্ষের সরঞ্জাম	১ সেট			

রাংকোট বৌদ্ধ বিহার

(Floor Area)

১। [illegible], অফিস ও

মেডিটেশন ভবন (দ্বিতলা ভবন)

26.00 x 24.00 480.00 m2

২। ধাতুঘর, অভ্যর্থনা ভবন

9.00 x 12.00 = 108.00 m2

৩। মূল ঘর কাম ডাইনিংহল :-

[illegible] 900.00 m2

৪। আবাসিক ভবন (হোষ্টেল):-

9.00 x 13.00 117.00 m2

Floor Area হিসাবে নির্মান ব্যয়

১। অডিটরিয়াম, অফিস ও রেষ্টিটেশন ভবন (বিভক্ত ভবন):

(i) Foundation : 480.00m2x5335/ p/m2	: Tk 2560800.00
(ii) R.C.C. Structure : 2 x 480.00 x 6811/= p/m2	: Tk 6538560.00
	Tk: 9099360.00
	Say Tk: 9099000.00

২। বাসুদের জন্য অভ্যর্থনা ভবন:-

(i) Foundation : 108.00m2x5335/- p/m2	:Tk 576180.00
(ii) R.C.C. Super Structure : 180.00 m2 x 6811/= p/m2	:Tk 735588.00
	Tk: 1311768.00
	Say Tk: 1312000.00

৩। রান্নাঘর ও ভাইনিং হল:

(i) Brick Masonry : 2x900.00m2x 1485/	:Tk 2673000.00
	Tk: 2673000.00

৪। রেষ্টোরেন্ট ভবন (বিভক্ত ভবন):-

(i) Foundation : 117.00x5335/	: Tk 624195.00
(ii) R.C.C. Super Structure : 2 x 117.00 x 6811/=	:Tk 1593774.00
	Tk: 2217969.00
	Say Tk: 2218000.00

৫। ঝুলন্ত সেতু, রাস্তা, পাইপ ওয়াল ইত্যাদি- Tk 6000000.00

সর্বমোট টাকা: 21302000/00

ভবন নির্মান ব্যয়ের বিবরনঃ-

১। অডিটরিয়াম , অফিস ও মেডিটেশন ভবন (দ্বিতলা ভবন)	টাকা ৯,০৯৯,০০০/০০
২। বাদুঘর কাম অভ্যর্থনা ভবন	: টাকা ১৩,১২,০০০/০০
৩। গ্রন্থাগার কাম ডাইনিং হল ঘর	: টাকা ২৬,৭৩,০০০/০০
৪। হোষ্টেল ভবন (দ্বিতলা ভবন)	: টাকা ২২,১৮,০০০/০০
৫। কুলভ সেতু, সলিং, গাইড ওয়াল নির্মাণ	: টাকা ৬০,০০,০০০/০০

সর্বমোট টাকা = ২,১৩,০২,০০০/০০

(মুহাম্মদ হাতান ভূইয়া)
উপ সচিবের সচিবালয়
এসিইউ, প্রসূ, সচিবালয়।

পাঁচ-সাম্রিক রাংকূট [illegible] বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন [illegible]

প্রস্তাবিত বিষয় সমূহঃ

১. প্রধান পুণ্যকীর্তির মন্দির চত্বরে (মূলমন্দির) উঠার সিঁড়ি বয়োবৃদ্ধদের আরোহন উপযোগী করা।

২. প্রাচীন মন্দিরে জল প্রবেশ রোধের ব্যবস্থা করা।

৩. প্রাচীন মন্দির সংলগ্ন টিন সেড সমূহের বৌদ্ধ প্রাচীন মন্দির ভাস্কর্য অনুকরণে পরিবর্তন সাধন করা।

৪. সুপ্রাচীন কালের অনুকরণে ৫০ টি ধ্যানগৃহ নির্মাণ করা/ডিভল সেডিটেশন সেন্টার।

৫. ষোড়শ শতাব্দীর মোঘল ও আরকান রাজের যুদ্ধে নিহতদের উদ্দেশ্যে নির্মিত বেদনা উদ্রেক স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণের জরুরী ব্যবস্থা গ্রহন করা।

৬. প্রাচীন সমাধি (কবর) সমূহ সংরক্ষন ব্যবস্থাসহ দর্শনার্থীদের যাতায়াত সুগম করা।

৭. বছরে কয়েকবার বিশাল ঐতিহ্যগত সমাবেশ ও ধর্মসভা হয়। তাই উপযোগী প্রয়োজন।

৮. স্থাপনা পাহাড়ের ভাঙনরোধে গাইডওয়াল।

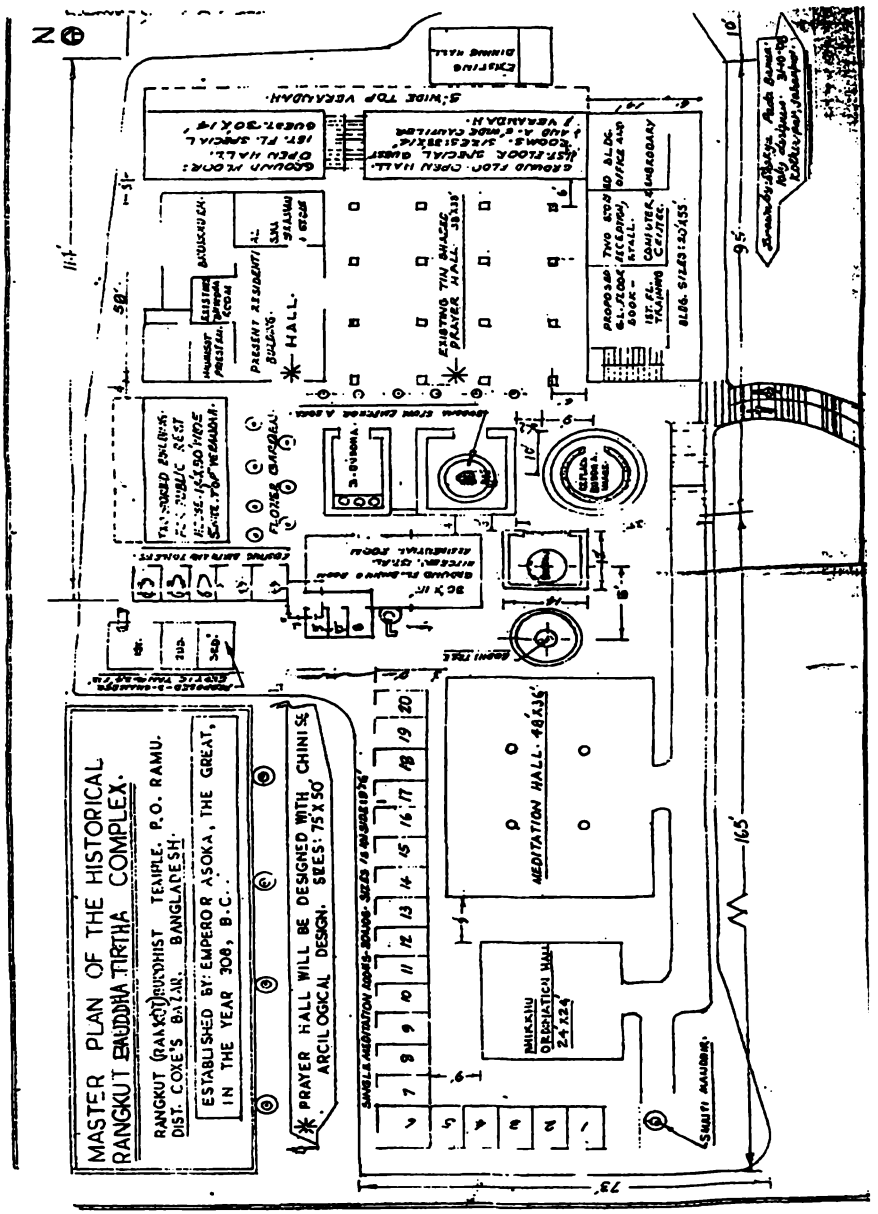
MASTER PLAN OF THE HISTORICAL
RANGKUT BAUDDHA TIRTHA COMPLEX.
RANGKUT (RANGKUT) BUDDHIST TEMPLE. P.O. RAMU.
DIST. COX'S BAZAR. BANGLADESH.
ESTABLISHED BY: EMPEROR ASOKA, THE GREAT,
IN THE YEAR 308, B.C.
PRAYER HALL WILL BE DESIGNED WITH CHINISE
ARCHEOLOGICAL DESIGN. SIZES: 75'X50'
MEDITATION HALL 48'X36'
BHIKKHU ORDINATION HALL 24'X24'
HALL
N

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধানে রাং-উ রাংকূট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার
(সাধারণ শাখা)

স্মারক নং জেকম/কসব/সাধা/৪-১১/১০ - ৪৭৩ তারিখ- ১৫/০৫/২০১০ খ্রিঃ।

বিষয় : বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ মন্দির ও দর্শনীয় স্থানসমূহের উন্নয়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র : বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর স্মারক নং প-৮(১)/৯১-অংশ-৪/২২৩/১০০৬,তারিখ-৭ এপ্রিল ২০১০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন হতে প্রাপ্ত পত্রের মর্মবস্তু (পত্র সংযুক্ত)

প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে।

(সঞ্জীব কুমার সিংহ)
সহকারী কমিশনার
ফোনঃ ৩৩৪১-৬৩৩৮১

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মহেশখালী/রামু-কক্সবাজার।

স্মারক নং জেকম/কসব/সাধা/৪-১১/১০- তারিখ- /০৫/২০১০ খ্রিঃ।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :
০১। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
০২। পরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন,৮৩-৮৮ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১২১২।
০৩। জেলা প্রশাসকের গোপনীয় সহকারী। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

সহকারী কমিশনার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
রামু, কক্সবাজার

স্মারক নং- উঃনিঃ অঃ/রামু/১০- ৫৫৮/সাঃ তারিখ : ২৩/০৫/২০১০ খ্রিঃ।

অনুলিপি : অবগতি ও কার্যার্থে:-
১। সভাপতি,রাং ওং টি বৌদ্ধবিহার,রামু। তাকে সংযুক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক বিস্তারিতকারীকে অবহিত করানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
সংযুক্ত : ২(দুই) পৃষ্ঠা।

২৩/০৫/১০
(শহীদ মোহাম্মদ জুইদুল হক)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
রামু, কক্সবাজার

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দির ও ধর্মীয় স্থানসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সুবিধাদি ঃ

ক্রমিক নং	ধর্মীয় স্থাপনা	প্রস্তাবিত সুবিধাদি
০১.	চট্টগ্রাম শহরস্থ বৌদ্ধ মন্দির (যেখানে গৌতম বুদ্ধের চুল ও পাঁচ শত বছরের পুরানো তালপাতায় অঙ্কিত ত্রিপিটক রয়েছে।	ক) মন্দির ভবন সংস্কার ; খ) সীমানা দেয়াল নির্মাণ ; গ) মন্দির অভ্যন্তর পুরানো আদলে সজ্জিতকরণ ; ঘ) দর্শনার্থীদের জন্য বসার ব্যবস্থা করণ ; ঙ) পানি, বিদ্যুৎ ও টয়লেটসহ অন্যান্য সুবিধা ; চ) প্রবেশ পথ সংস্কার ; ছ) ফুলের বাগান ইত্যাদি তৈরী ; জ) কার পার্কিং সুবিধা নির্মাণ।
০২.	কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দির।	ক) মন্দির চতুরের চতুর্দিকে (প্রবেশ ফটক সহ) অর্নামেন্টাল সীমানা দেয়াল নির্মাণ ; খ) এলাকার উন্নয়ন এবং পুরানো ভবনের আদলে চত্বর এলাকায় পৃথক ভবন নির্মাণ করে সেখানে বৌদ্ধ মূর্তি সুদৃশ্যরূপে প্রতিস্থাপন করণ ; গ) দর্শনার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি যেমনঃ বসার স্থান, প্রবেশ পথ নির্মাণ, বাগান তৈরীসহ এলাকাটি আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা ; ঘ) পানি, বিদ্যুৎ টয়লেট সুবিধাসহ একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ ; ঙ) কার পার্কিং সুবিধা নির্মাণ।
০৩.	কক্সবাজার জেলার মহেশখালিতে আদিনাথ বৌদ্ধ মন্দির	ক) মন্দির চতুরের চতুর্দিকে অর্নামেন্টাল সীমানা দেয়াল নির্মাণ (প্রবেশ ফটক সহ) ; খ) এলাকার উন্নয়ন এবং পুরানো ভবনের আদলে চত্বর এলাকায় পৃথক ভবন নির্মাণ করে সেখানে বৌদ্ধ মূর্তি সুদৃশ্যরূপে প্রতিস্থাপন করণ ; গ) দর্শনার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি যেমনঃ বসার স্থান, প্রবেশ পথ নির্মাণ, বাগান তৈরীসহ এলাকাটি আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা ; ঘ) পানি, বিদ্যুৎ, টয়লেট সুবিধাসহ একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ ; ঙ) সাগরের ঢেউয়ের আঘাতে মন্দির চত্বরটি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য স্থায়ী ব্যবস্থাকরণ ; চ) মহেশখালি জেটি থেকে মন্দির পর্যন্ত রাস্তাটি যাতায়াতের উপযোগী করে পুনঃনির্মাণ ; ছ) কার পার্কিং সুবিধা নির্মাণ।
০৪.	কুয়াকাটার মিশ্রি পাড়ায় অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দির।	ক) কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের অনতিদূরে মিশ্রি পাড়ায় অবস্থিত প্রায় ৬০ ফুট উঁচু বৌদ্ধ মূর্তিটি সুরক্ষার জন্য মন্দির এলাকায় একটি অর্নামেন্টাল সীমানা দেয়াল নির্মাণকরণ ; খ) মন্দিরের মূর্তিটিকে কেন্দ্র করে একটি সুউচ্চ নান্দনিক ভবন নির্মাণ যে ভবনে দর্শনার্থীগণ অত্যন্ত সহজভাবে বৌদ্ধ মন্দির দর্শন এবং উপাসনা করতে পারে ; গ) সুউচ্চ মন্দিরটি যেন স্পষ্টভাবে দেখা যায় সে জন্য প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থাকরণ ; ঘ) মন্দির চত্বরে ল্যান্ড স্কেপিংসহ নানাবিধ উন্নয়ন ; ঙ) কুয়াকাটা থেকে মিশ্রি পাড়া পর্যন্ত প্রায় ৮ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ ; চ) পানি, বিদ্যুৎ, টয়লেট সুবিধাসহ একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ ; ছ) কার পার্কিং সুবিধা নির্মাণ।

Ministry Letter-09

Samena Begum
Joint Secretary
Director (Commercial)

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
BANGLADESH PARJATAN CORPORATION
Kh-48, Mahakhali C/A, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel: 88-02-8833229, Fax: 88-02-8833900, E-mail: info@bangladeshtourism.gov.bd, Website: www.bangladeshtourism.gov.bd

১২ APR 2010

নং-প-ব(১)/১১-অংগ-৪/২২৬/৮৫৬

তারিখঃ ১৯ এপ্রিল ২০১০

বিষয়ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ মন্দির ও ধর্মীয় স্থানসমূহের উন্নয়ন প্রসংগে।

সূত্রঃ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- বিপন/পরি-২/বৌদ্ধ মন্দির ও ধর্মীয় স্থান-১/২০১০/৮০ তারিখঃ ২৪-০২-২০১০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ধর্মীয় পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দির ও ধর্মীয় স্থানসমূহ পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয় করার জন্য ইতোমধ্যে বেশ কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত রাম্যু বৌদ্ধ মন্দিরের উন্নয়ন করে দেশী/বিদেশী পর্যটকদের কাছে আবেদন সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদেশী সাহায্য সংস্থার নিমিত্ত নিম্নলিখিত সুবিধাদি সম্বলিত একটি প্রস্তাব বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)ঃ

১) মন্দির চত্বরের চতুর্দিকে (প্রবেশ গেটসহ) ওয়ালকম্পাউন্ড সীমানা দেয়াল নির্মাণ;

২) এলাকার উন্নয়ন এবং পুরাকালে ভবনের আদলে চত্বর এলাকায় পৃথক ভবন নির্মাণ করে সেখানে বৌদ্ধ মূর্তি সুষ্ঠুরূপে প্রতিস্থাপন করণ;

৩) দর্শনার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি যেমনঃ করার স্থান, প্রবেশ পথ নির্মাণ, বাগান তৈরীসহ এলাকাটি আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা;

৪) পানি, বিদ্যুৎ ও টয়লেটসহ একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ;

৫) কার পার্কিং সুবিধা সৃষ্টি।

উপরোক্ত সুবিধাদি ছাড়াও কক্সবাজারস্থ রাম্যু বৌদ্ধ মন্দির এলাকায় আর কি কি সুবিধা সৃষ্টি করা যায় সে বিষয়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মতামত/সুপারিশ গ্রহণপূর্বক অত্র সংস্থাকে অবহিত করতে অনুরোধ জানানো হলো।

(ফজির আহমদ)
যুগ্ম-সচিব
ও
পরিচালক (পরিকল্পনা)
ফোন : ৮৮৩৩৩৬৫ (অফিস)।

প্রাপকঃ

জেলা প্রশাসক
কক্সবাজার।

বাংলাদেশ বৌদ্ধ অরিয় ধম্ম পরিষদ

THE ARIYA DHAMMA PARISHAD OF BANGLADESH

(A PROGRESSIVE COUNCIL FOR BUDDHISM)
RANGKUT, COX'S BAZAR, BANGLADESH.
ESTD – 1968

FOUNDER : REV. S. BIDARSHAK PRAJNAJOTI.
PRESIDENT : VEN. PRAJNA BANGSHA MAHATHERO
B.A (Hons.) M.A (Double)

HEAD OFFICE:
RANGKUT BANASRAM
RAJARKUL, P.O.O & P.S: RAMU
DIST: COX'S BAZAR
BANGLADESH

ADM AND OBJECT Ref.....

বরাবরে

মাননীয় এ. ডি.সি (জেনারেল)
কক্সবাজার জেলা প্রশাসক কার্যালয় (সাধারণ শাখা)
কক্সবাজার।

বিষয় : রাংকূট বনশ্রম বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন কল্পে কক্সবাজার জেলা প্রশাসক কার্যালয় (সাধারণ শাখা) এর প্রজ্ঞাপনে সংশোধন আনায়ন সহ অন্যান্য প্রস্তাবিত বিষয় সমূহ-

সূত্র: স্মারক নং উ :নি:অ/রামু/১০-৫০৮/সা:

জনাব,

উপরোক্ত সূত্রের আলোকে এলাকায় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিহার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কমিটির সদস্যগণের আলোচনা যোগসাবেক ঐতিহ্যসিক রাংকূট বনশ্রম বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন কল্পে নিম্নলিখিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হল-

১ নং প্রধান পুরাকীর্তি স্থাপনার পাদদেশে বয়োবৃদ্ধ ও পঙ্গুদের সহজ আরোহনের উপযোগী সিড়ি তৈরীর জরুরী ব্যবস্থা করা
২ নং প্রধান স্থাপনা পাদদেশের ভাঙ্গন রোধে গাইড ওয়াল নির্মান।
৩ নং প্রাচীন কালের বৌদ্ধ সাধক গণের সাধনা গুহার অনুকরণে ৫০টির মতো মেডিটেশন গুহা নির্মান ।
৪ নং বছরে কয়েক বার তীর্থ যাত্রীদের বিশাল সমাবেশ এবং আন্তধর্মীয় সংলাপ কেন্দ্রের প্রয়োজনে প্রাচীন বৌদ্ধ আদর্শ অনুকরণে অডিটোরিয়াম নির্মান।
৫ নং ফেব্রুয়ারী শতাব্দীতে মোগল ও আরাকান সেনাদের যুদ্ধে নিহতদের সমাধি (কবর) ও ধ্বংসস্তুপ সৃষ্টি সৌধ গুলোর সংস্কার সাধন সহ যাতায়াত পথ নির্মান।

সংশোধনী :- অনুগ্রিপি আদর্শে ও কার্যার্থে .

রামু উপজেলাধীন ছোট বড় বেশ কিছু বৌদ্ধ বিহার বিদ্যমান আছে স্থানীয় লোকদের বিভ্রান্তির নিরসনে নিম্নোক্ত সংশোধন প্রয়োজন-

১নং (রায়কোর্ট বৌদ্ধ বিহার) এ স্থলে (রাংকূট বনশ্রম বৌদ্ধ বিহার)

২নং বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর পত্র নং প-৮(৯)/৯১ অংশ -৪/২২৩/১০০৬ এর ৩নং লাইনে (কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত রামু বৌদ্ধ মন্দিরের উন্নয়ন) এ স্থলে (রাংকূট বনশ্রম বৌদ্ধ বিহারের উন্নয়ন)

৩ নং ১৩ নং লাইনে এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ২নং কলামে উপরোক্ত সংশোধনী প্রয়োজন।

অতএব মহোদয় উপরোক্ত প্রস্তাব সমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা হলো।

নিবেদক
প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
সভাপতি
রাংকূট বনশ্রম বৌদ্ধ বিহার

তাং -১৪/০৬/২০১০

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধানে রাং-উ রাংকূট

প্রাপ্ত,
মাননীয়া ডেপুটি ডিরেক্টর
সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর
কক্সবাজার জেলা আঞ্চলিক শাখা।

বিষয়ঃ বাবু রামকোট ও জগতজ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম এর পরিচালনা কমিটির বর্তমান সভাপতির অকাল মৃত্যুতে নতুন সভাপতি মনোনয়ন এবং সংবিধানের আদর্শ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ।

মহাত্মন ঃ
সবিনয় নিবেদন এই যে, অত্র কক্সবাজার জেলা ও বাবু উপজেলাধীন "জগতজ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম" নামে একটি দুঃস্থ ও অনাথাশ্রম ইহার সংলগ্ন গ্রামের অনাগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।এই প্রতিষ্ঠানের ৫নং ধারার আদর্শ উদ্দেশ্যসমূহে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখিত বিষয় সমূহের একটিও বিগত ১৪টি বছর যাবত বাস্তবায়নের পরিবর্তে পরিচালক মন্ডলী বিপরীত আচরণ করায় জনগনের অসন্তোষ চরম ভাবে বৃদ্ধিপায়।

এই ন্যোক্ত প্রশাসনের লক্ষ্যে জগতজ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম এর ভূমি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিক পুণ্যতীর্থ রাংকূট (রামকোট) বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার এবং জগত জ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম এর মধ্যে এক সমঝোতা সভা বিগত ৩রা আগষ্ট-২০০৯ এ দুই প্রতিষ্ঠানের দুই প্রধান ব্যক্তিত্বের আহবানে অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত সমঝোতা বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ ও অদ্যাবধি বাস্তবায়িত না হওয়ার মাঝে শিশুকল্যাণ হোমটির বর্তমান সভাপতি হঠাৎ বাবু মনোহরি বড়ুয়া মৃত্যুবরণ করেন।প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উপদেষ্টা বাবু রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া মহোদয়ের সাথে রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার কর্তৃপক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী সভাপতি মনোনীত না হওয়া পর্যন্ত কোন মহল থেকে জগতজ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম পরিচালনা কমিটির পরবর্তী সভাপতি মনোনয়ন পদক্ষেপ স্থগিত করতে আপনার নিকটে আবেদন করা গেল।

নিবেদক
জগতজ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম সংলগ্ন গ্রামের জনগণের পক্ষে
(সুরেশ বড়ুয়া)
সম্পাদক
রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার পরিচালনা কমিটি.

সংযুক্ত ফটোকপিঃ
১)জগতজ্যোতি হোম এর গঠণতন্ত্রের প্রথম পৃষ্ঠা -১ কপি
২)A.D.C. (রেভিনিউ), কক্সবাজার এর ভূমিব্যবহার অনুমতির শর্তাবলী :১ কপি
৩) জগতজ্যোতি শিশু সদন ও রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার, প্রতিষ্ঠান দ্বয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সমঝোতা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের ১ কপি

সদয় অবগতির জন্যে ১ কপি প্রেরিত হলো ঃ
১)মাননীয়া প্রতিমন্ত্রী,সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২)মাননীয়া ADC(Revenue),কক্সবাজার।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধানে রাং-উ রাংকূট

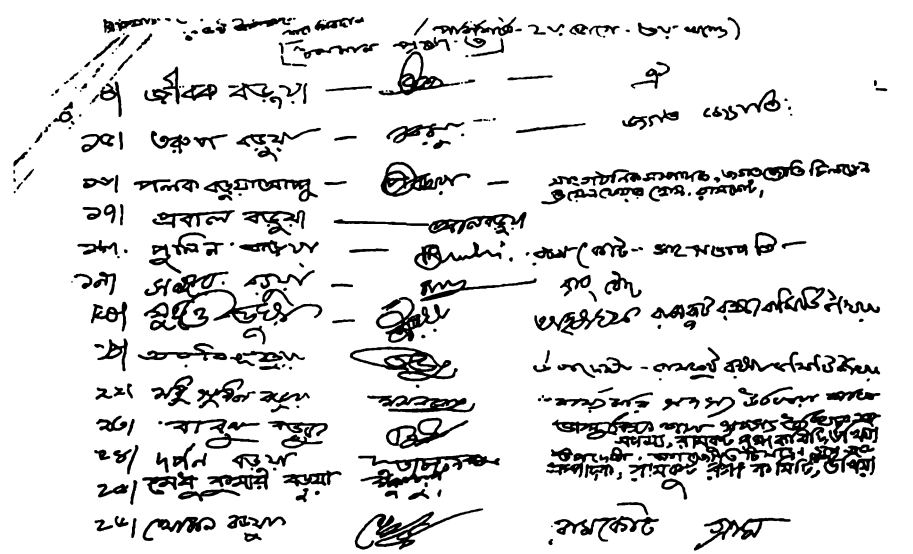

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-ঃ গঠনতন্ত্র ঃ-

জগতজ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম

সাং - রামকোট, ডাকঘর - রামু, উপজেলা - রামু,
জেলা - কক্সবাজার।

ধারা- ১ ভূমিকা ঃ-

অনাথ ও ছিন্নমূল দুঃস্থ সন্তানদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা, অনাথ সন্তানদেরকে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরী প্রশিক্ষণ এবং মানবিক পরিবেশে লালন-পালনের মধ্য দিয়ে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে গড়ে তোলা। যাতে করে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্যে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসালয়, গরীব ও দুঃস্থদের সেবা এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করলেই জগতজ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোমটির স্বার্থকতা আসবে এবং সমস্ত কার্যক্রমগুলো বাস্তবে রূপায়িত করাই উহার প্রধান ভূমিকা।

ধারা- ২ সংগঠনের নাম ঃ-

জগতজ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম।

ধারা- ৩ সংগঠনের ঠিকানা ঃ-

গ্রাম- রামকোট, ডাকঘর- রামু, উপজেলা- রামু, জেলা- কক্সবাজার।

ধারা- ৪ কার্যক্রম এলাকা ঃ-

সমগ্র রামু উপজেলায় ইহার কার্যক্রম চলবে।

ধারা- ৫ আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঃ-

১) উক্ত সংগঠনটি একটি অরাজনৈতিক সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান।

২) উক্ত সংগঠনটি মূলতঃ অনাথ, ছিন্নমূল, দুঃস্থ সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের একটি প্রতিষ্ঠান। অনাথ ছিন্নমূল সন্তানদের মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি জগতজ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম সংলগ্ন গ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য উক্ত সংগঠন সর্বাত্মকভাবে ভূমিকা পালন করে যাবে। সে হিসাবে নিম্ন লিখিত কার্যক্রমগুলো সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালনা করার লক্ষ্যে বিবেচনাধীন থাকবে।

৩) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করিয়া উহার মাধ্যমে বয়স্ক লোকদের শিক্ষা দান করা।

৪) কারিগরী শিক্ষা, যেমন- সেলাই, টাইপ, শর্টহ্যান্ড, কম্পিউটার এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন পূর্বক বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫) এলাকায় সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন পূর্বক ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সংগীত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৬) দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন পূর্বক এলাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনা মূল্যে চিকিৎসাসহ বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৭) এলাকার দুঃস্থ ও গরীব ছেলে-মেয়েদের পুনর্বাসনকল্পে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।

(চন্দ্র জ্যোতি ভিক্ষু)
প্রকাশক
জগতজ্যোতি চিলড্রেন হোম
রামকোট, রামু, কক্সবাজার।

মানস বড়ুয়া
সাধারণ সম্পাদক
জগতজ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম
রামকোট, রামু, কক্সবাজার।

ধারা- ১৬ সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা ঃ-

বাংলাদেশের একজন মহান সংঘ ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক প্রজ্ঞাবংশ থেরো মহোদয় এবং বৌদ্ধ সমাজের মানবিক চেতনায় প্রাণ পুরুষ বাবু শ্রীমান বড়ুয়া এবং বাবু মানস বড়ুয়া এ সংগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে আজীবন সম্মানিত হবেন।

ধারা- ১৭ প্রধান প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা ঃ-

বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সম্মানিত সভাপতি, শরণ-এর প্রধান প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা, অবিসংবাদিত বৌদ্ধ নেতা বাবু রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া জগতজ্যোতি চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার হোম-এর প্রধান প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা হিসাবে আজীবন সম্মানিত হবেন। তিনি অত্র প্রতিষ্ঠান সুন্দর ও সুষ্ঠু রূপে পরিচালনার জন্য কার্যকরী পরিষদকে নানাবিধ কল্যাণকর পরামর্শ দিবেন। কোন কারণে কার্যকরী পরিষদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তা যদি কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক সমাধা না হয় সে ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবেন। প্রধান প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা, উপদেষ্টা পরিষদের সাথে আলোচনা পূর্বক যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন তা কার্যকরী পরিষদকে অবশ্যই মানতে হবে।

ধারা- ১৮ আবাসিক পরিচালক/পরিচালক ঃ-

অত্র শিশু সদন সাবলীলভাবে পরিচালনা করার জন্য এক বা একাধিক আবাসিক পরিচালক/পরিচালক মহান দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন। শিশু সদনের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া, নৈতিক চরিত্র গঠন, মানসিক সুকুমারবৃত্তির উৎকর্ষতা সাধন, নিয়ম-শৃংখলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যজ্ঞান ও চিকিৎসোজনিত যাবতীয় বিষয় আবাসিক পরিচালক/পরিচালক-এর অধীনে সুচারুরূপে পরিচালিত হবে। এ সম্পর্কিত বিষয়ে কোন প্রকার অসুবিধা দেখা দিলে আবাসিক পরিচালক কার্যকরী পরিষদকে অবহিত করবেন। কার্যকরী পরিষদের প্রতিটি সভায় আবাসিক পরিচালক/পরিচালক উপস্থিত থাকবেন এবং শিশু সদন সংক্রান্ত যাবতীয় সুবিধা অসুবিধা সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করবেন।

ধারা- ১৯ আশ্রমে ছাত্র ভর্তি প্রসঙ্গে ঃ-

অত্র আশ্রমের নির্ধারিত ছাপানো আবেদনপত্র পূরণ করে তিন কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি সংযুক্ত করে আশ্রমের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের বরাবরে পেশ করতে হবে। ভর্তি ফরমের সাথে স্থানীয় অভিভাবকের সুপারিশ সংযুক্ত করতে হবে। অনাথ ও অসহায় দুঃস্থ সন্তানদের ভর্তির ব্যাপারে বিশেষ বিবেচনা করা হবে। ভর্তি ফরম জমা দেয়ার এক মাসের মধ্যে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে। আশ্রমের নিয়ম-শৃংখলা, আদর্শ, সুনাম এবং স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করলে এবং তা প্রমাণ হলে অভিযুক্ত অনাথ সন্তানকে চূড়ান্তরূপে বহিষ্কার করবার ক্ষমতা কার্যকরী পরিষদ সংরক্ষণ করে। ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে আবাসিক পরিচালক/পরিচালক আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীর পারিবারিক যাবতীয় বিষয় সঠিকভাবে অবহিত হইবার ভর্তির ব্যাপারে সুপারিশ করবেন।

ধারা- ২০ কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি ঃ-

অত্র সংস্থার কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য কার্যকরী পরিষদের সভায় পেশ করবেন। কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক নিয়োগ পত্র ইস্যু করবেন।

(চন্দ্র জ্যোতি ভিক্ষু)
সভাপতি
জগতজ্যোতি চিলড্রেন ওয়েল ফেয়ার হোম
রাং-উ, রাঙ্গুনিয়া, কক্সবাজার।

মানস বড়ুয়া
সাধারণ সম্পাদক
জগতজ্যোতি চিলড্রেন ওয়েল ফেয়ার হোম
রাং-উ, রাঙ্গুনিয়া, কক্সবাজার।

গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হইল।

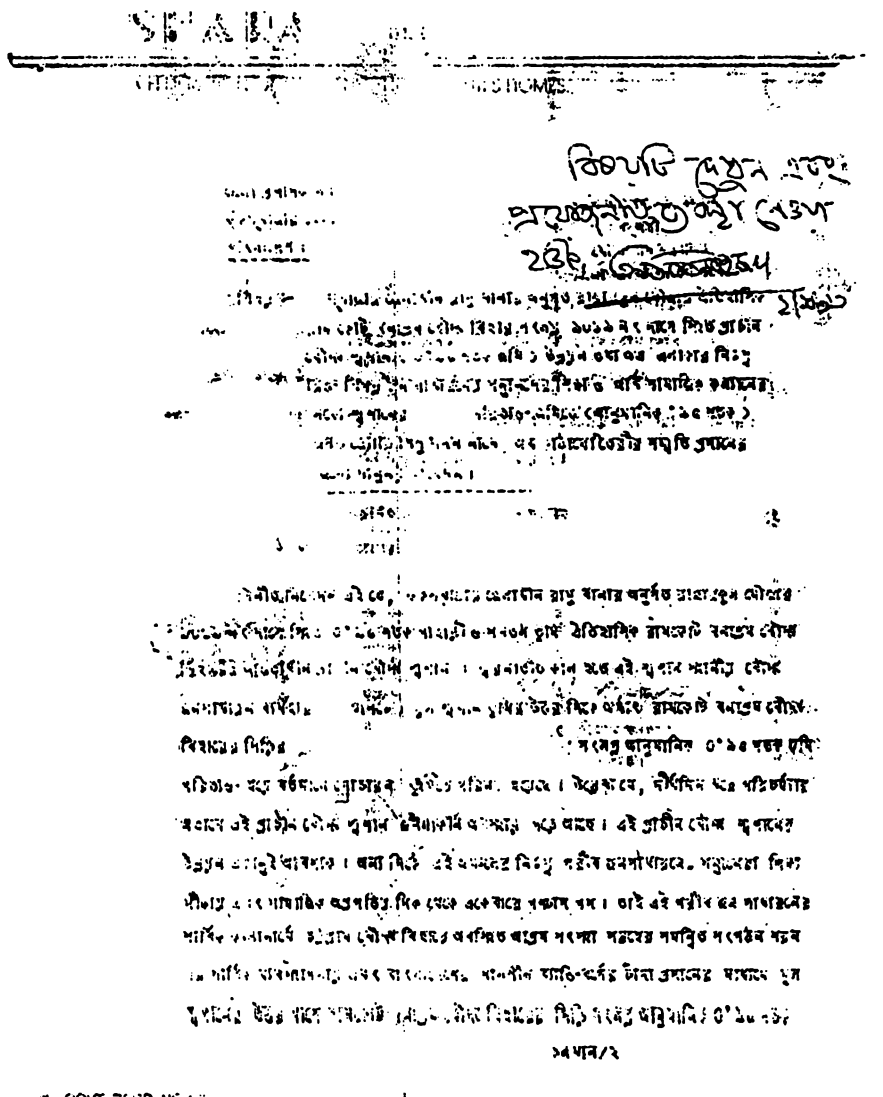

১৪ মার্চ/২

৫ GOVT. ROAD, NO. [illegible]
৯ MAILING ADDRESS: [illegible] TEMPLE ROAD,
G. P. O. BOX NO. [illegible]

SHARAN (SHELTER)

A HUMANITARIAN ORGANISATION FOR HOMELESS HOMES.

DATE

অধিকে অথচ আমাদের নিজস্ব সমৃদ্ধ নয়ন একটি কল্যাণ দৃষ্টি ওবকাঠামো গড়ে তোলা এবং সার্বজনীনভাবে এই প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের উন্নয়নের জন্যে সম্মতি প্রদানের প্রত্যাশায় আপনার সমীপে সানুনয় আবেদন করছি। এই প্রকল্পের জন্য আর্থ সামাজিক ওব কাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে বৌদ্ধদের স্বীয় মুক্তি কোন থেকে কোন বিধি নিষেধ নেই। এখানেওয়ের উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের বাস্তবায়নের মানবীয় আন্তর্জাতিক অর্থ সহযোগিতায় উক্ত এলাকায় জনহিতৈষি সিদ্ধ সমৃদ্ধ নাম ওবকাঠামো গড়ে তোলার জন্যে স্থানীয় বৌদ্ধ জন সাধারণের পক্ষ থেকে লিখিত ভাবে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।

এতএব, যথোপরি উল্লেখিত এলাকায় পল্লীর জন সাধারণের ভবিষ্যত উন্নয়ের কল্যাণার্থে এই মহতী ওবকাঠামো গড়ে তোলার জন্যে সম্মতি প্রদান পূর্বক বাধিত করুন।

তারিখ- চট্টগ্রাম,
১/১০/১৯৯০ ইং।

বিনীত -

SHARAN

(শ্রীমান বড়ুয়া) Secretary General
মহা সচিব
শরণ।

GOVT. REGD. NO 1758
MAILING ADDRESS: CHITTAGONG BUDDHIST TEMPLE, BUDDHIST TEMPLE ROAD,
G. P. O. BOX. NO. 1319, CHITTAGONG-4000, BANGLADESH.

HAVAN (SHELTER)
FEDERATION OF ORPHANS AND DESTITUTES HOMES.

মাননীয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, কক্সবাজার জেলাধীন রামু থানার অর্ন্তগত রাজারকূল মৌজার ঐতিহাসিক রাম কোট বনভূষণ বৌদ্ধ বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন বৌদ্ধ শ্মশান ৯০১৯ নং দাগে স্থিত ০'৯৫ শতক ভূমি ঐতিহাসিক রাম কোট বনভূষণ বৌদ্ধ বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন বৌদ্ধ শ্মশান। অত্রবাটীস্থ কক্স হতে এই শ্মশান স্থানীয় বৌদ্ধ জন সাধারণ ব্যবহার করে আসছে। তবে সুদীর্ঘ সময় ধরে সংস্কারের অভাবে উক্ত প্রাচীন বৌদ্ধ শ্মশানে বর্তমানে মৃত নর নারীদের মৃত-দাহের সুব্যবস্থা নেই। তা ছাড়া নদী বৌদ্ধ করুণ, নদী ভৈষজ্য, মৃত ব্যক্তিদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানুষ্ঠানের সুবিধা, বর্ষার দিনে মৃত নর নারীর কোন ব্যবস্থা নেই। অনাবিলে শ্মশানের সুবিধা ভাইবার, পায়খানার এবন কি মৃত ব্যক্তিদের সৎকারের উদ্দেশ্যে বর্ষাই কর্ম সম্পাদনের নিমিত্তে কোন ব্যবস্থা নেই। তাই উল্লিখিত প্রস্তাবিত বিষয়ে সুবিধাজনক করে স্থানীয় বাসিন্দা ব্যক্তিবর্গের মার্থিক সহায়তায় বনভূষণ বিহারের উদ্যোগে উক্ত প্রাচীন বৌদ্ধশ্মশানের

GOVT. REGD. NO 1758
MAILING ADDRESS: CHITTAGONG BUDDHIST TEMPLE, BUDDHIST TEMPLE ROAD,
POST BOX NO. 1316, CHITTAGONG-4000, BANGLADESH.

ক্রমশ---২,

SHARAN (SHELTER)

A FEDERATION OF ORPHANS AND DESTITUTES HOMES.

(২) DATE:

দক্ষিন পূর্ব পার্শ্বে একটি অবকাঠামো নির্মান করার অনুমতি প্রদানের জন্যে আপনার সমীপে সানুনয় আবেদন করছি। এখানে উল্লেখ থাকে যে, এই অবকাঠামো নির্মান উক্ত প্রাচীন বৌদ্ধ শ্মশান উন্নয়নের একটি বর্ধিত পরিকল্পনা, এই অবকাঠামো নির্মিত হলে, নাম বৌদ্ধ করন, নাম ফেলিং, পুর্ননা করন, বর্ষার দিনে নাম রাখার কক্ষ, মৃতাত্মীয়দের শুশ্রূষা-দার কক্ষের কক্ষ সহ নাম সংস্কারের সুবন্দোবস্ত করা হবে।

অত এব, মহোদয় উক্ত প্রাচীন বৌদ্ধ শ্মশানের উন্নয়ন কল্পে, নাম সংস্কারের সু-বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে একটি অবকাঠামো নির্মানের অনুমতি প্রদান পূর্বক বাধিত করবেন

ধন্যবাদ - ২১-১২-৯৩ ইং। বিনীত -

(সুধীর বড়ুয়া)
সহসচিব, শরণ।

GOVT. REGD. NO 1758
MAILING ADDRESS: CHITTAGONG BUDDHIST TEMPLE, BUDDHIST TEMPLE ROAD,
G. P. O. BOX. NO. 1319, CHITTAGONG-4000, BANGLADESH.
TEL: 208405, 209355.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার।

স্মারক নং ঃ২-৪৭/৯০- ৪ /এস,এ, তারিখ ঃ ০১/১/৯৪ ইং / ১৮/৯/১৪০০ বাং

প্রাপকঃ সহকারী কমিশনার(ভূমি),
রামু।

বিষয়ঃ কক্সবাজার জেলাধীন রামু উপজেলার অন্তর্গত রাজারকুল মৌজায় ঐতিহাসিক রাংকোট বনাঞ্চল বৌদ্ধ বিহার সংলগ্ন বি,এস, ১৩১৯ নং দাগে স্থিত প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপনা(০.১৫ একর জমি) এলাকার পরিত্রাণ জমিতে ক্ষতিকারক লেবু চুলাবাড়ীদের দ্বারা অবৈধভাবে বিধিবের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

ঃ আপনার স্মারক নং ১০-৩/৯০-৪৮০/এস,এ, তারিখ ০৩/১২/৯০ ইং।

উল্লিখিত বিষয় ও সূত্রের আলোকে বিনুনিম্নে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ঐতিহাসিক রাংকোট বনাঞ্চল বৌদ্ধ বিহার এলাকায় উক্ত জায়গাটি সংরক্ষণের নিমিত্তে অবৈধভাবে বিধিবের অনুমতি প্রদান করা হলো।

(ক) প্রস্তাবিত স্থানের অবৈধভাবে বৌদ্ধদের ধর্মীয় কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

স্থানের প্রকৃতি শ্রেণী পরিবর্তন করা যাবে না।

(গ) প্রস্তাবিত অবৈধভাবে ফলবাবেবলের দায়িত্ব রাংকোট বনাঞ্চল বিহার কর্তৃপক্ষ বা সরকার ছাড়া অন্য কাহাকে ও হস্তান্তর করা যাবে না।

(ঘ) উক্ত অনুমতি পত্র স্থায়ী কোন অধিকার বুঝাবে না বা দাবিদাবা বর্তাবে না।

(ঙ) উক্ত অনুমতি যে কোন সময় কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল করা যাবে।

ইহাতে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের ২৮/১২/৯০ ইং তারিখের অনুমোদন রহিয়াছে।

(এ,আর,এম, বাসেকবক্তিয়ার)
ডেপুটি সেক্রেটারি
জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার
এর পক্ষে।

স্মারক নং ঃ২-৪৭/৯০- /১৫২১/এস,এ, তারিখ ঃ ০১/১/৯৪ ইং / ১৮/৯/১৪০০ বাং

অনুলিপি অবগতির জন্য ঃ
১) জনাব বিশ্বজিৎ অধিকারী, রামু, কক্সবাজার।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ
১) সভাপতি, ঐতিহাসিক রাংকোট বনাঞ্চল কমিটি, জনাব রামু, কক্সবাজার।

(এ,আর,এম, বাসেকবক্তিয়ার)
ডেপুটি সেক্রেটারি
জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার
এর পক্ষে।

দৈনিক দেশবিদেশ

রামকোটে ধর্মীয় সমাবেশে এ লুৎফুর রহমান কাজল এমপি

রামকোট বৌদ্ধ মন্দিরের প্রচারের মাধ্যমে ধর্মীয় পর্যটনের প্রসার ঘটাতে হবে

রামকোট বৌদ্ধ বিহার

রামকোট বৌদ্ধ মন্দির একটি উপমহাদেশের বিখ্যাত ধর্মীয় পীঠস্থান। এখানে মহামান্য গৌতম বুদ্ধের অস্থি স্থাপিত আছে। যা কক্সবাজারের অহংকার। তাই এই বৌদ্ধ মন্দিরের প্রচারের মাধ্যমে ধর্মীয় পর্যটনের প্রসার ঘটাতে হবে।

এমপি কাজল বলেন, আমরা যদি দেশে বিদেশে রামকোট বৌদ্ধ মন্দিরের প্রচার-প্রসার ঘটাই, তাহলে সারা বিশ্ব থেকে প্রতিবছর লাখ লাখ পর্যটক কক্সবাজারে বেড়াতে আসবেন।

বাংলাদেশ সংখ্যালঘু ভিক্ষু মহাসভার সাবেক সহ-সভাপতি, ধর্মপ্রিয় [illegible] সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে খুরুমুখ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান লক্ষীপদ কুমার খাস্তগীর, ধর্মসেবক জনন্ত প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, রামু উপজেলা বিএনপির সভাপতি আহমদুল হক চৌধুরী, রাজারকুল ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বাবু অপূর্ব লাল, বিএনপি নেতা আকতার কামাল, জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গোলাম কবির সওদাগর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন রাজারকুল ইউনিয়নের বিশিষ্ট সমাজ সেবক আবদুর রহীম, রামু উপজেলা খুলদলের আহবায়ক ফোরকান আহমদ, সাবেক ছাত্রনেতা কামাল উদ্দিন, রামু উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, কক্সবাজার পৌর ছাত্রলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কামন বড়ুয়া প্রমুখ।

পরে এমপি কাজল ঈদগড় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জুমার নামায আদায় করেন এবং ঈদগড় ইউনিয়ন বিএনপির প্রতিষ্ঠালীন সভাপতি, চার বার নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার মরহুম মোস্তাক আহমদের কবর জিয়ারত করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঈদগড় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন শাহ, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব হাফেজ আবদুল হক, ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবু বক্কর ছিদ্দিক, সহ-সভাপতি হাফেজ মনিরুজ্জামান, হেফাজ উদ্দিন মেম্বার, সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম বাবুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক জাফর আলম জুয়েল, সাংগঠনিক সম্পাদক তৈয়ব উল্লাহ চৌধুরী, বিএনপি নেতা মনিরুজ্জামান মেম্বার, মোছাদ্দেক হোসেন মেম্বার, শাহজাহান এমসি মেম্বার, বিএনপি নেতা হাসিবুল হকসহ পদায়ন্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সংসদ সদস্য কাজল ৩০ এপ্রিল বিকালে পর্ণনিয়া ফাইজুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসার ৪৭তম বার্ষিক ধর্মীয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। এলাকার বিশিষ্ট আলেমের জীন হস্তগত মৌলানা শফিক আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন রামু উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান কজলুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান, কক্সবিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মৌলানা মোক্তার আহমদ, পর্ণনিয়া ফাইজুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মৌলানা আবু তাহের, শিক্ষাবিদ মৌলানা নুরুল ইসলাম, মৌলানা ফরিদুল আলম, প্রধান শিক্ষক [illegible] হক, পর্ণনিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ডক্টর আলম চৌধুরী, কচ্চপিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সহ সভাপতি আলহাজ্ব ইদ্রিছ সিকদার, পর্ণনিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি আবদুল আলিম, সাধারন সম্পাদক আবুল কাসেম সওদাগর, পর্ণনিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক মাষ্টার শামসুল আলম, বিএনপি নেতা জয়নাল আবেদীন টুকু, কাশির মেম্বার, যুগলদল নেতা সরওয়ার, মাইনুদুল হক মামুন, শ্রমিক নেতা নুর আলম, ছাত্রদল নেতা নজরুল ইসলাম, তৌহিদুল ইসলাম, নুরুল আমিন, কাইছার, আবু বক্কর, দিদার প্রমুখ। খবর বিজ্ঞপ্তির।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঐতিহাসিক রাংকূট বিহার ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার পর ক্রমে গভীর জঙ্গলে লুপ্ত হয়ে গেল। ১৯২৯ খৃস্টাব্দে পুণঃ আবিষ্কার হওয়ার পর পরই তা ভূমি আগ্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হলো। এই আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ তা এখনো চলছে ২০১০ খৃস্টাব্দে পর্যন্ত। জানিনা কবে এর শেষ হয়। তবে কক্সবাজার জেলার বর্তমান জেলা প্রশাসক জনাব গিয়াসউদ্দিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব নুরুল ইসলাম নিজামী, এবং সহকারী কমিশনার (রেভেনিউ) উপাসক দেবময় চাকমা মহোদয়গণ আশ্বাস দিয়েছেন মাসখানেকের মধ্যেই (২০১০ খৃঃ আগস্ট) এই দীর্ঘ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। প্রার্থনা করি তা-ই যেন হয়। সুদীর্ঘ ৮১ বছর ব্যাপী বৌদ্ধ সুপ্রাচীন এই পুণ্যতীর্থ উদ্ধার ও রক্ষার যুদ্ধে আমার জানামতে উল্লেখযোগ্য।
অবদান যাদের তাঁরা হলেন-

১। ভদন্ত জগতচন্দ্র মহাস্থবির, ঊনাইপুরা, পটিয়া, চট্টগ্রাম এবং প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো
২। রাং-উ রাংকূট এর দায়ক-দায়িকা এবং পূর্বরাজার কুল গ্রামের বৌদ্ধগণ।
৩। রামু উপজেলাসদরের উপাসক মতিসিং মহাজন, অবর্ণ মহাজন, সুবর্ণ মহাজন, মাষ্টার ক্ষেমেশ বড়ুয়া, অধ্যাপক দিপক বড়ুয়া, অধ্যাপক অরবিন্দ বড়ুয়া, মানস বড়ুয়া, প্রমূখ হিতৈষীগণ।
৪। ঐতিহাসিক রাংকূট উদ্ধার ও রক্ষার দ্বিতীয় কর্ণধার বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো (১৯৬৬-১৯৯০ খৃঃ)
৫। ঐতিহাসিক রাংকূট উদ্ধার ও রক্ষার তৃতীয় ব্যক্তিত্ব ভদন্ত চন্দ্রজ্যোতি মহাথেরো (১৯৯০-২০০৮ খৃঃ) এবং তৎসহযোগি উপাসক দিলীপ বড়ুয়া (পশ্চিম গহিরা, রাউজান)।
৬। ঐতিহাসিক রাংকূট সংরক্ষণ শাখা কমিটি- কক্সবাজার জেলা সদর, উখিয়া উপজেলা ও ঢাকা মহানগরের সভ্যবৃন্দ।
৭। ঐতিহাসিক রাংকূট উদ্ধার, রক্ষা ও নব রূপকার ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো (২০০৮, ৩রা জুলাই হতে .....)। এবং তৎসহযোগি ভদন্ত বিজয়রক্ষিত মহাথেরো, সারমিত্র, করুণাশ্রী, ও কুশলায়নও তৎশিষ্য বৃন্দ এবং শীলমিত্র ভিক্ষু, ভদন্ত বিজয়ানন্দ ভিক্ষু, উপাসক ইন্দ্রনাথ বড়ুয়া (জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ কৃষি কর্পোঃ) এডভোকেট রাখাল বড়ুয়া (কক্সবাজার), এডভোকেট সুনীল বড়ুয়া (কক্সবাজার), উপাসক রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া (কক্সবাজার), উপাসক দীপক বড়ুয়া (চেয়ারম্যান ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ), উপাসক নিরঞ্জন বড়ুয়া (কক্সবাজার), মাষ্টার সুগত প্রসাদ বুড়ুয়া (কক্সবাজার), উপাসক পুলিন বড়ুয়া, খোকন বড়ুয়া, কমল বড়ুয়া, দিলীপ, শ্যামাচরণ, অতীন্দ্র, সুখেন্দু, সঞ্জু, মাষ্টার সুরেশ, বাবুল, উপাসিকা নিরদা, রূপা, প্রসূন কান্তি, মিটন, সঞ্জিত বড়ুয়া, এবং আমার সার্বক্ষণিক সাথী শীলভদ্র, বিমলাচার, দীপানন্দ, রাহুল, রতনবংশ, ইন্দ্রবংশ, ক্ষান্তিবংশ, সমাধিবংশ, উপেক্ষাবংশ, সংঘবংশ, সচ্চিদাবংশ প্রমূখ রাংকূটের অন্যান্য ভিক্ষু শ্রামণেরা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঐতিহাসিক রাংকূট বিহার ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার পর ক্রমে গভীর জঙ্গলে লুপ্ত হয়ে গেল। ১৯২৯ খৃস্টাব্দে পুণঃ আবিষ্কার হওয়ার পর পরই তা ভূমি আগ্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হলো। এই আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ তা এখনো চলছে ২০১০ খৃস্টাব্দে পর্যন্ত। জানিনা কবে এর শেষ হয়। তবে কক্সবাজার জেলার বর্তমান জেলা প্রশাসক জনাব গিয়াসউদ্দিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব নুরুল ইসলাম নিজামী, এবং সহকারী কমিশনার (রেভেনিউ) উপাসক দেবময় চাকমা মহোদয়গণ আশ্বাস দিয়েছেন মাসখানেকের মধ্যেই (২০১০ খৃঃ আগস্ট) এই দীর্ঘ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। প্রার্থনা করি তা-ই যেন হয়। সুদীর্ঘ ৮১ বছর ব্যাপী বৌদ্ধ সুপ্রাচীন এই পুণ্যতীর্থ উদ্ধার ও রক্ষার যুদ্ধে আমার জানামতে উল্লেখযোগ্য।
অবদান যাদের তাঁরা হলেন-

১। ভদন্ত জগতচন্দ্র মহাস্থবির, ঊনাইপুরা, পটিয়া, চট্টগ্রাম এবং প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো

২। রাং-উ রাংকূট এর দায়ক-দায়িকা এবং পূর্বরাজার কুল গ্রামের বৌদ্ধগণ।

৩। রামু উপজেলাসদরের উপাসক মতিসিং মহাজন, অবর্ণ মহাজন, সুবর্ণ মহাজন, মাষ্টার ক্ষেমেশ বড়ুয়া, অধ্যাপক দিপক বড়ুয়া, অধ্যাপক অরবিন্দ বড়ুয়া, মানস বড়ুয়া, প্রমূখ হিতৈষীগণ।

৪। ঐতিহাসিক রাংকূট উদ্ধার ও রক্ষার দ্বিতীয় কর্ণধার বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো (১৯৬৬-১৯৯০ খৃঃ)

৫। ঐতিহাসিক রাংকূট উদ্ধার ও রক্ষার তৃতীয় ব্যক্তিত্ব ভদন্ত চন্দ্রজ্যোতি মহাথেরো (১৯৯০-২০০৮ খৃঃ) এবং তৎসহযোগি উপাসক দিলীপ বড়ুয়া (পশ্চিম গহিরা, রাউজান)।

৬। ঐতিহাসিক রাংকূট সংরক্ষণ শাখা কমিটি- কক্সবাজার জেলা সদর, উখিয়া উপজেলা ও ঢাকা মহানগরের সভ্যবৃন্দ।

৭। ঐতিহাসিক রাংকূট উদ্ধার, রক্ষা ও নব রূপকার ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো (২০০৮, ৩রা জুলাই হতে .....)। এবং তৎসহযোগি ভদন্ত বিজয়রক্ষিত মহাথেরো, সারমিত্র, করুণাশ্রী, ও কুশলায়নও তৎশিষ্য বৃন্দ এবং শীলমিত্র ভিক্ষু, ভদন্ত বিজয়ানন্দ ভিক্ষু, উপাসক ইন্দ্রনাথ বড়ুয়া (জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ কৃষি কর্পোঃ) এডভোকেট রাখাল বড়ুয়া (কক্সবাজার), এডভোকেট সুনীল বড়ুয়া (কক্সবাজার), উপাসক রবীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া (কক্সবাজার), উপাসক দীপক বড়ুয়া (চেয়ারম্যান ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদ), উপাসক নিরঞ্জন বড়ুয়া (কক্সবাজার), মাষ্টার সুগত প্রসাদ বুড়ুয়া (কক্সবাজার), উপাসক পুলিন বড়ুয়া, খোকন বড়ুয়া, কমল বড়ুয়া, দিলীপ, শ্যামাচরণ, অতীন্দ্র, সুখেন্দু, সঞ্জু, মাষ্টার সুরেশ, বাবুল, উপাসিকা নিরদা, রূপা, প্রসূন কান্তি, মিটন, সঞ্জিত বড়ুয়া, এবং আমার সার্বক্ষণিক সাথী শীলভদ্র, বিমলাচার, দীপানন্দ, রাহুল, রতনবংশ, ইন্দ্রবংশ, ক্ষান্তিবংশ, সমাধিবংশ, উপেক্ষাবংশ, সংঘবংশ, সচ্চিদাবংশ প্রমূখ রাংকূটের অন্যান্য ভিক্ষু শ্রামণেরা।

পরিবেশনায় ঃ

প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী